বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ জিয়াউর রহমান
(সাইম রানা)
গবেষক

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা) এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, পিএইচ.ডি. গবেষণার আওতায় **'বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য'** গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আঙ্গিক ও বিন্যাসে নতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্বে কোনো গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা কিংবা জার্নালে প্রকাশিত হয় নি। এমনকি এর অংশবিশেষও কোথাও ছাপা হয় নি। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণই আত্মবিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে নিজ দায়িত্বে উপস্থাপিত।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা)
পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নং-২
সেশন : ২০০৩-২০০৪
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

436790

গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF THEATRE AND MUSIC
UNIVERSITY OF DHAKA
Dhaka-1000, Bangladesh. Phone : PABX 9661900-59/4240, Fax : 880-2-8615583, e-mail : duregstr@bangla.net

যাঁর জন্য প্রযোজ্য

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা), রেজিস্ট্রেশন নম্বর-২, শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-২০০৪, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য আমার অধীনে **'বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য'** শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রাক-অভিসন্দর্ভপত্র জমাদানের জন্য দু'টি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তা তথ্যনিষ্ঠ ও মানসম্পন্ন হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

তাঁর অভিসন্দর্ভ-পত্র তথ্যসমৃদ্ধ ও সরজমিনে মাঠ-পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে। গণসংগীতের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুরবিশ্লেষণ এবং বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত করেছেন, যা বাংলা সংগীতের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার ধারণা।

আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভ-পত্রের কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য যথাযথ মানসম্পন্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি।

436790

তারিখ, ঢাকা
২০/ ০৩/ ২০০৮

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা)
গবেষক

436790

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা)

Dhaka University Library
436790

DULAP

নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গণসংগীত সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ শাসনের বিদায়কালে গণচেতনায় উজ্জীবিত, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিকশিত এক সংগীত-রীতি। রাজনৈতিক ও দর্শনগত বিবেচনায় কোনো কোনো গবেষক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, গণসংগীত স্বাদেশিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণশীল সর্বহারা-শ্রেণীর অধিকারের ভাষা; কারো বিবেচনায় লোকসংগীতের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আবার কিছু গবেষণায় 'গণসংগীত' আসলেই কোন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, বা অন্যকোনো নাম হ'তে পারতো কি না– এমন দ্বিধাবিভক্তির বিশ্লেষণও দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

বাস্তবে দেখা যায়, গণসংগীতের সামগ্রিক পর্যায়ে গবেষণা না থাকায় রাজনৈতিক, সামাজিক, তাত্ত্বিক ও শৈল্পিক মূল্যায়ন যথাসম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। গণসংগীতকে একদিকে যেমন চল্লিশ দশকের উদ্ভাবন বলা যেতে পারে–আরেক দিকে এর সুপ্তবীজ লুকিয়ে ছিল হাজার বছরের নিম্নবর্গের প্রতিবাদী লোকসংগীতের মধ্যেই।

গণসংগীতের রূপরেখা যে পক্ষেই যাক–তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণায় তার অবস্থান স্বকীয়। একথা সত্য যে এটি কোনো দেশজ ধারা থেকে উদ্ভাবিত নয়; একেবারে বিদেশীও নয় তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু দেশজ আঙ্গিকের সাথে বৈশ্বিক আঙ্গিক-সমন্বয়ে বিকশিত। এক পর্যায়ে দেখা যায়, বাংলার সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সংগীত ধারার মধ্যে গণচেতনার সাংগীতিক সুপ্ত বীজ লুকাইত ছিল, তা আবিষ্কার করা সম্ভব হলো।

আমরা মনে করি যে, গণসংগীতের শিল্পরীতিকে একদিকে যেমন লোকসংগীতের মধ্যে ফেলে দেয়া সমীচীন নয়, আবার হাজার বছর ধরে গ'ড়ে ওঠা সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করাও সম্ভব নয়। দেশজ শিল্পের সমন্বয় থাকলেও উদ্দেশ্য তার ভিন্ন। পরিবেশনা পদ্ধতি, ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুযায়ী গণসংগীতের ভূমিকা স্বতন্ত্র অবস্থানের সৃষ্টি করেছে।

বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভে গণসংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য উদঘাটন করতে গিয়ে প্রথমেই সংগীতের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যায়ন করা প্রয়োজন পড়েছে। অতঃপর দেশী ও মার্গীয় সংগীতের সাথে সম্পর্ক ও প্রভাব অনুসন্ধান করতে হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গণসংগীতের উপাদান, ঐতিহাসিক বিবর্তন, ক্রমবিকাশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ভাষা, সাহিত্য-মূল্য, অন্যান্য শিল্পের সাথে সংগতি কতটুকু তা পর্যালোচনা শেষে মনে হয়েছে, ১৯৪০-এর দিকে উদ্ভাবিত হলেও পরিস্থিতির কারণেই সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয় নি বলে পর্যাপ্ত পরিমাণ গান সৃষ্টির পরপরই হারিয়ে গেছে। যে গানগুলো আছে তা শিল্পীদের একান্ত উদ্‌যোগের ফসল। এর বাইরে আরো কিছু গান মাঠ-পর্যায়ে অনুসন্ধান করে পাওয়া গিয়েছে, কিছু গান গণশিল্পী ও সাধারণ মানুষের স্মৃতি থেকে পাওয়া, আর বাকী অন্যান্য গান লোকসংগীতের আদলে পড়ে আছে–যাতে গণসংগীতের উপাদান রয়েছে সার্বিকভাবে। ফলে গণসংগীতের সাথে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের বহুকেন্দ্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দীর্ঘ ছয় দশকে।

'বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য' গণসংগীতের তাত্ত্বিক কিংবা শৈল্পিক বিশ্লেষণের দিকে না গিয়ে, তার বৈচিত্র্যগত অবস্থানকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে পরোক্ষভাবে

Dhaka University Institutional Repository

উঠে এসেছে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারা। গবেষণায় বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য যেভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে, পর্বে ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে, তার সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

প্রথম অধ্যায় গণসংগীতের পরিপ্রেক্ষিত। এই অধ্যায়ে ভারতীয় সংগীত এবং দেশজ সংগীতের সাথে গণসংগীতের উৎস সন্ধান করা হয়েছে সেই সাথে তার উদ্ভব, সংজ্ঞার্থ ও ভিত্তি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়কে 'প্রথম পর্ব' বিবেচনা করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতির পূর্ব পর্যন্ত আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে দুইটি পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বিষয় এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুরবৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও গবেষণা স্থান পেয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে যে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো যথাক্রমে– তেভাগা আন্দোলন ও বাংলার কৃষকবিদ্রোহ; ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী গান; দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের গান; সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান; ভাষা আন্দোলনের গান; ভোটের গান; শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান; সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী গান; ট্যাক্সের গান; রবীন্দ্র সংগীত আন্দোলন; উদ্দীপনা ও গণজাগরণের গান; ছাত্র ও নারী জাগরণ বিষয়ক গান; সমবায়ের গান; ধর্মঘট ও মিছিলের গান; জেল বিদ্রোহ; '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধিকারের গানসহ দেশ-বিভাগের গান, সাম্যবাদের গান, ম্যালেরিয়া মহামারি বিষয়ক গান, ভাঙা গান, প্যারোডি গান, জারি গান, দেশ ও মাটির গান এবং অনুবাদিত গান। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুরবৈচিত্র্য নিয়ে বিশ্লেষণ। অত্র গবেষণায় প্রথমে উঠে এসেছে গণসংগীতের সুরবৈশিষ্ট্যগত বিশ্লেষণ। সুরের শ্রেণী বিভাগসহ বিভিন্ন সুর অনুপ্রবেশের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। অতঃপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাংগীতিক উপাদান থেকে পাওয়া–বিভাজিত চারটি ধারা নিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছে লোকসুর,শাস্ত্রীয় সুর, আধুনিক সুর ও বিদেশী সুর। লোকসুরের মধ্যে সারি, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চটকা, তরজা, গম্ভীরা, জারি, হোলি, ছাদ পেটানোর সুর প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। একইভাবে শাস্ত্রীয় সুর; আধুনিক সুর এবং বিদেশী সুর সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে। পরিশেষে গণসংগীতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ও গায়কী বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়কে 'দ্বিতীয় পর্ব' বিবেচনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পরবর্তীকালীন সময়ের আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত বিভাগের ন্যায় দুইটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বিষয় এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুরভিত্তিক গবেষণা স্থান পেয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়বৈচিত্র্যে উঠে এসেছে–স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা; মুক্তি ও বিজয়ের গানে যুদ্ধকালীন প্রণোদনামুখী গান, শরনার্থী শিবিরের গান, মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান, স্বাধীনতা-উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনা ইত্যাদি; স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে উপশিরোনাম করা হয়েছে– বিপর্যস্ত স্বাধীনতা লুণ্ঠিত নবরাষ্ট্র, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান, সামাজিক সংকট, প্রাকৃতিক সংকট প্রভৃতি এবং সবশেষে গণসংগীতের একাল। এখানে বর্তমানকালের রাজনৈতিক, নাগরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান থেকে গণসংগীত কোন দিকে মোড় নিতে চায়, সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের কিছুগানও সংযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সুরবৈচিত্র্য বিভাজনে আধুনিক কালের অবস্থান থেকে উঠে এসেছে–লোকসুরাশ্রিত নাগরিক সুর: বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ও মিশ্রসুর, প্রতিবিপ্লবী ও নাটকীয় সুর। এখানেও সাম্প্রতিক সংগীতের বিবর্তনমুখী ভাবধারায় গণসংগীতের সাথে সার্বিক সমন্বয় এবং বিরোধের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে–প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও অডিও-ভিডিওপঞ্জী; পরিশেষে বর্ণানুক্রমিক গানের তালিকা রচয়িতার নামসহ সূচিবদ্ধ করা হয়েছে।

বক্ষ্যমান গবেষণার শ্রেণীকরণ ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে স্বনামধন্য সংগীত গবেষকদের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার এবং ধারণকৃত গানের কাছে গবেষক বিশেষভাবে ঋণী। উদ্ধৃত গানের অধিকাংশই তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষ কয়েকজন পূর্বসূরির কাছে গবেষকের ঋণ অনেক, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ড. সুধীর চক্রবর্তী, ড. অনুরাধা রায়, কামাল লোহানী, সুব্রত রুদ্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ফকির আলমগীর প্রমুখ।

গবেষণায় বানানের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি অনুসরণ করা হলেও উদ্ধৃতিগুলোতে পূর্বসূরী লেখকদের নিজস্বরীতিই রাখা হয়েছে। গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা মনে রাখা হয়েছে যে, অত্র গবেষণা তাঁদেরই গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণশীল দিক-নির্দেশনার অংশত উত্তরাধিকার।

গণসংগীত নিয়ে গবেষণার ধারণা এবং শিরোনামা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম অনুপ্রেরণা দাতা পিতৃপ্রতীম শিল্পগুরু সদ্যপ্রয়াত ড. সেলিম আল দীন। গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সৈয়দ আকরম হোসেনের সাহচর্য গবেষণাকর্মের যাত্রাকে সুগম করেছে।

পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্মের আওতায় এই অভিসন্দর্ভ তৈরীতে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস শিক্ষাদান, পরামর্শ, গ্রন্থ-সহযোগিতা এবং গবেষণার পদ্ধতিগত তত্ত্বাবধান করে আমাকে চির ঋণী করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও শাসন আমাকে বিষয়ের গভীরে মনোনিবেশ করতে বারবার উৎসাহ জুগিয়েছে।

দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে নানা তথ্য-উপাত্ত, উপাদান, মতামত ও যাবতীয় সহযোগিতা করে গবেষণামূলক কাজকে পরিণত পথে এগিয়ে নিতে যাঁদের উদ্‌যোগ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম গণসংগীত প্রচার প্রসারে তৎপর ব্যক্তিত্ব শিল্পী শিমূল ইউসুফ, শিশির সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুরারী রায়চৌধুরী, মাহমুদ সেলিম, কঙ্কন ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র সাহা, শানু ব্যানার্জী, বন্ধুপ্রতীম গৌতম বাকালী, কফিল আহমেদ, সাইমন জাকারিয়া, অমল আকাশ এবং আমার স্ত্রী ও আত্মজ যথাক্রমে নূরুন নাহার লিপি ও নাহিয়ান কাব্য যাদের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা।

স্মরণ করছি প্রথম সংগীত শিক্ষাগুরু নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক শিল্পী নীলুফার ইয়াসমীন এবং বিশিষ্ট গণশিল্পী আবদুল লতিফ যাঁদের অনুপ্রেরণায় আমার সংগীত জীবনে অনুপ্রবেশ। এবং শ্রদ্ধা রাখছি বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গণসংগীত রচয়িতা অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংগঠক মফিদুল হক, গণশিল্পী কামরুদ্দীন আবসার, প্রকাশক ও গবেষক মুনীর মোরশেদসহ অসংখ্য গণসংগীতকর্মী, যাঁদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা ও প্রেরণা ছাড়া অত্র গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা কঠিন হতো।

Dhaka University Institutional Repository

সবশেষে পৃথিবীর সকল নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত সর্বহারা মানুষের জয় কামনা করি, যাঁদের শ্রমে-ঘামে পৃথিবী চিরচঞ্চল; সেইসব মানুষের সম্মান, মুক্তি, মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকারের লক্ষ্যে রচিত এই সহস্র গণসংগীত। স্মরণ করি মহান ভাষা-আন্দোলনে আত্মদানকারী অবিনশ্বরাত্মা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ-শহীদদের। মন্বন্তরে-জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ হারিয়ে যাওয়া মানুষ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের শিকার শহীদ বীরদের আত্মার প্রশান্তি কামনা করি।

২০শে মার্চ ২০০৮
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ জিয়াউর রহমান (সাইম রানা)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত ও সংজ্ঞার্থ ১-১১

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ প্রথম পর্ব : বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা পূর্বকাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য ১২-১২৭

১. তেভাগা আন্দোলন ও বাংলার কৃষকবিদ্রোহ; ২. ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী গান; ৩. দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের গান; ৪. সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান; ৫. ভাষা আন্দোলনের গান; ৬. ভোটের গান; ৭. শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান; ৮. সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী গান; ৯. ট্যাক্সের গান; ১০. রবীন্দ্র সংগীত আন্দোলন; ১১. উদ্দীপনা ও গণজাগরণের গান; ১২. ছাত্র ও নারীজাগরণ প্রসঙ্গ; ১৩. সমবায়ের গান; ১৪. ধর্মঘট ও মিছিলের গান; ১৫. জেল বিদ্রোহের গান; ১৬. '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধিকারের গান; ১৭. বিবিধ: ক. দেশ বিভাগের গান; খ. সাম্যবাদের গান; গ. ম্যালেরিয়া মহামারী বিষয়ে গান; ঘ. ভাঙা গান; ঙ. প্যারোডি গান; চ. জারি গান; ছ. দেশ ও মাটির গান এবং জ. অনুবাদী গান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য ১২৮-১৭০

ভূমিকা; বিস্তারণ; শ্রেণী বিভাগ; বিভিন্ন সুরের কারণ ও উদ্দেশ্য; লোকসুর: (*সারি, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, তরজা, গম্ভীরা, জারি, হোলি, ছাদ পেটানোর সুর*); শাস্ত্রীয় সুর; আধুনিক সুর; বিদেশী সুর; বাদ্যযন্ত্র; গায়কী বিধান; উপসংহার

তৃতীয় অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় পর্ব : বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা ও পরবর্তীকাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য ১৭১-২৩৬

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র; মুক্তি ও বিজয়ের গান (*যুদ্ধকালীন প্রণোদনামুখী গান, শরণার্থী শিবিরের গান, মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান, স্বাধীনতা উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনা*); স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আন্দোলন ও গান (*বিপর্যস্ত স্বাধীনতা লুণ্ঠিত নবরাষ্ট্র, ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান, সামাজিক সংকট, প্রাকৃতিক সংকট*); গণসংগীতের একাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য ২৩৭-২৪৭

লোকসুরাশ্রিত নাগরিক সুর: বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ও মিশ্রসুর, প্রতিবিপ্লবী ও নাটকীয় সুর

উপসংহার ২৪৮-২৫০

পরিশিষ্ট ২৫১-২৬৫

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও বর্ণানুক্রমিক গানের তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের গণসংগীত

পরিপ্রেক্ষিত

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে শ্রমমুখী ও মননশীল এই প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ভারতীয় সংগীত চর্চার ইতিহাস প্রাচীন।[১] বাংলা ভাষা ও সংগীতের দলিল অনুসারে প্রাচীন নিদর্শন হলো চর্যাগীতি,[২] একাধারে সাহিত্য উপাদান–সংগীতের উপাদান–ভাষার উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নিদর্শন। তবে এর প্রকাশ-শৈলী ভারতীয় সংগীতের চিহ্নকে ধারণ ও অনুসরণ করেই এগিয়েছে।[৩] চর্যাপদ প্রথম নিদর্শন বলে যে এর আগে বাংলাগানের চর্চা হয় নি এমন বিধি-সংগত কোন কারণ নেই, বরং কাব্যিক শৃঙ্খলার প্রকাশ দেখে মনে হয়, অনেক পরিশীলিত রূপ অতিক্রম করে আসা এক ভাষাশক্তি। চর্যাগীতির সুরে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নাম দেখে[৪] এবং তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি, প্রতিবাদী নাট্যরীতি, আচার-অনুষ্ঠানের আলোকে পদকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রকাশ[৫] দেখে মনে হয় শোষক এবং শোষিতের মাঝে যে দূরত্ব তা একটি সংকটময় অবস্থানের ভিতর দিয়েই অতিক্রম করেছে। সেখানে লক্ষণীয় বিষয় ছিল তৎকালীন জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি; প্রকৃত সত্যের প্রত্যাশা এবং জনগণের কাছে আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক জ্বরা-দুঃখ অতিক্রমণের পথ ও উপায়কে চিহ্নিত করা–যা সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। ফলে ভারতশিল্পের যে কোন বিভাগের অপেক্ষা সংগীত বিশেষ করে বাংলা সংগীতের নিদর্শনে প্রধানত মানবিকতার প্রকাশ ছিল সক্রিয়; মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছিল একই সাথে। ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি ধরে বাংলাগান যেমন পদ্ধতিগত চর্চার দিকে মনোনিবেশ করেছে, তার বিস্তার মানবিক চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ বাঙালির হাজার বছরের জীবন, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, দর্শন, শ্রেণীসাম্য এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যই তাদের সাংগীতিক রচনাশৈলীকে স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় রাখে। স্বতন্ত্র বলতে গ্রামীণ সভ্যতাজাত সংগীত যেখানে কথা ও সুরকে সমান প্রাধান্য দিয়ে একা একা গাইবার আদর্শ ধরে রাখে। কর্মমুখরতার থেকে উদ্ভূত ক্লান্তি ও শ্রান্তিকে লাঘব কিংবা শ্রমকে উদ্দীপিত করা অথবা কর্মের ফাঁকে অবসর সময়কে আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে অতিবাহিত করার প্রবণতায় তুষ্ট। বলা বাহুল্য এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে শিল্পের কাঠামো নির্ণয় ও বিকাশ লাভ করে। তবে গ্রাম সভ্যতাজাত হলেও আধুনিককাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাগান একদিকে যেমন লোকপ্রেম ও প্রকৃতিবাদ আশ্রিত, অন্যদিকে মরমিয়া বা আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শে ধাবিত। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ধর্মচেতনা, সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন, সামন্তবাদ বিরোধিতা, শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও উন্মার্গগামিতাকে প্রতিরোধ, কৃষক সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল-সংগ্রাম, বৃটিশ বিরোধিতার মতো বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদের হাত উঁচু করে লোকসংগীত নামে রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রতিবাদী গান।

আদিপর্বের চর্যাগীতি, আদি-মধ্যযুগের গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মধ্যযুগের মঙ্গলগীতি, চৈতন্যদেবের জীবনীকাব্য, প্রণয়-পাঁচালি; আধুনিককালের রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, লালন, রাধারমণ, মুকুন্দদাস[৬]-এর মধ্যদিয়ে বাংলায় ভাব-সংগীতের সমৃদ্ধ ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। বাংলাগান সে

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে প্রেম ও প্রকৃতি নির্ভর হলেও সমাজ বিপ্লবের অঙ্গিকার, শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিবাদ সমান্তরালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাগানের বিবর্তনের শেষপাদে এসে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে 'গণসংগীতের' জন্ম হয়েছে। এইগান হঠাৎ করে আসা কোন আঙ্গিক নয়। এর হৃদস্পন্দনে যে বাংলাগানের আদি উৎস প্রবাহিত তার স্বাক্ষর ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যেই চিহ্নিত হয়ে আছে। তাই 'গণসংগীত' নিয়ে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বাংলা গানের ধারা নিয়ে আরো কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, পুজা-পার্বণের গান, পাঁচালি, ঝুমুর, গম্ভীরা ইত্যাদি গ্রামীণ সংগীতের বিপরীতে গ'ড়ে ওঠা ধনী-জমিদারদের চিত্ত-বিনোদন ও ভোগ বিলাসিতার উপকরণ হিসেবে জলসাঘরে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, আখড়াই, হাফ এবং নাচ-গানের আসর হ'তো। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পেরিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলাগান অনেকটা অশ্লীলতা এবং কুরুচির প্রাবল্য দেখা দেয়। ফলে বাংলাগানের সংস্কারের চিন্তা-চেতনা ও অঙ্গীকারের প্রচেষ্টা দেখা দেয়। সংস্কারের হাল ধরেন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর শিষ্যকুল। ব্রহ্মসংগীত নামে একধরণের সুস্থ-শ্লীল রুচিসম্পন্ন সংগীত বাংলাগানের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সংস্কারমূলক ধারা বলে বিবেচিত হয়। পরবর্তীতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুভট্ট, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনের[৭] রচনায় সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা পায়। বাংলাগানের আধুনিক পর্বে যে উৎকর্ষ ও ঐশ্বর্য, দেখা যায় তার উৎস ও অনুপ্রেরণা হলো কীর্তনাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত[৮]। ব্রহ্মসংগীতের দার্শনিক মত এবং আদর্শ বাংলায় প্রচলিত কীর্তনের দার্শনিক ধারারই উত্তরাধিকার। আর কীর্তন বাংলাগানের জনমুখী ধারার উৎকৃষ্ট ফসল, কারণ কীর্তন গানের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং গায়নরীতির মধ্যেই জনমানুষকে একত্রিত করে তোলার প্রয়াস রয়েছে। একত্র হয়ে ওঠা, হাজার হাজার মানুষ প্রভুর নামে সংকীর্তন করে ব্রাহ্মণদের সামন্তবাদী মনোভাবকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার মতো ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠা জাতি-গোত্র, ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে এক কাতারে এসে গায়ক ও শ্রোতা পরস্পরের সত্তা ভুলে উদ্দাম নৃত্যের মাধ্যমে ভাবাবেগে উন্মত্ত হয়ে যাওয়া, প্রভুর প্রেমে সুধামগ্ন হয়ে ওঠা, ব্রাহ্মণীয় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের এই যে কীর্তনাঙ্গ সংগীত-এর মাধ্যমে দুর্বার প্রতিরোধ ও আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছিলেন। নামসংকীর্তনকে বলা যায় বাংলায় প্রথম জনসংগীত (Mass Singing)। বাংলায় এইরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংগীতের অন্য কোথাও দেখা যায় না এবং বলা যায় 'গণসংগীতের' চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যের নাম সংকীর্তনের মধ্যেই সূত্রসার। বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার দৈন্যতা লক্ষ করা যায় তার ইতিহাস সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার প্রতি অবহেলার দৃষ্টান্ত দেখে। যে কারণে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের রোষানলে পড়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বঞ্চনার বিষয়টি মেনে নিতে চেয়েছিলো ধর্মভক্তির স্বার্থে। শ্রীচৈতন্য সে অবচেতনের উপর আঘাত হানেন। ভয়, শংকার উর্ধ্বে প্রেম ও ভক্তির মধ্যদিয়ে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ধর্মে মানুষের জন্য মানবিকতার জয়গান তাঁর মতবাদের মূলকথা হিসেবে প্রচার করেছেন।

১৯৪০-এ গণসংগীত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিকশিত হয়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিটি ধর্মেই কোনো না কোনো দেবতা প্রতিবাদী চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মকুলের ভিতরে থেকেও প্রগতির পক্ষে দাঁড় করাতে গিয়ে ভক্তকুল অনেক সময় রক্ষণশীল ধর্মের বিপক্ষেই দাঁড় করিয়ে দেয়। হিন্দু ধর্মে শ্যামা বা কালী সেই

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র। নজরুলের একটি গানে যেমন দেখতে পাই 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'। কালো মেয়েটি হল শ্যামা মা, তিনি দেশ ও মাতৃভূমির প্রতীক। শ্যামা ও দেশ এখানে একাকার। স্বদেশী গানের আসরে প্রায় সব গানই মায়ের জপমালা দিয়ে পরিশুদ্ধ। বাউল গানের মধ্যে দেহভাণ্ডে ঈশ্বরের সন্ধান, পটুয়াদের বিশ্বকর্মা এইসব প্রগতিশীল চেতনার আদিরূপ। এমনকি বাংলার পল্লী-গীতিতে অজস্র লোক-দেবতা, উপদেবতার অধিকাংশই সংগ্রামের প্রতীক। গণসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে যে মানুষের জয়গানের কথা বলা হয়েছে, তারা শ্রম-জীবন ও ত্যাগের মাধ্যমে সভ্যতা নির্মাণ করেছে, কিন্তু সারাজীবন বঞ্চিতই থেকে গেছে মুষ্টিমেয় কিছু ধনিক শ্রেণীর শৃঙ্খলের চক্রে। সেই সর্বহারা শ্রেণী যাদের গানের ভাষায় কখনো মৌন, কখনো শ্লেষ আবার কখনো প্রতিবাদ উঠে এসেছে। গণসংগীত তাদেরই উত্তরাধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

গণসংগীত কী?

বিংশ শতাব্দীর একটি প্রতিবাদী ও সংস্কারবাদী শিল্পধারা হলো 'গণসংগীত'। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষাভাষীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে অসংখ্য দুর্বার বিপ্লব সংঘটিত হয় তারই অন্যতম পথনির্দেশনা হিসেবে গণসংগীতকে মূল্যায়ন করা যায়। ৪০'র দশকে গোড়ার দিকে 'গণসংগীত' নামটির সূত্রপাত হলেও যে শ্রেণীর গানকে 'গণসংগীত' বা 'গণগীতি' নামে বিবেচনা করা হয়েছে তা অনেকটা স্বতন্ত্র চরিত্র ও বোধের ব্যাপ্তি বোঝানো হয়েছে, যাকে আলাদা করা যায় পূর্বোক্ত জাতীয় সংগীত বা স্বদেশী সংগীত থেকে[৯]। স্বদেশী সংগীত বা দেশাত্ববোধক গান বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য বুঝাবার জন্যই 'গণগীতি' বা 'গণসংগীত' শব্দের উৎপত্তি।[১০]

'গণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ–সমূহ, সমষ্টি, (বহুবচন অর্থে) সম্প্রদায়, শ্রেণী, জনসাধারণ, দল প্রভৃতি।[১১] একটি বিশেষ্যপদ যা সংস্কৃত 'গণ্' ধাতু থেকে উৎপত্তি। ইংরেজিতে বলা হচ্ছে indicating a number more than one, the common people, the masses[১২] তবে 'গণ' শব্দটি পদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়ের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সাধারণত 'গণ' শব্দটি ইংরেজিতে noun অর্থে বলা হয়েছে the most, the majority যাদেরকে মূল্যায়ন করা হয় এভাবে যে, the ordinary people in society who are not leader or who are considered to be not very well educated.[১৩] বিশেষণের ক্ষেত্রে বলা হয় affecting or involving a large number of people or things এবং ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে to gather people or things togather in large numbers[১৪] এটি হলো সাধারণ অর্থ। কিন্তু কোন ভাষার শব্দ সেই ভাষা-ভাষী মানুষের জীবন দর্শন, রাজনীতি ও সমাজনীতির পরিবর্তনে নতুন অর্থবোধে বিশেষিত হয়। এমনকি শব্দের কাঠামো ঠিক থাকলেও অন্য অর্থ প্রকাশ করতে পারে, অর্থবিশেষের সম্প্রসারণ অথবা সংকোচন হ'তে পারে।[১৫] এক্ষেত্রে 'গণ' শব্দটি সংগীতের সংযোগে ১৯৪০-এর দিকে বিশেষভাবে তাৎপর্য লাভ করেছে। যেখানে অধিকার সচেতন, শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকেই বলা হচ্ছে 'গণ'[১৬]। যেখানে 'ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কথাই দ্যোতিত হয় না, বরং 'গণসংগীত' কথাটিতে প্রযুক্ত 'গণ' শব্দটি ওই অর্থে আদপেই ব্যবহৃত হয় নি। শোষক শ্রেণী 'গণ'-এর শত্রু, তারা 'গণ'-এর আওতায় আসে না। জমিদার, পুঁজিপতি, সাম্রাজ্যবাদী এরা কখনো 'জনগণ' নয়।[১৭]

'গণসংগীত' বাংলাগানের এমন একটি ধারা, যা শিল্পীর সৃজনশীলতা ও মননের পরীক্ষা-নিরীক্ষামুলক একটি ফসল বলে মূল্যায়ন করার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে শোষিত গণমানুষের অধিকার, বিদ্রোহ এবং মতাদর্শ নিয়ে জাগ্রত করার বিষয়টাই গুরুত্বের সাথে বিচার করে। সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করতে গেলে দেখা যাচ্ছে সেখানে স্বরূপ ও বিষয় নিয়ে বেশকিছু মতভেদ রয়েছে। মতভেদ যে পরস্পর বিরোধী তাও নয়। দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই গণসংগীতকে কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ দিকে ইঙ্গিতবহ করে তুলেছেন, নিম্নরূপ বিভিন্ন মনীষীর সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হলো–

গণসংগীতের রূপকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন–'স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।[১৮] তিনি

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলেছেন–'স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার সাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম।'[১৯]

সংগীতকার সলিল চৌধুরীর ভাষায়–'শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্খা সংগ্রামের সাংগীতিক ইতিহাসই হলো গণসংগীত'।[২০]

গবেষক শম্ভুনাথ ঘোষের বিচার্যে–'যে সংগীত জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তাকেই বলে স্বদেশাত্মক বা রাষ্ট্রীয় গীতি বা গণসংগীত।'[২১]

গণশিল্পী খালেদ চৌধুরীর মতে–'মূলত দেশপ্রেম, সমাজচেতনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে একধরণের সংগীতের সৃষ্টি হল–গণচেতনার আদর্শ যার মূল পটভূমি–এই সংগীতকে বলা যায় গণসংগীত।'[২২]

ভূপেন হাজারিকা বলেছেন–'স্বদেশ প্রেম কেবল দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় সমাজের অন্যায়, অবিচার, দারিদ্র্য, শ্রমিক নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিল। ...আমার যে গানগুলির মধ্যে সাম্যবাদ অথবা অন্য রাজনৈতিক মতবাদের সংকেত রয়েছে সেই গানগুলিকেই আমি বিদ্রোহের গান বা জন-সংগীত বলে বিবেচনা করি।'[২৩]

গণসংগীত সংকলক সুব্রত রুদ্র বলেন–'অন্যায়ের প্রতিবাদে যে গান সোচ্চার, মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে দূর করার জন্য তাকে সুস্থ-সুন্দর জীবনে নিয়ে আসার জন্য পথ দেখায় যে গান, তা-ই গণসংগীত।'[২৪]

প্রাবন্ধিক বৈরাগ্য চক্রবর্তী বলেছেন–'সাধারণভাবে কৃষক সমাজের সঙ্গে জমিদারদের, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পুঁজিপতিদের এবং ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তা শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হবে, এটা কাম্য। শ্রেণী সচেতন এই শ্রেণী-সংগ্রামের বিষয় সম্বলিত গানগুলিকে গণসংগীত বলা হয়।'[২৫]

জার্মানীর প্রখ্যাত মিউজিক কম্পোজার Hanns Eisler বলেছেন– 'Mass song is the fighting song of the modern working class and to a certain degree Folksong at a higher stage than before, because it is international.'[২৬]

বিশিষ্ট গবেষক নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন–গণসংগীত একটি বিশেষ ধরনের সম্মেলক গান এবং তার বিষয়বস্তুতে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের দ্যোতনা থাকা আবশ্যিক।[২৭] এবং 'গণসংগীত হলো কোরাস গানের ন্যায়ানুমোদিত অনিবার্য অনুসৃতি–একটির সঙ্গে আরেকটির যোগ অবশ্যম্ভাবী পূর্বাপরের যোগ, অব্যবহিত পরম্পরার যোগ।'[২৮]

হীরেন ভট্টাচার্য বলেন–'সাধারণভাবে বলতে গেলে মেহনতী জনগণের আন্দোলনের গানই গণসংগীত'।[২৯]

উপরোক্ত মন্তব্যসমূহের মধ্যে গণসংগীতের নির্দিষ্ট কোনো চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিচার করা দুরূহ, তবে আদর্শ ও লক্ষ্যে প্রত্যেকের মন্তব্য খুব কাছাকাছি। চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগত দিক এক না

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গণসংগীতের প্রবর্তন হয় নি, বরং সময়ের গভীরতম সংকট থেকে উত্তরণের উপযোগিতা এবং বহুদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত একটি আন্দোলনের অনির্বাণ ফসল হিসেবে কার্যকারিতা পেয়েছে। বিকাশও হয়েছে শোষণ-ত্রাসের বিরুদ্ধে নানা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অতিক্রমণে। 'এই আন্দোলনের উপর বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ যত-না প্রভাব ফেলেছিল, তারচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছিল সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, ফ্যাসিজমের দৌরাত্ম্য তো বটেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের পূর্ব-সীমান্তে জাপানি আক্রমণ, ১৯৪৩-৪৪ সালের ভয়াবহ মন্বন্তর, যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, যুদ্ধোত্তর দিনগুলোতে সারা ভারত জুড়ে শাসক ও শোষক বিরোধী অসংখ্য গণ-অভ্যুত্থান, অবশেষে স্বাধীনতা ও দেশভাগ–এসব কথা স্বভাবতই প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল সাধারণ মানুষকে, সুতরাং শিল্পী সাহিত্যিকদেরও।'[৩০] ফলে 'গণসংগীত'-এর একটি বিশেষ রূপ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লব, শ্রেণী-সংঘাতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতায় গণসংগীতের বিষয় ও সুর নানা বৈচিত্র্যে বিকশিত হয়েছে। অনেক গানই আছে যা গণসংগীতের সংজ্ঞার্থ দ্বারা বিবেচনা করা যায় না, অথচ গণসংগীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আবার অনেক গান আছে গণসংগীতের শর্তানুযায়ী মিলে যায় কিন্তু খুব একটা গীত হয় না।

নির্দিষ্টভাবে গণসংগীতের সংজ্ঞার্থ বিচার করা দুরূহ বলে অনেকেই গণসংগীত ও স্বদেশী গান অথবা দেশাত্মবোধক গানকে একই ধরনের সংগীত বলে বিবেচনা করেন, উপরোক্ত আলোচনায় যেমন গবেষক শম্ভুনাথ ঘোষ স্বদেশাত্মক, রাষ্ট্রীয়গীত ও গণসংগীতকে একই পাল্লায় মেপেছেন। কিন্তু বিষয় ও চেতনাগত ভিন্নতায় অনেক ক্ষেত্রেই গণসংগীতকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এ ব্যাপারে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর মতে স্বদেশী সংগীতের ধারা যখন গণ-চেতনায় উত্তরণ করে এবং যার পথ শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ ও অধিকারের সাহসকে প্রত্যয় হিসেবে আন্তর্জাতিকতার দিকে অভিযাত্রা করে। তবে প্রশ্ন জাগে এই উত্তরণই কি গণসংগীতের স্বরূপ–না গণসংগীত একটি স্বতন্ত্র সত্তা? যদি উত্তরণের প্রক্রিয়া মনে করা যায় তাহলে গণসংগীতকে স্বদেশী-সংগীতের উত্তরাধিকার বিবেচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে দিলীপ সেনগুপ্ত এক প্রবন্ধে বলেন–'স্বদেশী সংগীতগুলি যদিও ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল তবুও তা বুর্জোয়া নেতৃত্বের পরিপোষক ও সহায়ক ছিল। মূলত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শ্রমিক শ্রেণীর চেতনা এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের উপাদান নিয়ে সৃষ্ট গানকেই আমরা গণসংগীত বলে থাকি।'[৩১]

সংস্কৃতি ও গণসংস্কৃতি দু'টোর চরিত্র যেমন ভিন্ন, সংস্কৃতির জন্য অনুশীলন করতে হয়, ক্রমান্বয়ে এর উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ করতে হয়–যার নান্দনিক উদ্দেশ্য হ'তে পারে বিনোদন বা উৎকর্ষ। কিন্তু সংস্কৃতির সাথে 'গণ' সংযুক্ত হ'লে সমাজ-কাঠামোর প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়–যেখানে শোষিত সংগ্রামী কৃষি-মজুরদের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় অধিকার আদায়ের লক্ষ্য থাকে। খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের গভীর ঝংকার থেকে যা সৃজিত হয়–'সংগীত শিল্পে এর প্রকাশ 'গণসংগীত' নাম দিয়ে। গণসংগীত গণ-সংস্কৃতিরই একটি দিক। তাই গণসংগীতের ভাষায় মেহনতি মানুষের চাওয়া পাওয়ার কথা, সাম্যের মৈত্রীর অধিকার আদায়ের কথা প্রকট ভাবে প্রকাশ পায়।'[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সংজ্ঞার্থের বিভিন্ন মন্তব্যে সুক্ষ্ম কিছু গড়মিল আছে–তার কারণ গণসংগীতকে সাধারণ অর্থ ও বিশেষ অর্থ দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন শিল্পী ভূপেন হাজারিকা বিদ্রোহের গান এবং গণসংগীতকে সমার্থক বলে মনে করেছেন, সেটা কি সঠিক? রাজা রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতকেও কি তাহলে গণসংগীত আখ্যা দেওয়া যাবে?[৩৩] প্রকৃতপক্ষে গণসংগীত একটি বিশেষ পরিচর্যার মধ্যদিয়ে এগুতে এগুতে পরিশীলিত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার নিগড়ে পরিণত হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মন্তব্যের সাথে সেই ধারণার মিল পাওয়া যায়। অবশ্য জার্মান মিউজিক কম্পোজার হ্যান্স আইসলারের বক্তব্য অনুযায়ী গণসংগীতকে প্রথমত বলা হচ্ছে আধুনিক শ্রমজীবী মানুষের গান। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায়, প্রেরণা ও প্রতিরোধের গান। যেই শ্রমিক আধুনিক শ্রমিক, অর্থাৎ তার আগেও শ্রমিক ছিল–আদিকাল থেকেই পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর গান রচিত হয়ে এসেছে। আইসলারের মন্তব্য অনুযায়ী সকল শ্রমিক নয়, আধুনিক অর্থে যে শ্রমিক আন্তর্জাতিকতার ধারাবাহিকতায় বিকশিত। এখানে হেমাঙ্গ বিশ্বাস আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করেন নি, হয়তো আধুনিকতাবাদের দার্শনিক সাজুয্যের সাথে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর জীবনাদর্শের সমস্বর খুঁজে পান নি। পাশ্চাত্যে আধুনিকতার বিচারে প্রথম শ্রমিক আন্দোলন ১৮২০ সালে হয় ইংল্যান্ডে। যাকে মেশিন ভাঙা আন্দোলন বা লাডাউড মুভমেন্ট বলে। ১৮৪৪ সালে সাইলেসিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনে হেনরি হাইনের লেখা 'song of the Silesian Weavers' অতঃপর ১৮৪৮ সালে ইংলন্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন, ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের শ্রমিক রাষ্ট্র, কমিউন যোদ্ধা ইউজেন পতিয়ের লেখা ইন্টারন্যাশনাল সংগীত, ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লব, সে সময়ে রচিত–

'Through the winter's cold and famine
from the fields and from the town
At the call of Comred Lenin ...'

১৯২০ সালে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক বিপ্লবের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার, আদর্শ ও গণসংস্কৃতির রূপরেখা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হ্যান্স আইসলারের Fighting song আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় মিলিত হয়ে গিয়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্যের সাথে আইসলারের বক্তব্যে যতটুকুই মিল পাওয়া যাক– বাংলাদেশের গণসংগীত যে সকল দুর্বার প্রতিরোধ-সংগ্রাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর সাথে কিংবা আন্তর্জাতিকতাবাদকে মেলানো অনেকটা কঠিন হয়ে পড়ে। যে গানগুলোকে আমরা গণসংগীত বলে সনাক্ত করে এসেছি, এমনকি লোকসংগীতের উচ্চতর বিকাশের বিষয়টিও গৌণ বরং লোকসংগীতের সুর ও বিষয়ের প্রভাবকে অনুসরণ করে এদেশের গণসংগীতকে জনপ্রিয় ও মাটিমগ্ন করে তোলার প্রচেষ্টাই মুখ্য ছিলো। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ কিছু সফল গণসংগীত ছাড়া শহুরে শিক্ষিত গায়ক ও রচয়িতাদের মধ্যেও যেমন আইসলারের আদর্শ অঙ্কিত গণসংগীতের সাথে পরিষ্কার সম্পর্ক বজায় রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আর বাংলার চারণ কবি, বাউলদের রচিত গণসংগীতের সাথে তো মেলানো সম্ভবই নয়। যাদের বিপ্লবী ভূমিকা বাংলাদেশের গণসংগীতকে সমৃদ্ধতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁরাই লোককবি ও গণমানুষের চৈতন্যের প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ বিশেষত কৃষিপ্রধান দেশ, এদেশে কৃষক বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, টংক বিদ্রোহসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু আন্দোলন ঘটলেও শ্রমিক শ্রেণীর বিষয় ও বৈশিষ্ট্যগত অধিকারের সাথে কৃষকের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারকে মেলানো কঠিন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গণসংগীত সৃষ্টিই বাংলা ভাষা-ভাষীদের গণসংগীতের ধারাবাহিকতা বলে ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৪২ এর থেকে ৫০-৫২ পর্যন্ত ভারতীয় গণনাট্য রচিত গণসংগীত এদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রাণ হিসেবে গীত হয়েছে ঠিকই। তবে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলাদেশের গণসংগীতের বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি একটি স্বতন্ত্র মনোভাবের দিকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের গণসংগীত বাংলার কৃষিজীবী মানুষের অধিকার আদায়, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নয়ন, ভাষার অধিকার, স্বাধিকার আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই সকল আন্দোলনে জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ ক. 'যে সময় থেকে এবং জীবনের যে ঐতিহ্য থেকে ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাকে অনেকেই ঋক্‌বেদের সভ্যতা থেকে পূর্ববর্তী সভ্যতা শিল্প-সংস্কৃতির ফসল মনে করেন। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, ঝুকর, চুন্নদড়ো ইত্যাদি সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতত্ত্বীয় দেশ বা শহরগুলোতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার বহু ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে সংগীতের কয়েকটি সামগ্রী প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে মূল্যবান। অনেকের মতে এই সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল খৃঃ পূঃ ৫০০০ থেকে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে। প্রকৃত ইতিহাস এখনো জানা নেই বলে মতভেদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু সংগীতের থেকে এর মূল্য সমধিক। ওখানে পাওয়া গিয়েছে হাড়ের বিকৃত বাঁশি, বীণা, চামড়ার বাদ্য, ব্রোঞ্জের একটি নৃত্যশীলা নারী ও দু'টি ভগ্ন মূর্তি। তাছাড়া আরো বাঁশি, বিকৃত বীণার অবয়ব, ব্রোঞ্জের আরো তিনটি নৃত্যশীলা নারীমূর্তি, করতাল জাতীয় যন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। হাড়ের বাঁশী যেমন আদিম যন্ত্রের উদাহরণ, বীণা, মৃদঙ্গ জাতীয় যন্ত্র, তন্ত্রী যুক্ত বাদ্য তেমন উন্নততর সংস্কৃতির নিদর্শন।'

সুকুমার রায়, *ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১৮

খ. মহেঞ্জোদরো হরপ্পার সাংগীতিক নিদর্শনের পর বৈদিক যুগকে চিহ্নিত করেছেন লেখক। সময়কাল ৩০০০-৬০০/৫০০ খৃঃ পূঃ যেখানে গানের স্তর হিসেবে পূর্বাচিক আরণ্যক, সংহিতা, উত্তরার্চিক। এগুলো গ্রাম গেয় বা প্রকৃতি গান, আরণ্যক গান, উহগান বা রহস্যগান। গ্রাম গেয় গান গুলো সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত। অতঃপর সাম গান। যা স্বর যুক্ত ঋক মন্ত্র বা সামের সমষ্টি, চতুর্বেদ অবলম্বনে নানা শ্রেণীর গান এগুলো প্রথমে ৩ স্বর, পরে ৫ স্বরে ও ৭ স্বরে প্রচলিত । এই সংগীত বাদ্যযন্ত্র সহকারে লৌকিক সমাজে প্রচারিত। ৬০০ খৃঃ পূঃ থেকে ১০০ খৃঃ পূঃ সময়ে গন্ধর্ব নগানের ধারা, এই প্রচলিত সংগীতের বাহক হলেন দ্রুহিন ব্রহ্মা ও সদাশিব।

২ বাংলা ভাষা তৎকালীন অন্যান্য লৌকিক ভাষা যেমন মৈথিলী, অসমীয়, ওড়িয়ার ন্যায় একটি লৌকিক ভাষা হিসেবে পরিগণিত। ভারতীয় সংগীতের ধারাবাহিকতায় গান্ধর্বগীতের উত্তরকালে যে বিভিন্ন লৌকিক ভাষার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সংগীতের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য। বাংলাভাষার চর্যাপদেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

সুকুমার রায়ের মতে–'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাগীতি সে যুগের লৌকিক ভাষায় রচিত গানের উদাহরণ। যে ভাষায় গানগুলি রচিত হয়েছে তাকে পূর্বাঞ্চলের বর্তমান মৈথিলী, বাংলা, অসমীয়াও ওড়িয়া ভাষার আদিপুরুষ রূপে গণ্য।...সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচনার সময় নির্ধারণ করেছেন ৯৫০ থেকে ১২০০ শতক পর্যন্ত। প্রাকৃত ভাষার পরিসমাপ্তি হয়ে তখন অপভ্রংশের যুগ। লৌকিক ভাষা তখন অপভ্রংশের স্তরে। কাজেই সংগীত লৌকিক ভাষাকে অবলম্বন করেছে।'

প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৩ 'উপমহাদেশীয় সংগীত সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধানের সূত্রও সিন্ধু সভ্যতা থেকেই শুরু। এর আগেকার প্রত্নতাত্ত্বিক বা অন্য কোন নিদর্শনে সংগীতের ইতিহাস সম্বলিত সূত্রের স্বাক্ষর নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে আমরা যে সমস্ত সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি সেগুলো হলো সিন্ধু সভ্যতা, উপমহাদেশে পারসীয় ও গ্রীক সভ্যতার অংশ বিশেষ, বর্তমান ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দির গাত্রে খোদিত নৃত্যগীত সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য। শিলালিপি, গুহাচিত্র এবং মন্দির গাত্রে খোদিত নর্তক-নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্রের চিত্র হতে প্রাচীন কালের নৃত্যানুষ্ঠান ও বাদ্যযন্ত্র তথা বাদ্যযন্ত্রের গঠন প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।'

ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮১, পৃ. ১১-১২

৪ 'যেসব রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে চর্যাগীতিতে সেগুলো হলো– রাগ পটমঞ্জরী, মল্লারী, গুঞ্জরী, (গুর্জরী বা কাহ্ন-গুর্জরী), কামোদ, বরাড়ী, ভৈরবী, গবড়া (গউড়া), দেশাখ, রামক্রী, শবরী, অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্রী, ধনসা, (ধানশ্রী) মালসী, মালসী-গবুড়া, ও বঙ্গাল রাগ,'

ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৩, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

৫ 'বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত 'চর্যাগীতিকা' বাংলা গানের আদি নিদর্শন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উৎসকাল ৮ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সময়ের মধ্যেই এসব গীতিকা রচিত হয়েছিল। এসব গানে তদানীন্তন বৌদ্ধ যাজকরা ইহলৌকিক জ্বরা এবং দুঃখ অতিক্রমের নানাবিধ পথ ও উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সমকালীন সামাজিক রাজনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের আলোকে তারা আধ্যাত্মিক নীতি ও অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলেন। এসব গানের মূল লক্ষ্যই ছিল প্রকৃত সত্যের প্রত্যাশায় আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করা। ...এসব গানে আমরা সমকালীন জীবন ও সমাজের এক বিস্তারিত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই'।

ম ন মুস্তফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, পৃ. ২০৭-২০৮

৬ ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, পৃ. ৪

৭ দিলীপ সেনগুপ্ত, *গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা– একটি সমীক্ষা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা (১ম সংখ্যা) ১৮৫ পৃষ্ঠা

৮ 'কীর্তন গানের সুকোমল আবেদন, বৈশিষ্ট্য লইয়া বহু ব্রহ্মসংগীত রচিত হইয়াছে।'

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫২, পৃ. ৪

৯ 'স্বদেশী সংগীতগুলি যদিও ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল তবুও তা বুর্জোয়া নেতৃত্বের পরিপোষক ও সহায়ক ছিল। মূলত, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা এবং আন্তর্জাতিকতা বোধের উপাদান নিয়ে সৃষ্ট গানকেই আমরা গণসংগীত বলে থাকি।'

দিলীপ সেনগুপ্ত, *প্রবন্ধ : গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলাগানের ধারা–একটি সমীক্ষা*, পৃ. ১৮৭

১০ 'বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুণরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবিত ছিল। সেসব গানে দেশাত্মবোধের আবেগ ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি। শ্রমজীবি জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয় নি।'

হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *গানের বাহিরানা*, মৈনাক বিশ্বাস (সম্পাদিত), প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ১৫১

১১ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত) *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১৮৯

১২ Samsuzzaman khan (Edited) *Bengali-English Dictionary,* Bangla Academy, Ninth Reprint October 1998, page 161

১৩ Sally Wehnever (Edited) *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Oxford University Press, First published 1948, Page 787

১৪ Sally Wehnever (Edited) *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Sixth Edition, Published by, Oxford University Press, Page-787

১৫ শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ. ১১

১৬ সুব্রত রুদ্র, *গণসংগীত সংগ্রহ*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫

১৭ বৈরাগ্য চক্রবর্তী, *নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণসংগীত*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা (চতুর্থ সংখ্যা) ১৯৯৯, পৃ. ৪৮

১৮ দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *গণনাট্য সংঘের গান*-এর ভূমিকায় লিখিত, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ৬

১৯ সুব্রত রুদ্র, *গণসংগীত সংগ্রহ*, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

২০ দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *গণনাট্য সংঘের গান*, পৃ. ৬

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২২ খালেদ চৌধুরী, *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৩

২৩ দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *গণনাট্য সংঘের গান*, পৃ. ৬

২৪ সুব্রত রুদ্র, *গণসংগীত সংগ্রহ*, পৃ. ৫

২৫ বৈরাগ্য চক্রবর্তী, *নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণসংগীত*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা, ২৫ জুন ১৯৯৯, পৃ. ৪৮

২৬ দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) *গণনাট্য সংঘের গান*, পৃ. ৫

২৭ নারায়ণ চৌধুরী, *সংগীত বিচিত্রা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ১৮০

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

২৯ অনন্তকুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধ *'গণসংগীত সংগঠন ও শিল্প'*-এ উদ্ধৃত করেছেন, জলার্ক (গণসংগীত সংখ্যা-১, ত্রয়োবিংশ সংকলন), পৌষ ৪০১–আষাঢ় ১৪০২, পৃ. ৪৫

৩০ অনুরাধা রায়, *চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন*, প্যাপিরাস, কলকাতা, জুন ১৯৯২, পৃ. ২

৩১ দিলীপ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ–*গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলাগানের ধারা–একটি সমীক্ষা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা (১ম সংখ্যা), ১৯৯৫, পৃ. ১৮৭

৩২ দিনু বিল্লাহের প্রবন্ধ–*মিলিত প্রাণের কলরবে*, বাংলা জার্নাল (১ম সংখ্যা), ইকবাল করিম হাসনু (সম্পাদিত) কানাডা, ১৯৯৯, পৃ. ৬

৩৩ হীরেন ভট্টাচার্য, *গণনাট্য সংঘের গান*, পৃ. ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পর্ব

বাংলাদেশের গণসংগীত

(স্বাধীনতা পূর্বকাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য

ভূমিকা ১৩

তেভাগা আন্দোলন ও বাংলার কৃষকবিদ্রোহ ; ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী গান; দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের গান; সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান; ভাষা-আন্দোলনের গান; ভোটের গান; শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান; সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী গান; ট্যাক্সের গান; রবীন্দ্র সংগীত আন্দোলন; উদ্দীপনা ও গণজাগরণের গান; ছাত্র ও নারীজাগরণ প্রসঙ্গ; সমবায়ের গান; ধর্মঘট ও মিছিলের গান; জেল বিদ্রোহের গান; '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধিকারের গান এবং অন্যান্য ১৫-১২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য

ভূমিকা; বিস্তার; শ্রেণী বিভাগ; বিভিন্ন সুরের কারণ ও উদ্দেশ্য; লোকসুর; (সারি, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, তরজা, গম্ভীরা, জারি, হোলি, ছাদ পেটানোর সুর ইত্যাদি); শাস্ত্রীয় সুর; আধুনিক সুর; বিদেশী সুর; বাদ্যযন্ত্র; গায়কী বিধান; উপসংহার ১২৮-১৭০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ প্রথম পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা পূর্বকাল)

ভূমিকা

বাংলা গানের জগতে গণসংগীত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা। গণসংগীত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা গানের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা এবং বিদেশী সংগীতকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে উঠেছে। সাধারণ অর্থে গণসংগীতকে প্রধানত দুইটি ধারায় বিভাজন করা যায়। প্রথমত লোক বা গ্রামীণ সংগীত, অপরটি শহুরে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় গড়ে ওঠা মিশ্রিত ধারা। চল্লিশের দশকে গণসংগীত জনতার সামনে হাজির হলেও তার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। তাই মিশ্রণ স্বাভাবিক। গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের কর্ম তৎপরতায় প্রথম থেকেই এইসব সমন্বয়ের পরিচর্যায় অনুগামী ছিল।[১] এই প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠবে সুরবৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বর্তমান পরিচ্ছেদের শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে চল্লিশের দশক থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে গণসংগীতের ভূমিকাকে অবলোকন করে। বিষয়বৈচিত্র্যকে প্রাসঙ্গিক করে আগে পরিপূর্ণ আকারে কোনো আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে অত্র বিষয়-বিভাজন নিয়ে অনেকের ভিন্নমত থাকতে পারে। এই বিভাজন বর্তমান গবেষক তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী এবং সার্বিক দিক বিবেচনা করে বিন্যস্ত করেছেন।

আরেকটি বিষয় উপস্থাপনযোগ্য যে, বিষয় বিভাজনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অনেক গানই উদাহরণ হিসেবে এসেছে, তা প্রাসঙ্গিক কারণেই এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের গণআন্দোলনের ভূমিকায় যে গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেই গানগুলোকেই এখানে প্রধানত অত্র গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নরূপ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে যে বিষয় বিভাজন করা হলো, তা প্রধান ৮ টি বিভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে আবার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সরাসরি বিষয়কে ধরে ক্রমানুসারে আলোচনা করা সুবিধাজনক মনে হয়েছে। বিভাগের মধ্যে একই বিষয় দুই বা ততোধিক বিভাগের আওতায় পড়ার দরুনই এই পথ অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যের মূল অধ্যায়ে রয়েছে নির্বাচিত ১৬টি বিষয়সহ মোট ২৪টি পর্ব। তাহলো যথাক্রমে–

বাংলাদেশের গণসংগীত বিষয়বৈচিত্র্য : স্বাধীনতা পূর্বকাল

১. তেভাগা আন্দোলন ও বাংলার কৃষকবিদ্রোহ; ২. ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী গান; ৩. দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের গান; ৪. সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান; ৫. ভাষা-আন্দোলনের গান; ৬. ভোটের গান; ৭. শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান; ৮. সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী গান; ৯. ট্যাক্সের গান; ১০. রবীন্দ্র সংগীত আন্দোলন; ১১. উদ্দীপনা ও গণজাগরণের গান; ১২. ছাত্র ও নারীজাগরণ প্রসঙ্গ; ১৩. সমবায়ের গান; ১৪. ধর্মঘট ও মিছিলের গান; ১৫. জেল বিদ্রোহের গান; ১৬. '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধিকারের গান; ১৭. বিবিধের মধ্যে রয়েছে ক. দেশ বিভাগের গান; খ. সাম্যবাদের গান; গ. ম্যালেরিয়া মহামারী বিষয়ে গান; ঘ. ভাঙা গান; ঙ. প্যারোডি গান; চ. জারি গান; ছ. দেশ ও মাটির গান এবং জ. অনুবাদী গান। নিম্নরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলন ও বাংলার কৃষকবিদ্রোহ

বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ব্যাপক না হওয়ার কারণ যে শুধু শিল্প কল-কারখানার পরিমাণ কম, কিংবা শ্রমিকদের উপর শোষণ ও নিপীড়ন করা হয় নাই– তা নয়। এদেশ মূলত কৃষিপ্রধান; এদেশের ক্ষমতাবাজ শোষক শ্রেণী বরাবর জুলুম নিপীড়ন চালিয়েছে কৃষকের উপর–কখনো মালিকপক্ষ, কখনো জমিদার বা মজুদদারের বেশে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকার বঞ্চিত কৃষক ও কৃষিনির্ভর মানুষ যাতে কোনোভাবেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে–সেই প্রচেষ্টাই তাদের উপর বর্বর আইন করে, জুলুম করে, সম্পদ কুক্ষিগত করে বঞ্চিত করেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে অবহেলিত কৃষক ও মজুরদের উপর জমিদারদের অত্যাচার, সম্পদ কুক্ষিগত করা যেমন হাতিয়ার ছিল, ব্রিটিশদের সাথে সু-সম্পর্ক রক্ষার কৌশল হিসেবেও তা বেশ সুবিধাজনক ছিল। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রায় দুইশ' বছরের ইতিহাস হলো কৃষক নিপীড়ন–কৃষক আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যত বিদ্রোহ হয়েছে, তার মূলে কৃষকেরাই গর্জে উঠেছে বারবার, দানা বেঁধে প্রতিরোধ করেছে জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এ সময়কালে প্রায় অর্ধশতাধিক বিদ্রোহের ঘটনা–যেখানে বিংশ শতাব্দীর আগেই ঘটে গেছে অধিকাংশ বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাস বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) থেকে যশোরের নীল বিদ্রোহ (১৮৮৯) পর্যন্ত প্রায় বত্রিশটি বিদ্রোহ[২] যার প্রমাণ। অর্থাৎ এই বাংলাতে কৃষকরা যত বড় বড় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে তার তুলনামূলক দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ছোট ছোট অথচ তীব্র ক্ষোভ-বিদ্রোহ; বিরাট-বিপুল সংঘবদ্ধতায় প্রকাশ পায় বিংশ শতাব্দীর তেভাগা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে।

"সবচেয়ে বড় কৃষক আন্দোলন ঘটেছে তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-'৪৮), ১৯৬৮-'৬৯ সনের কৃষক গণঅভ্যুত্থান, পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলন (১৯৬৭-'৭০)-এ হল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তেভাগা আন্দোলনে বাংলার ৬০ লাখ কৃষক অংশগ্রহণ করে। বাংলার ১৭টি জেলাকে প্লাবিত করে।"[৩] পূর্ববাংলার আরো কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮২০-১৮৫৬), দীর্ঘ সময় ধরে বার বার তারা অধিকার রক্ষার জন্য অন্যায় প্রহসনের বিরুদ্ধে ক্ষমতাবাজদের সাথে যুদ্ধ করে গেছে, এই গণ-অভ্যুত্থানে প্রায় ৫০ হাজার সাঁওতাল জনগণ অংশ নেয়। সরকারি বাহিনী ২৫ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করেছিল বিদ্রোহের নামে। কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙরের কৃষক সংগ্রাম, নানকার কৃষক আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ (১৯৪৯-১৯৫০), ময়মনসিংহের জমিদারী ও টংকপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, ঊনসত্তরের কৃষক গণ-অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যেমন অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি হয়েছে, তেমনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবও সাধিত হয়েছে; যার ফলে বাংলা ভাষায় নাটক, পুথি, প্রতিবাদী গান, স্বদেশীগানসহ নানান ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। গানের মধ্যে নিপীড়িত কৃষকের ঘটনা, ইতিহাস ও ভাষা বৈচিত্র্যের সম্মিলন ঘটেছে পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে।

৪০-এর দশক থেকে যখন গণসংগীতের আন্দোলন শুরু হলো, তখন থেকেই কৃষক বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে অসংখ্য গণসংগীত। কবিয়াল রমেশ শীল, কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ফণী বড়ুয়া, সলিল চৌধুরী রচনা করেছেন অসংখ্য জনপ্রিয় গান যার ভাষাবৈচিত্র্য, লৌকিক উপাদানের সম্পৃক্তি বাংলা গানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ধারাটির

Dhaka University Institutional Repository

সূত্রপাত অবশ্য অনেক আগে থেকেই । ব্রিটিশ-ইংরেজ নীলকর-বাহিনী বাংলার চাষীদের উপর যে প্রহসনমূলক অত্যাচার চালাতো, দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) নাটকে তারই অবর্ণনীয় চিত্র এঁকেছেন । তিনি গ্রন্থমধ্যে প্রতিবাদী ও শ্লেষাত্মক গানও লিখেছিলেন যা ব্রিটিশ উৎখাত আন্দোলনে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল । গানটি হলো–

'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কর্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ ম'লো
লং-এর হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার ।'

বাংলার প্রতিবাদী গানের অন্যতম পথিকৃৎ মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) । এঁদের মধ্যে একজন যাত্রা ও কালীমাতার শক্তিকে উপাস্য করে বাংলার আকাশ বাতাস দাপিয়ে বেড়িয়েছেন । অবারিত নতুন গানের সৃজন ও মঞ্চে পরিবেশন করার মতো ঘটনাবহুল বীরত্ব বাংলা গানকে যেমন শক্তিমান করেছে, অন্যদিকে ব্রিটিশদের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে । অন্যদিকে ঐশ্বর্যবান প্রতিভা নিয়ে বাংলার লোকসুর, শাস্ত্রীয় সুর, বিদেশী সুর এবং অনুবাদের মধ্যদিয়ে শোষিত-ব্যাথিত মানুষের মুখের ভাষায় গান রচনা করে বিপুল ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছেন । বাংলা স্বদেশী গানের ধারা প্রবর্তক অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩), কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) প্রমুখ । তাঁদের উত্তরাধিকারী পথ ধরে মুকুন্দ দাস ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানে নিয়ে এসেছেন বিপ্লব, প্রতিরোধ ও গণচেতনার ভাষা । মুকুন্দ দাসের লেখা–

'ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা॥'

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা জাগরণের গান–

'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল
আমরা ভালো করেই মরতে আছি,
মরব এবার চল॥'

এই গানগুলোই কৃষক আন্দোলনে প্রবল চেতনা জাগিয়েছিলো ।

কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস এত ব্যাপক ও দীর্ঘ যে কৃষকের গণসংগীতের পরিমণ্ডলে চল্লিশের শুরু থেকেই বেশ কিছু গান সৃষ্টি হয়েছে হলেও অনেক আগে থেকেই কৃষক বিদ্রোহের গানের অনেক নমুনা পাওয়া যায়, এমনকি বাংলার লোকসংগীত পর্যালোচনা করলে কৃষকের বঞ্চিতের হাহাকার প্রতি পরতে পরতে পাওয়া যায় । চল্লিশ দশক থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রাজনৈতিক ভাবে, দলীয়ভাবে কৃষকদের অধিকার নিয়ে গান লেখার যাত্রা শুরু করে । গণনাট্যের অন্যতম শিল্পী বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫) ছিলেন গণসংগীতের রাজপুত্র । তিনি রচনা করলেন–

'ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে
মালাবারের কৃষক সন্তান কৃষক সভার ছিল প্রাণ

Dhaka University Institutional Repository

অমর হইয়া রহিবে তারা দেশের দশের অন্তরে॥'

১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ মালাবারের কায়ুর গ্রামে ৪ জন কৃষক নেতা মাদাতিল আপ্পু, কুনজামর আয়ার, আবুবকর ও চির কন্দনকে প্রহসনমূলক বিচারের রায়ে ফাঁসি দেয়া হয় কালাপুর জেলে। সে সময় অন্ধ্রপ্রদেশের কমরেডদের মুখে এ বিষয়ে একটি গান রচিত হয়েছিল। শিল্পী বিনয় রায় সেই গানের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় গণসংগীতটি রচনা করেন। তাঁর আরেকটি গান সে সময় কৃষক আন্দোলনে অদম্য জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল, অসংখ্য শহীদ কৃষক নেতাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন–

'আর কতকাল, বল কতকাল, সইব এ মৃত্যু অপমান
প্রাণ আর মানে না
শহর বন্দরে চাষীর কুটিরে, নর খাদক দলের অভিযান
এ আর সহে না।'

শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৬) একাধারে সৃজনশীল প্রতিভা, রাজনৈতিক সচেতনতা, নীতির দৃঢ়তা নিয়ে আমৃত্যু অসংখ্য গান লিখেছেন। ১৯৪৯ সালে রাজশাহী জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন কৃষক মাধব নাথ। তাঁর স্মরণে সৃষ্টি করলেন–

'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ
সে কথা ভুলবো না
তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো কে
আন্ধার জেলখানা॥'

তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'তেভাগার সারি' নামে একটি দীর্ঘ গান লিখলেন–

'ও তোর মরা গাঙে আইল এবার বান (ওরে ও কিষাণ)
নতুন দিনের নতুন কিষাণ নতুন বিধান (কি রে)
ওরে যায় যদি যায় যাক প্রাণ–দিব না তো ধান॥'

সারি গানের ধাচে লেখা আরেকটি গান তৎকালীন কৃষক আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগ্রামে উভয় বাংলাতে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল –

'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাই রে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান॥

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে॥'

কৃষক জাগরণের জন্য অনেক স্বদেশী ও সংগৃহীত বেশ কিছু গান গাওয়া হতো গণসংগীতের আসরে বিষয়ানুসঙ্গের সাথে সমন্বয় রেখে। তেমনি একটি গান জয়নাথ নন্দীর লেখা[৪] শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় লোকশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর কণ্ঠে গীত হতো–

'দুঃখী ভারতবাসী চাষা
তাদের দশা কী বর্ণিব হায়

Dhaka University Institutional Repository

(তারা) শীতে বানে ঘোর তুফানে
কত কষ্ট পায়
দিবা ও নিশায়॥

সারাদিন মাঠে হাল বেয়ে
তারা দেশে ফলায় ধান চাল
কিন্তু তাদের অতি পোড়া কপাল
ঘরে থাকে না মুষ্টি চাল॥'

গানটি সম্পর্কে শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন–"জয়নাথ নন্দীর কৃষির প্রতি অদ্ভুত মমতা ছিল । শেষ বয়সে তাঁর নিজের একটা সবজীবাগিচা ছাড়া আর কিছুই ছিল না– দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে জীবন কেটেছে তাঁর । তবু তারই মধ্যে বেশ কিছু স্মরণীয় গান রচে গিয়েছেন তিনি ।...সুরের আশ্রয়ে গানটি তখনকার চাষীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার-প্রতারণার বাস্তববাদী, দরদী এক ছবি–যা তখনকার কবিয়ালদের গানে দুর্লভ ছিল । আমি নির্মলেন্দুকে নিয়ে এই গানটি নৈহাটিতে প্রাদেশিক গণনাট্য সম্মেলনে গেয়েছিলাম"[৫] । ৫০-এর দশকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ময়মনসিংহের মহানন্দ দাসকে নিয়ে দ্বিজদাসের গানও করেছেন বিভিন্ন গণমঞ্চে । শিল্পীর বক্তব্য অনুসারে "চাষীর দুঃখের কথা/ বলে জানাব কোথা/ অরণ্যে রোদন বৃথা/ আমি তা জানি'... দ্বিজদাসের এই গানটি মহানন্দকে নিয়ে আমি বহু mass meeting-এ গেয়েছি । দ্বিজদাস সম্বন্ধে সেইসময়ে কিছু অনুসন্ধান করে জানলাম, তাঁর আসল নাম বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী । ছিলেন জমিদারের কর্মচারী, অথচ লিখলেন জমিদারের দ্বারা নিগৃহীত চাষীর কথা ।"[৬]

কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের (১৯১৫-১৯৮৪) ভূমিকা ছিল সবসময় প্রত্যক্ষ । ১৯৪৩ সালে শেরপুর জেলার (তৎকালীন ময়মনসিংহ) নালিতাবাড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয় । কবিয়াল নিবারণ সেই অনুষ্ঠানে তাঁর দলবল নিয়ে স্বরচিত গান ও ছড়া নিয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন । ১৯৪৫ সালে সারাভারত কৃষকসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নেত্রকোণা জেলায় । এই সম্মেলনকে বানচাল করতে মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরা প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছিল । সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিবারণ পণ্ডিতকে প্রায় একমাস ধরে প্রচারকার্য পরিচালনা করতে হয়েছিল । এই প্রচারের মুখপত্র হিসেবে রচনা করেন–

'চলরে কিষাণ বাজিয়ে বিষাণ নিয়ে লাল নিশান
সম্মেলনে চলরে হিন্দু-মুসলমান
শুনতে পেলাম এই শহরে কারা নাকি প্রচার করে
এই সভাতে গেলে পরে থাকবে না আর জান
এই সভাতে বোমা ফেলতে আসতেছে জাপান
সম্মেলনে চলরে ভাই হিন্দু মুসলমান॥'

বলার অপেক্ষাই রাখে না এ অঞ্চলের কৃষকের দাবি ও অংশগ্রহণ সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সকল প্রকার অপপ্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয় । সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো নিবারণ পণ্ডিতের গান । কিশোরগঞ্জের বিন্যাটি গ্রামের অখিল চক্রবর্তীর কণ্ঠে গীত হয়েছিল তাঁর গান । হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই গান শুনে বলেছিলেন–"এক লক্ষ কৃষকের বিরাট জমায়েতের সামনে সভাপতির মঞ্চ থেকে নিবারণ বাবুর

Dhaka University Institutional Repository

গান ময়মনসিংহের বিখ্যাত গায়ক অখিল চক্রবর্তীর অনুপম কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল–'এক সাথে চল গড়বো মোরা রাঙা দুনিয়া ... । এই সম্মেলনে নিবারণ পণ্ডিতের জারিগান পরিবেশন করেছিলেন করিমগঞ্জ উপজেলার জব্বার বয়াতি, দুদু মিঞা প্রমুখের নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি কৃষক শিল্পী দল"[৭] উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে প্রখ্যাত শিল্পী সাধন দাশগুপ্ত একটি গান লিখেছিলেন–

'চাষী দে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশান রে
আন্ধার পথে আলো দেয় সে মুসকিল আসান করে॥

আমরা মাটির মানুষ ভাই
মাটির জয়গান গাই
হাজার কিষাণ বাজাই বিষাণ, নূতন দিনের ভোরে॥'

নীল বিদ্রোহ যদিও প্রায় অর্ধশতাব্দীরও আগে ঘটেছিলো, নিবারণ পণ্ডিত গণনাট্যের জোয়ারের কালে সেই ইতিহাসকে জাগিয়ে তোলার জন্য, জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষে ১৯৫৯ সালের দিকে জারিগানের আদলে রচনা করেন–(নাচসহ)

ধূয়া (সকলে) 'ও হারে ও নীলকরে করলো সর্বনাশ
ধনে প্রাণে চাষীকুল হইল বিনাশ, ও হারে নীলকরে ...'

টংক প্রথা নিয়ে আরেকটি বিখ্যাত গান লিখেছিলেন পুথির ধরনে–

'শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই গরীব চাষী শুনেন সর্বজন
কৃষক দরদী মণি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন॥

নব্বুই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ' তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়ে না পেয়াদায়॥

ললিত হান্নানের মত কর্মী এলো শত শত ফৌজী দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার॥'[৮]

স্বাধীন পাকিস্তান হওয়ার পর যখন মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিলো । কিন্তু সে আশাভঙ্গের কারণ ঘটলো পূর্বপাকিস্তানের উপর বৈরী আচরণ ও চাপিয়ে দেয়া ধর্মীয় আগ্রাসন । কবি তখন কৃষকদের সচেতন করে দিয়ে লিখলেন–

'ওরে ও কৃষক ভাই মোদের কি আর বাঁচবার উপায় নাই
চল সবে মিলে জোট বাঁধিয়া সরকারকে জানাই । ...
সাবধান রক্ষা কর যা যা আছে সম্বল
ঘরে ঘরে পাত সবে ইন্দুর মারার কল ।'

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় তেভাগার আইনকে স্মরণ করে আরেকটি গান লিখেছিলেন–

'আইন করতে হবে ভাই
ভাগ চাষীদের ন্যায্য দাবী তেভাগার লড়াই
এইভাবে আর চলবে কতদিন
পেড়ে ভাতে দিনে রাইতে খাটব চিরদিন
এবার মোদের এল সু-দিন দেশের মালিক ইংরেজ নাই
ন্যায্য দাবী, ন্যায্য দাবী তেভাগার লড়াই
মেঘে ভিজি রোদে পুড়ি পরের গোলায় ধান ভরি আমরা ভিখারী
শেষ কালে উবাসে মরি মাথা গুঁজবার পাই না ঠাঁই
ন্যায্য দাবী তেভাগার লড়াই ।'[৯]

গণসংগীত আন্দোলনের ইতিহাসে যার কথা অম্লান হয়ে আছে– তিনি হলেন সলিল চৌধুরী (১৯২৩-১৯৯৪) । শুধু কৃষক বিদ্রোহের গানই নয়, গণসংগীতের আঙ্গিকতা, চারিত্র্য ও সুরের নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি প্রবাদপ্রতীম হয়ে আছেন । গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানারে গাওয়ার জন্য প্রস্তুত একের পর এক সব অসাধারণ গান, তন্মধ্যে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে সৃষ্টি করলেন–

'হেই সামালো, হেই সামালো
হেই সামালো, ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো॥'

আরো লিখলেন– 'ঘুমাস না আর খোকা আমার বর্গী এলো দেশে
গোলা ভেঙে ফসল নিল, নামল আকাল শেষে॥

ঘাস-বিচুলি না পেয়ে কাল গাইটা গেছে মরে
ছোট্ট খোকা দুধ না পেয়ে বাঁচবে কেমন করে (গো)
সোনার ঘরে আঁধার রাতে মরণ ওঠে হেসে॥'

গানগুলো তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলসহ পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । কৃষকদের ন্যায্য অধিকার আদায়, সংগ্রাম ও চেতনার মর্মে স্পন্দন জাগাতে গানগুলোর ভূমিকা ছিল অপরিসীম । বাংলার শ্রেণী জাগরণের জন্য একটি অধ্যায়ের সূচনা করে এই কালজয়ী গান, যা শ্লোগানের ধারা থেকে বেরিয়ে আসা শিল্প-সম্ভব ভাষা এবং সুরের সংযোজনে নতুনত্বের ছোঁয়া প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলেছিলো বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের মিছিলকে ।

আরেকজন খ্যাতিমান রচয়িতার নাম অনল চট্টোপাধ্যায়, কৃষকের ভাগ্যহত জীবনের বর্ণনা এঁকেছিলেন মন্বন্তরের কালে, নিজের আবাদ করা ফসলের অধিকার যখন লুটেরাদের করায়ত্বে, সেই বঞ্চিতজনের উদ্দেশ্যে গান–

Dhaka University Institutional Repository

'কোথায় সোনার ধান হায়রে
শূন্য খামার কাঁদে ভাইরে
ক্ষুধায় জ্বলে প্রাণ রে'

৪৩ এর মন্বন্তরের কালে বাংলার মানুষের নিদারুণ দুঃখ কষ্ট আর হাহাকার, অথচ ধনিকশ্রেণী, মজুতদারের হীন-ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির নজির বিহীন ঘটনা দেখে রচনা করলেন–

'আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার
চাষের জমি পড়ে আছে চাষীর ঘরে অনাহার
গ্রামের লোকে পায় না খেতে জমিদারের গোলায় ধান
গোপন পথে আঁধার রাতে শহর মুখে যায় চালান
শহরেতে চালের পাহাড় লুকিয়ে রাখে মজুতদার॥'

কৃষক বিদ্রোহের সময়ে যে ঘটনাগুলো ঘটে, তার পূর্বকালীন সামাজিক-চিত্র বর্ণিত হয়েছে এই গানে। এটি হয়তো প্রত্যক্ষ চিত্র, কিন্তু এই ঘটনার পিছনে যে রয়েছে বাংলার সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও জাতীয় বিবেকে আরো অনেক সংকট ধরা দেয়, সেসব আলোচনায় আনা সম্ভব হচ্ছে না বিষয়ের বিবেচনায়।

তবে এটুকু বলা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার পর যখন পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান হলো, ঢাকা হলো পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। প্রথমদিকে দেশের শিক্ষিত ও সংস্কৃতমনা হিন্দু পরিবার পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগের জন্য কিছুদিন শূন্যতা লক্ষ করা যায়।

অবশ্য এরমধ্যেই বেশ কিছু সংগঠন 'প্রগতিশীল ছাত্র ফেডরেশন', 'প্রগতি সাহিত্য ও শিল্পী সংঘ', চট্টগ্রামের 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ', 'মুকুল ফৌজ', 'সংস্কৃতি সংসদ'সহ আরো অনেক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর বাইরেও বিভিন্নভাবে গণসংগীতের চেতনা মানুষের কণ্ঠে ভারতীয় গণনাট্যের গানগুলো ছাড়াও নতুন নতুন গানের সৃষ্টি হ'তে থাকে। আবার রবীন্দ্র, নজরুলের বা মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানকেও গণসংগীত হিসেবে চালিয়েছে। যেমন মুকুন্দ দাসের লেখা–

'ছিল ধান গোলা ভরা
শ্বেত ইঁদুর করলে সারা
দেখ্ না খুলে চশমা জোড়া'

ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের লেখা জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে একটি গান–

'ভারত করিল ভস্ম, রাজা জমিদার
এ সেকান্দারে ক্ষেতে খাটে চাষা দিনে রাতে
নাহি বৃষ্টি নাহি রৌদ্র, নিদ্রাহার
করিয়া কতই আশা আনন্দে উল্লাসে চাষা
দেখিবে যখন সেই শ্রম ফল তার
খাজনার ছল করি তখন লইবে হরি
অভুক্ত প্রজার সেই সুখের আহার॥

Dhaka University Institutional Repository

সারাটা বছর হায়, রোগে শোকে যন্ত্রণায়
অর্ধাহারে অনাহারে দীন পরিবার?
কেউবা শ্মশানে শোবে কলে বা কবরে শোবে
শিয়াল কুকুর কারে করিবে সৎকার॥[১০]

পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে স্বাধীনতার আগে বা পরে বিভিন্নভাবে কৃষকদের অধিকার প্রশ্নে গান রচিত হয়েছে, 'ময়মনসিংহের হাজং আদিবাসীদের–ধনেশ্বর চৌহান, চন্দ্র সরকার, কাঙাল দাস। রংপুরের সাঁওতালরাও তাদের নাচে গানে আনেন গণরূপ। এ জেলা থেকেই আসেন জামসেদ চাটি ও অন্ধ দোতারা বাদক টগর অধিকারী। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গাইতেন তেভাগা আন্দোলনের গান। টগর অধিকারীর একটি গান যেমন–

'দিনের শুভা সুরুজ রে
রাইতের শুভা চাঁদ
চাষীর শুভা হাল কৃষি
জমিনের শুভা ধান।

ও কৃষক হও আগুয়ান
ছল করিয়া লইয়া যায়
তোমার দেশের আমন ধান
চাষার অক্ত (রক্ত) পানি করিরে
দেশে হইলো সোনার ধান।
সেও ধান লইয়া যায় তোমার
দুষ্ট গবর্ণমেন্ট॥[১১]

আমরা যদি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেখানেও একটি প্রবল অধিকার সচেতনতার গণজোয়ার এসেছিল। যেমন আলকাপ গান, যাত্রা, কবিগান, বিচারগান, জারিগান, গম্ভীরা এসবের মধ্যে পৌরাণিক বা ধর্মীয় কাহিনীর পরিবর্তে আসতে থাকলো নতুন নতুন বিষয়। যেমন গুমানী দেওয়ানের আগে দেখা যায় কবিগানের বিষয় ছিল ইন্দ্রজিৎ–লক্ষণ, কৃষ্ণ–গান্ধারী, বিশ্বামিত্র–হরিশচন্দ্র, রাম–রাবণ, এজিদ–হোসেন ইত্যাদি অথচ ১৩০২ বঙ্গাব্দের পরবর্তীকালের[১২] বিষয় হয়ে দাঁড়ালো গণতন্ত্র–রাজতন্ত্র, জোতদার–কৃষক, ধনতন্ত্র–সাম্যবাদ, মহাজন–শ্রমিক, শিক্ষিত–চাষী প্রভৃতি বিষয়ে কবির লড়াই। গুমানী দেওয়ানের গানে আছে সে সময়কালের কৃষকদের সারা বছর পরিশ্রম শেষের পরে যখন মনেতে খুশি ভরে ওঠার কথা। অথচ সেখানে জোতদার-জমিদারদের খাজনা নামক ধোয়া তুলে সব ফসল কেড়ে নেয়ার পাঁয়তারা। এসকল বিষয় নিয়ে লিখেছেন–

'শুন ভাই পল্লিবাসী, মাঠের চাষী কৃষকের দল।
মাটি হলি, মাটি খুঁড়ে, ধন্য করে ধরাতল॥

তোদের হাতের বাগান গড়া, তোরাই মারলি আগাছা।
ফল ফলালি, সব হারালি, মরল কেঁদে তোর বাছা॥

ফলের পানে চেয়ে চেয়ে, ঘুম আসে না নয়ন বেয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

কতদিনে তরি বেয়ে পাড়ের কূলে উঠবি বল ।
রাত্রিতে বাদুড়ে চুষে, দিনে চুষে ভীমরুল॥

আমবাগানে আমের বদল, কামড় দিস ভাই আমরুল ।
মানুষের যা নেহাৎ দাবি, লুকায়ে মরল সবাই ।
তোরা এমনি করে যদি র'বি মানুষ হওয়ার কিবা ফল॥

পেটের তলায় গামছা বেঁধে না খেয়ে জনম কাটালি ।
ফুটিফাটা রোদের তলে বুকের পাঁজর ফাটালি ।
আজব স্বাধীন দেশে, ওই ফাটা বুকের রক্ত শোষে ।
আমাদের দোষে, কী বিধির দোষে, ভাঙলো না সে জাঁতিকল॥

ক্যানেল করে, আর বাজার দরে, তাজা রক্ত চুষে খায়
হাজার মাথা ভাঙিস যদি চাষীর তবু মুক্তি নাই॥

যতদিন যায় ততই জমে, করের বোঝা বাড়ে ।
এবার ওঝা হয়ে দে ভাই ঝেড়ে বিষ নেমে যাক রসাতল॥'

সাধারণত কবিগানের বন্দনা হয়ে থাকে প্রচলিত লোকদেব দেবী এবং প্রধান ধর্ম প্রবক্তাদের উদ্দেশ্য করে–কিন্তু একজন বর্ষীয়ান চারণ কবির বন্দনায় দেখা যায় অন্য কথা । যেমন–

'ভক্তিভাবে দেশমাতাকে নমি বারংবার ।
মায়ের মতন ভালবাসি দেশকে আমার॥

মায়ের বুকে আউস আমন বোরোধানের চাষ ।
তুলা পাট রেশমকীট চলছে বারোমাস॥

শাক সবজিতে পরিপূর্ণ মায়ের ভাণ্ডার॥
আউল বাউল দরবেশ গান মাতৃভাণ্ডারে
অফুরন্ত কবির টপ্পা আছে দেশ জুড়ে ।
কীর্তন গানের মধুর সুরে ঝরায় অশ্রুধার॥'

এখানে কৃষক ও কৃষি বন্দনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে লোককবির মুখে । অর্থাৎ জীবনের গভীর অঞ্চল থেকে যদি কবির মর্মপোলব্ধি না ঘটতো তা হলে কৃষি বন্দনা না করে দেবী বন্দনার মধ্যদিয়েই হয়তো কৃষকের মঙ্গল কামনা করতেন ।

বঙ্গভঙ্গ বা ভারত পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় গণনাট্যের অবদান পূর্ববঙ্গেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তবে এদেশের গণসংগীতে জারি-সারি, কীর্তন, কবিগান, এমনকি গম্ভীরার আদলে গণসংগীত লেখার প্রবাহ চলেছিল অপর দিকে লোককবিরাই প্রত্যক্ষ ভাবে গণজাগরণে সচল হয়ে উঠেছিলেন । গণসংগীত প্রবক্তাদের সুনজরে যে সব কবিয়াল-লোকশিল্পীরা এসেছিলেন তাঁরা তৎকালে আলোচিত হয়ে উঠলেও বেশিরভাগ শিল্পীরাই সেভাবে প্রচারিত হননি । বরং তারা গ্রামে-গঞ্জে, অঞ্চলে–আসরের শ্রোতাদের নাড়িয়ে গেছেন এমন নজির যথেষ্ট আছে । তবে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থান অনেকটা প্রত্যক্ষ ছিল বলে বহিরাঙ্গিক আন্দোলন সম্মুখে এসেছিল। বেহায়া ও ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি ও সুবিধাবাদিতার নির্লজ্জ আচরণে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ছিল। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা প্রকৃত ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারতো। এই ক্রান্তিকালের মধ্যদিয়ে "১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করার পর আমাদের এই জমিন খণ্ডে যখন মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল, তৎকালীন পরিস্থিতির ছবিটা ছিল এই রকম–শাসন ও শোষনের প্রক্রিয়া রইল একই। বরং নিপীড়ন নির্যাতন বেড়েই যেতে শুরু করল। শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম আমাদের দেশে তখনো তেমন হয় নি। তবে নির্যাতিত কৃষক জনসাধারণ সংগ্রামে মুখর হয়ে উঠেছিলেন একেবারে প্রথম অবস্থা থেকেই। তেভাগা আন্দোলনে দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী সমগ্র তল্লাট জুড়ে তখন সংগ্রামের লাল শিখা জ্বলছিল। ময়মনসিংহে হাজং বিদ্রোহ, রাজশাহীর নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ, সিলেটে টংক বিদ্রোহ–এমন লড়াইয়ে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে এদেশের মানুষ তখন মার খাচ্ছে তাদেরই মুসলিম ভাইদের হাতে"[১৩] আগে ব্রিটিশদের নিকট রাজনৈতিক ভাবে মার খাচ্ছিল; আর এই নব্য উপনিবেশ শুরু করে দেয় অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নিপীড়ন। পশ্চিম পাকিস্তানের নীতি যতই বিরূপ ও প্রহসনমূলক হয়ে উঠছিল, এদেশের মানুষও ভিতরে ভিতরে সমভাবে বারুদের মতো জ্বলে উঠছিল। গুমরে ওঠা প্রতিবাদ, চেপে থাকা আগুন ভিতরে বসবাস করছিল। সে সময় এদেশে ভাষা-আন্দোলনের আগে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ গণসংগীত সৃষ্টি কম হয়েছে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য ওপার বাংলায় অনেক ক্ষুরধার গণসংগীত সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাছাড়া কিছু গান এদেশের তৎকালীন অবস্থার সম্পূরক হয়ে গীত হচ্ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে গণসংগীত হচ্ছিল না তা বলা যাবে না। বরং লোকগায়ক-নায়কেরা সৃষ্টি করে ফেলেছেন অসংখ্য গণসংগীত, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবার মতো তেমন ক্ষেত্র ছিল না। এদেশের কবিয়াল, জারি শিল্পী, গম্ভীরা শিল্পীদের গানে সমাজ চেতনা, সময় ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কোনো কিছুরই ঘাটতি দেখা যায় না। তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হরহামেশা তৈরি করছেন গান, তান, ছন্দ ও বিষয়। গম্ভীরা যার প্রধান উপমা। উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা রীতি যুগযুগ ধরে সমাজের রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে তা নানা-নাতির চরিত্র নিয়ে উপস্থাপনা করা সুদীর্ঘ কাল থেকে হয়ে আসছে। গম্ভীরার বর্ণনা অনেক ব্যাপক ও সরাসরি থাকার কারণে ব্রিটিশ আমলেও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা মেনে নিতে পারতো না। সে কারণে পাকিস্তান আমলে সরকার বিরোধী চরিত্রের কারণে গম্ভীরার চর্চাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যাত্রা কবিগানের উপরও কম খড়গ ওঠে নি।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশবিরোধী গান

'সা রে গা মা পা ধা নি
বোম ফেলেছে জাপানি
বোমের ভিতর কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ'[১৪]

গণসংগীতের যে উৎকর্ষ ঘটেছিল চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মার্কসবাদের প্রভাবেই এই ধারণার পরিপুষ্টতা লাভ করে। তবে গণসংগীত আন্দোলন গণজোয়ারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পথ খুঁজে পায় মূলত দু'টি ঘটনার কারণে। তৎকালীন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর দোসর জাপান ও ইটালির একযোগে মহাসমরের ধ্বংসমুখী আগ্রাসন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা ঔপনিবেশিক ভারতকে তাদের আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ উভয়দিক দিয়ে চক্রান্ত ও আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতন, বর্বরোচিত গণহত্যার মধ্যদিয়ে মানবসভ্যতার ধ্বংসোৎসবকে বাঙালি শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ রুখে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নেয়। সংস্কৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে যেমন চিলির গণসঙ্গীতশিল্পী ভিক্টর জারা[১৫] (১৯৩২-১৯৭৩) কিংবা স্পেনের গণপ্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্য ক্রিস্টোফার কডওয়েল, রালফ ফক্স[১৬] (১৯০০-১৯৩৬) প্রাণ দান করেছিলেন। অন্যদিকে রাজপথ থেকে ফ্যাসিবাদী গুণ্ডাদের হাতে সোমেন চন্দের নিহত হওয়ার ঘটনা অগ্নিশপথ হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল বাংলার মানুষ। ৩০ দশকের শেষদিকে ১৯৩৯ সালে পূর্ববাংলায় প্রগতি লেখক সংঘ[১৭] স্থাপিত হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রগতিশীল ছাত্র মিলে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' বা YCI প্রতিষ্ঠা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিতে ঢাকাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গ'ড়ে ওঠে জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণের পটভূমিতে গঠিত 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এছাড়া ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সাফল্য এবং হিটলার বাহিনীর জঘন্য হামলার বিপদ সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন করে তোলার প্রক্রিয়া এই আন্দোলনে অব্যাহত ছিল।

১৯৪২ সালে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র যৌথ উদ্যোগে সদর ঘাটের ব্যাপ্টিস্ট মিশন হলে সপ্তাহব্যাপী একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা সমিতির সম্পাদক কিরণশংকর সেনগুপ্ত (১৮৯১-১৯৪৯) ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)। তিনি এই মেলার নাম দেন 'সোভিয়েত মেলা'। মেলায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক দলের উষ্ণস্পর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে তাঁরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করলেন। ১৯৪২ সালের সেই স্মরণীয় ৮ই মার্চের সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে ফ্যাসিস্ট ও তাদের ভাড়াটে সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে নির্মম ভাবে নিহত হলেন প্রতিভাদীপ্ত সাহসী তরুণ কবি, শিল্পী ও সমাজ সংগঠক সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)। সুপরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে তারা শ্রেণীজাগরণকে দমিয়ে রাখতে চাইছিল, কিন্তু ঘটনা উল্টোদিকে মোড় নিতে শুরু করলো। অমানুষিক জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জের গ্রাম-বাংলার মানুষসহ প্রায় সকল শ্রেণীর শিল্প-সাহিত্য মহলে তীব্র প্রতিরোধের দানা বাঁধতে শুরু করলো। আর সবশ্রেণীর মানুষকে একত্র করার দায়িত্ব পালন করলো ছাত্র সমাজ। 'নিখিলবঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন'-

Dhaka University Institutional Repository

এর কর্মীগণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ২৮ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউটে একটি শোক-সভার আয়োজন করে। সেখানে সমবেত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে গঠন করা হয় 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর সাংগঠনিক কমিটি। অতুল গুপ্ত হন সেই কমিটির সভাপতি, কবি বিষ্ণু দে এবং তরুণ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচনা করেন একটি অবিস্মরণীয় গান–

'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো দস্যু দলকে আজ
দেবে না জাপানী উড়ো জাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

এদেশ কাড়তে যেই আসুক
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক
তৈরি এখানে চড়া চাবুক
চলছে কুচ্‌কাওয়াজ।

একেলা তবুতো পাঁচ বছর
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর
তাই তো শহরে গ্রামে কবর
পাচ্ছে জাপ-বহর।

আমরা নইতো ভীরুর জাত
দেবো নাকো হতে দেশ বেহাত
আজকে যদি না হানি আঘাত
দুষবে ভাবি সমাজ।'

ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ আক্রমণে স্তম্ভিত এদেশবাসী যখন দেখলো জার্মানির দালাল হিসেবে জাপান চট্টগ্রামে বোমা নিক্ষেপ করলো, তখন তো আর পর্যবেক্ষণের সময় থাকে না প্রতিঘাত ছাড়া। বাংলা ভাষায় ভারতীয় যে কোনো ফ্যাসিবিরোধী গণসংগীত হিসেবে এটিই প্রথম। "এই সময় ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন– যামিনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, শচীন দেব বর্মন, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিনয় ঘোষ, আবু সঈদ আইয়ুব, চিন্মোহন সেহানবীশ, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখ। ১৯৪২ সালের ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর এই শিল্পী সাহিত্যিকদের যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় তাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখার্জীকে সম্পাদক রেখে কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের আগেই জুলাই মাসে সঙ্ঘ 'জনযুদ্ধের গান' নামে সংকলন প্রকাশ করেন"[১৮] সমাবেশ উপলক্ষে আরেকটি সংকলন প্রকাশ করা হয় 'একসূত্রে' নামে ১৯৪২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। চট্টগ্রামে জাপানী বোমা বর্ষণের পটভূমিকায় ক্ষুব্ধ এই সংঘের সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল প্রবল জোয়ারের মতো। একসূত্রের সম্পাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম কুদ্দুস প্রথম পৃষ্ঠায় টাইটেল হিসেবে ব্যবহার করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরের একটি গানের পংক্তি 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র জীবন/ এক কাজে সঁপিয়াছি সহস্রটি মন' সংযুক্ত করেন ।

ঐদিকে 'জনযুদ্ধের গান' এক বছরের মধ্যেই তিন তিনটি সংস্করণ বের হয় । প্রথম সংস্করণে ১২ টি গান, দ্বিতীয় সংস্করণে ৩০ টি গান স্থান পায় । বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় মৌলিক ও অনুদিত গানের সমন্বয় ছিল দৃষ্টান্তমূলক ।

"এইসব গানের মধ্যে ছিলো জনৈক অনুবাদকের অনুবাদে উর্দুতে ইন্টারন্যাশনাল, হিন্দিতে জলি কাউলের মৌলিক গান হলধরজীর একটি গান (কেক্‌রা কেক্‌রা নাম বতাও/ য়ে জগমে বড়া লুটেরোয়া হো/ মালিক লুটে মহাজন লুটে/ আও লুটে সরকারোয়া হো ।) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ'-এর হিন্দি অনুবাদ । বিনয় রায়, বিষ্ণু দে, প্রভাত বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় , সুকান্ত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, রংপুরের কমরেডদের লেখা একটি গান, কিশোরগঞ্জের লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের ছড়াগান, জনযুদ্ধের ডাক, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সত্যেন সেন, ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের এক বা একাধিক বাংলা গান এতে স্থান পায় । এ-ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দু'টি হিন্দি গানের অনুবাদ আর ট্রাম-শ্রমিক রহমানের লেখা একাধিক কাওয়ালি ধরনের গান ।"[১৯]

পূর্ববঙ্গেও সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলনের নতুন চেহারা পেতে থাকে । ফ্যাসিবাদ ও জাপবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে কৃষক সভার শাখাগুলো, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহ তৎপর হয়ে পড়ে । ঢাকার প্রগতিশীল লেখক সংঘ 'ক্রান্তি' নামে একটি সংকলন বের করে । আর সোমেন চন্দের মৃত্যুর পরেই তারা পাক্ষিক 'প্রতিরোধ' নামে আরেকটা মুখপত্র বের করে । অচ্যুত গোস্বামী ও কিরণশংকর সেনগুপ্ত মুখপত্রটি সম্পাদনা করেন । সেই সক্রিয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ, সরলানন্দ সেন এবং প্রগতিশীল মুসলিম লেখক ও সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখ । ফ্যাসিবাদ বিরোধী কর্মতৎপরতা সিলেটেও লক্ষ করা যায়–ফ্যাসিস্ট বিরোধী পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'বলাকা' প্রকাশের মধ্যদিয়ে । কালীপ্রসন্ন দাস এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ।

পত্র-পত্রিকা রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গণসংগীত রচিত হয়েছিল বিভিন্ন অবস্থান থেকে এবং ইতোমধ্যে গণসংগীতে যে বজ্রকঠিন কঠোর বিপ্লববাদী লেখার ঝনঝনা গণমানুষকে খুব একটা আকৃষ্ট করতে পারছিল না । সরাসরি প্রতিবাদী গান কেমন যেন সাধারণ মানুষের কাছে অন্তসারশূন্য মনে হচ্ছিল । তখন সিলেটের হেমাঙ্গ বিশ্বাসসহ অনেকেই রচনা করেছিলেন পল্লীভাষার সাথে সম্পৃক্ততা রেখে রম্য-শ্লেষাত্মক বিভিন্ন ধরনের গান । হেমাঙ্গ বিশ্বাসের তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যেমন–

'তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখরে চাহিয়া
তোর লুটে নেয় ফসল
দেশ-বিদেশী ধনিক, বণিক, ফ্যাসি দস্যুদল
পঙ্গপালে দলে দলে ছাইলো দুনিয়া । ...
জাপানের হাওয়াই জাহাজ
আসমান হতে মোদের বুকে হানছে কলের বাজ ।

Dhaka University Institutional Repository

তারা জোর জুলুমে কুলের বধূ নেয়রে হরিয়া ।'

ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায় প্রবাদ-প্রবচনের ভাবধারা নিয়ে রচনা করলেন–

'খাল কেটে কুমির ডেকে আনবো না ভাই আজ
লক্ষ বছর ফেলব না আর মায়ের চোখের জল॥'

ঢাকার সাধন দাশগুপ্ত লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী অনেক গান গেয়ে বেড়াতেন । একটি বিখ্যাত শ্লেষাত্মক গানের উদাহরণ দেয়া যায়–

'আরে দে দে স্টালিন ভাই,
পায়ে পড়ি ছাইড়া দে
আর্য হিটলার মরি লাজেতে॥

আমরা যত জার্মান পুরুষ ছিলাম নাজী দলে
সবার শক্তি হরণ কইরা ললি রে কোন ছলে॥ ...'

হিটলারের চরিত্র, হিংস্রতা ও পরিণতির মর্মবাণী অনেকটা শ্লেষাত্মক আকারে তুলে ধরেছেন গীতিকার । গানটি সর্বমহলে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । প্রতিরোধ পত্রিকার সম্পাদক কিরণশংকর সেনগুপ্ত-এর ভাষ্যমতে–"মাত্র দু'চারজন সঙ্গী নিয়ে তিনি (সাধন দাসগুপ্ত) সে সময় পূর্ববঙ্গের নানা সভায় লোকসঙ্গীতের সুরে নানা গান পরিবেশন করেন । গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে, ফ্যাসিবিরোধী ও স্বদেশ প্রেমে অনুরণিত এই গানগুলি এক সময় খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল । লোকসঙ্গীতের সুরে তিনি শহীদ সোমেন চন্দকে নিয়ে স্মরণীয় একটি গান লিখেছিলেন । এছাড়া ঢাকার মুসলিম ওস্তাগরদের ছাদ পিটানো গানের অনুসরণে তাঁর 'দে দে স্টালিন ভাই, পায়ে পড়ি ছাইড়া দে, আর্য হিটলার মরি লাজেতে' গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো ।"[২০] ঢাকার আঞ্চলিক সুরের ছন্দময় ছাদ পিটানো গান–'আর দে দে কানাইয়া লাল বসন আমার হাতে দে/ কুল নারী মরি লাজেতে' একসময় লোক মুখে মুখে গীত হতো খুব । গীতিকার এই গানটিরই মর্ম ও সুরের তীক্ষ্ণতাকে ধারণ করে রচনা করেছিলেন বলেই তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী মন্তব্য করেছিলেন যে, এই গানটিই বলা যায় বাংলাগানের প্রথম রাজনৈতিক কৌতুক-গীতি অন্তত গণসংগীতের ধারায় । শহীদ সোমেন চন্দের উদ্দেশ্যে লেখা যে গানটি মর্মস্পর্শী হয়েছিল, গানটি হলো–

'তোমার বুকের খুনে পথ কে ভাসায় বন্ধু, একবার বল না
(আহা) ছোবল মারিল প্রাণ হইরা নিল কোন সে সাপের ফণা॥

সেদিন তোমার হাতে যে নিশান ছিল বন্ধু, মোদের লাল নিশান,
লাল নিশানের মান রাখিতে দিলা তোমার প্রাণ,
মইরা বন্ধু শহীদ হইলা পথ দেখাইলা,
রাইখা গেলা জয়ের নিশানা॥'

চট্টগ্রামেও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার লক্ষ করার মতো । চট্টগ্রাম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'কবিয়াল সমিতি' কবিয়ালদের সংগঠিত করে রাজনৈতিক ও সমাজ সচেতনতা মূলক কবিগানের রচনা করা হয়েছিল । মাইজভাণ্ডারী কবিয়াল রমেশ

Dhaka University Institutional Repository

শীল এই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের অগ্রনায়ক ছিলেন । সেইসময় ব্রিটিশ বিদ্রোহ, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও দুর্ভিক্ষসহ নানামুখী সংকটে অনেকগুলো কবিগান রচনা করেছিলেন । শ্রেণী চেতনায় দীক্ষিত এই শিল্পীর আগুন ঝরা রচনার বেশ কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলো–

'আমার খুনে মোটর গাড়ী, তেতালা চৌতালা বাড়ি
আমার খুনে রেডিও আর বিজলি বাতি জ্বলে ।
আমি কৃষক তুমি মজুর দিনে রাতে খাটি
দুই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি
একসঙ্গে নিশ্বাস ছাড়ি পর্বত উড়াতে পারি ।'

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় । ভারতের পূর্ব-সীমান্তে জাপানের বোমা নিক্ষেপ, অপরদিকে নাৎসীদের কাছে স্বয়ং ব্রিটিশদের পর্যুদস্ত হওয়া ভারতের জনগণের কাছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কৌশল ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চক্রান্ত এবং যুদ্ধের নামে বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুদ করে জনগণকে চরম দুর্ভিক্ষ দুর্দশায় নিপতিত করে এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল । অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এই দ্বিমুখী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা করতে গিয়ে চিরশোষক ও শত্রু ব্রিটিশদের দোসর হয়ে ওঠার মতোও কোনো পথ ছিল না । এমতাবস্থায় স্বাধীনতার প্রবল বাসনা ভারতের বিপ্লবী মানুষকে এক গণচেতনামুখী জোয়ারের দিকে প্রবাহিত করেছিল । সোমেন চন্দের মৃত্যু সেই আগুনে ঘি ঢালার মতো উত্তেজক হয়ে উঠেছিল । তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা করতে গিয়ে অবশ্য ব্রিটিশদের সাথে বিদ্রোহের ব্যাপারটা সামান্য হলেও স্থিমিত হয়ে পড়ে । তৎকালে যে গণসংগীত দুইবাংলায় রচিত হয়–সেখানে ব্রিটিশদের কথা অনেকক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায় রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার কারণে । দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে জিন্নাহ-গান্ধি কিংবা হকের ভূমিকায় ব্রিটিশদের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দর্শন সামান্যতম প্রভাবিত করে থাকলেও প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের মধ্যে উভয়পক্ষীয় সংকটে সঠিক দিক নির্দেশনার ইঙ্গিত কারো কারো গানে প্রস্ফুটিত হয়েছিল । গণসংগীত সম্রাট হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা লোকসংগীতের আদলে এই গানটি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অমর সৃষ্টি বিবেচিত হয় । যদিও ১৯৪২ সালে কৃষক জাগরণের উপর ভিত্তি করে লেখা এই গান, কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার জাগরণে ব্রিটিশ-জাপানীদের শত্রু চিহ্নিত করা হয়েছে মর্মপোলব্ধির ভেতর দিয়ে । গানটি হলো–

'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাই রে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান॥

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে॥

শান দিও, জোরসে দিও, দিও বারে বার
হুঁশিয়ার ভাই, কভু তাহার, যায় না যেন ধার রে॥

ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান
বিদেশী সরকার ঘরে দুয়ারে জাপান-রে॥

একতায় ভাই চীনের মানুষ হইল বলিয়ান

Dhaka University Institutional Repository

ছয়টি বছর জাপানিরে করলো যে হয়রান–রে॥

এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, ঘুচবে অপমান–রে॥

পরবর্তীকালেও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রাজনৈতিক দর্শনগত কথাবার্তায় এসকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। তাঁর জীবনীতে লিখেছেন–

"দেশে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ওদিকে বর্মা সীমান্তে জাপানী ফ্যাসিস্টরা আগতপ্রায়। আমাদের পার্টির তখনকার 'জনযুদ্ধ' লাইন তত্ত্বগত ভাবে ঠিকই ছিলো, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের মারাত্মক ভুল থেকে গেল। সশস্ত্র গণবাহিনী তৈরি ক'রে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি বজায় রেখে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রয়াসের সহায়তা করার বদলে আমরা ব্রিটিশদের যুদ্ধপ্রয়াসেরই লেজুড় হয়ে উঠলাম। দেশব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান থেকে আমরা দূরে সরে নিষ্ক্রিয় থেকে কেবল সমালোচনা করলাম। কেবল তাই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে আমরা পঞ্চম বাহিনীর কাজ বলে চিহ্নিত করলাম।"[২১]

সে সময়কালে রাজনৈতিক সচেতনতা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু পার্টি লাইনের অদূরদর্শিতা, ব্রিটিশদের সূক্ষ্ম রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, তৎকালীন গণসংগীতে যে রকম প্রখরভাবে আসার কথা ছিলো, তা তো আসেই নি বরং মূল শত্রুকেই সুবিধাজনক অবস্থানে রাখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলো। ফ্যাসিবাদ বা জাপান ভারতের উপর আঘাত হানলেও মূলত সে আক্রমণ ছিলো ব্রিটিশদের উপর। আবার ব্রিটিশরাও সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে যে কৌশল গ্রহণ করে তার ফলাফল ছিল ভারতে বাংলার দুর্ভিক্ষ। ব্রিটিশরা ভারতের জনগণকে আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভালো রকম সুবিধা পেয়েছিলো। অথচ ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ নিয়ে অসংখ্য গান রচিত হলেও ব্রিটিশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটা তেমন প্রত্যক্ষ মনে হয় নি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন রুখতে কম্যুনিজম রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন-ব্রিটেন আমেরিকা মিত্রবাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। "৭ই ডিসেম্বর জাপান জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিল এবং ঝটিকা আক্রমণে পার্ল হার্বার নামে বিখ্যাত মার্কিন বন্দর বোমা-বিধ্বস্ত করিল। পরদিন ৮ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইউরোপীয় যুদ্ধ এতদিনে সত্য-সত্যই বিশ্বযুদ্ধে রুপান্তরিত হইল।"[২২]

এই সংকটের কালে পূর্ববঙ্গসহ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড়লাট সাহেব কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখালেও মূলত ভিতরে চক্রান্ত ও প্রতারণাই ছিলো মুখ্য। বাংলার বিশাল ভূখণ্ডকে নিজেদের সুবিশাল ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার ফলেই ব্রিটিশদের সৃষ্ট খাদ্য সংকটে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করলো। বিশিষ্ট কথাশিল্পী শওকত ওসমান এর ভাষায়–

"চট্টগ্রামের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ১৯৪৩ সনে, ছেচল্লিশ বছর পূর্বে এক ছাত্র-সম্মেলন উপলক্ষে। তখনও ব্রিটিশ আমল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চোটপাট চলছে পরাধীন ভারতবাসীদের উপর। এই সময় দুর্ভিক্ষে ষাট লক্ষ লোক মারা যায়। "তেতাল্লিশ-এর মন্বন্তর" নামে খ্যাত সেই কালের মর্মন্তুদ ছবি

Dhaka University Institutional Repository

আজও ভুলে যাই নি। পথে ঘাটে মরা মানুষের লাশ পড়ে থাকত। যুদ্ধের জন্য ইংরেজ সরকার খাদ্য গুদামজাত করে রাখে। ফলে অন্নাভাব।"[২৩]

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাপানের আঘাতকে ব্রিটিশদের প্রতি নমনীয় হয়ে উঠার পরিবর্তে বরং ব্রিটিশ বিতারণের জন্য ভারতীয় জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষাবলম্বনই ছিল উৎকৃষ্ট উপায়। ব্রিটিশ বিতারণের আন্দোলন তো অনেক আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল। সেই সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহসহ বিভিন্ন আন্দোলন। প্রাক-বঙ্গভঙ্গ যুগের দেশাত্ববোধক গান, বঙ্গভঙ্গ যুগ (১৯০৫-১৯১১) এবং পরবর্তীকালের গানেই ছিলো ব্রিটিশ বিরোধিতার সুর। স্বদেশী যুগের গানে দেশচেতনার যে পরিচর্যা এমনকি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অগণিত গান রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি...' গানটি কিংবা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' যেমন স্বদেশ প্রেম যুগিয়েছে অপরদিকে শাসক শ্রেণীর স্পর্ধিত, উদ্ধত আচরণকে ধিক্কার দিয়ে রচনা করেছিলেন–

'চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাইরে তোমার, সবে না সেই টান ...

আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরী খান॥'

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথসহ আরো উল্লেখযোগ্য গীতিকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলাম-এর গানে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রবল ছিল। এমনকি তৎকালীন বেশ কিছু গান বাংলাদেশে এবং ভারতীয় গণনাট্যের তৎপরতায় গীত হ'তে হ'তে গণসংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গণসংগীতের একটা মজবুত চেতনাগত অবস্থান গ'ড়ে উঠলেও ব্যাপক ও পরিস্থিতির সংকুলান গণসংগীত রচিত হয়নি। ফলে ঐ গানগুলোর বিকল্পও ছিলো না আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে। যেমন মুকুন্দ দাসের লেখা–

'ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥

কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষী ধর্মসাক্ষী,
জগৎ ভ'রে আছে জানা।
চটক্‌দার কাঁচের বালা ফুলের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না॥

বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে
কোটি টাকার কম হবে না।
পুঁতি কাচ ঝুটো মুক্তায় এই বাংলায়,

Dhaka University Institutional Repository

নেয় বিদেশী কেউ জানে না॥

ঐ শোন্ বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যা ।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না॥

আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না ।
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা যে তোরা চিনলি না॥'

এইগানে বিদেশী যাবতীয় দ্রব্য বর্জনের ঘোষণা এবং নিজ দেশের দ্রব্যকে ব্যবহারের আহ্বান করেছেন । আরেকটি গানে তীক্ষ্ণ উপমা দিয়ে তীরন্ধারের ছলে বুঝিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশদেরকে সাদাভূত বলে । তাদের নগ্ন শোষণের চিত্র তুলে ধরার জন্য কবিকে রাজদ্রোহে দণ্ডিত করা হয়েছিল । গানটি হলো–

'বাবু বুঝলে কি আর ম'লে
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে
একদম দফা সারলে ।'

মুকুন্দ দাসের আরো বেশকিছু গান গণসংগীত হিসেবে গাওয়া হয়েছে এবং এখনো গাওয়া হয়ে থাকে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

'আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ।' ইত্যাদি

বাংলার জাতীয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানগুলোই গণসংগীতের ধারণাকে সুপুষ্ট করেছে একথা বহুজন স্বীকৃত এবং তিনি ১৯২৬ সালে ইউজিন পেতিয়ের 'ইন্টারন্যাশনাল' গানের ভাবানুবাদ করে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান । একের পর এক বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী গান লিখে জনতার মঞ্চে ছিলেন অনন্য নায়ক । কয়েকটি গানের স্তবক তুলে ধরা হলো–

'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ।'

অথবা– 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার ।'

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ক্ষুদিরাম বোস তৎকালীন লর্ডকে হত্যা করতে উদ্যত হয় । পরে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় । ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা পীতাম্বর দাস বাউলের গান অতি জনপ্রিয় হয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী ।'

এই গানগুলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার এনেছিল–যা আজো লোকসমাজের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে ।

স্বদেশী গানকে যদিও কখনো গণসংগীত রূপে আখ্যায়িত করা হয় নি তার বিশেষ দু'টি কারণ হলো– প্রথমত সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ এরমধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি । দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারাও এই গান প্রভাবিত নয় । কারণ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এই চিন্তাদর্শের উদ্ভব এবং প্রয়োজনীয়তা সেভাবে উপলব্ধি করা হয় নি । যার প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘের কাছে থাকলেও বাংলাদেশে সর্বহারাবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন অপেক্ষা বেশি ছিল বন্দিত্বের অবসান । ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত এই গানগুলোর আবেদন কখনো কমে নি । প্রকৃতপক্ষে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বা গণজোয়ারের কালে গণনাট্যসহ বাংলার বিভিন্ন আসরে সার্বিকভাবে এই গানকে অবলম্বন করেই পরিচর্যিত হয়েছে ।

১৯৪৩-৪৪ সালে শ্রীহট্ট জেলা গণনাট্য সংঘ এবং প্রায় একই সময়ে শ্রীহট্ট জেলা প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় । গণনাট্য সংঘের সভাপতি হলেন সত্যভূষণ চৌধুরী, সহ-সভাপতি অশোক বিজয় রাহা ও ফণি দাস, সাধারণ সম্পাদক হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস । অপর দিকে প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি হলেন বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি সত্যভূষণ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অশোক বিজয় রাহা । তৎকালীন রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত সমস্যা দেখা দিলেও গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা সফল সংঘ তৈরি করতে পেরেছিলেন । ১৯৪৩-৪৬ সালের মধ্যে তাঁদের আমন্ত্রণে সিলেটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসেন । হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্য অনুযায়ী-

"মাণিক বাবু তাঁর আলোচনায় সাহিত্যের পার্টিজানশীপ, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষপাতিত্বের সপক্ষে বলেন । বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে স্তালিন হারকিউলিস এবং এনটিউসের উপমা দিয়েছিলেন । ধরিত্রী সন্তান এনটিউসকে যতক্ষণ মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নি ততক্ষণ হারকিউলিসের শক্তিও তাকে পরাস্ত করতে পারে নি । যে মুহূর্তে তাকে মায়ের বুক থেকে অর্থাৎ শূন্যে তুলে নিতে পারল তখনই হারকিউলিস তাকে মেরে ফেলতে সক্ষম হল । মাণিক বাবু গল্পটি বললেন, সাহিত্যিক শিল্পীদের বেলায়ও স্তালিনের কথাটি সমান সত্য । জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় ।"[২৪]

এখান থেকেই বোঝা যায় যে গণসংগীত নিয়ে অনেক সৃজনশীল প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু জনমানুষের সাথে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ ও কম ছিল না । তাই অনুষ্ঠানগুলোর সাফল্য আনতে রবীন্দ্র সংগীত পর্যন্ত গাওয়া হতো । তবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস গণসংগীতকে জনপ্রিয় করার জন্য লোকসংগীত থেকে বিদেশী জনপ্রিয় কথা ও সুর থেকে ধার করে অনেক সফল গানের সৃষ্টি করেছেন । সেইসাথে উভয় বাংলায় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন ।

সিলেটের গণনাট্য সংঘের আয়োজনে ১৯৪৩ সালে 'বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন'-এর একটি কালচারাল স্কোয়াড সিলেটে এসে জাপবিরোধী গান করে, ১৯৪৪ সালে সিলেটের 'গণনাট্য সংঘ' কলকাতার

Dhaka University Institutional Repository

'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে' প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি ১৯৪৬ সালে নেত্রকোণা সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনের আয়োজন তারই স্বাক্ষর বহন করে। তখন বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গানও সৃষ্টি হয়েছিল। গানগুলো প্রধানত ব্রিটিশ বিরোধী; এছাড়া দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন-বিজয় ও বাংলা ভাগাভাগির প্রতিক্রিয়া, ব্রিটিশদের ফিরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক গান পর্যাপ্ত পরিমাণ রচিত হয়েছে বলা যায়। নিম্নরূপ অধিক প্রচারিত ও পরিবেশিত কিছু গানের তালিকা দেয়া হলো। হরিপদ কুশারীর–

'মরণ শিয়রে দলাদলি করে
কেমনে বাঁচিবি বল',

সলিল চৌধুরীর– 'মানবো না এ বন্ধনে
মানবো না এ শৃঙ্খলে।'

এবং 'ও মোদের দেশবাসী রে
আয়রে পরাণ ভাই আয়রে রহিম ভাই'

এবং 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা'

এবং 'নাকের বদলে নরুন পেলাম
তাক ডুমা ডুম ডুম' উল্লেখযোগ্য।

কবিয়াল রমেশ শীলের রচিত–

'ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল
সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদেতে পা দিয়ে সর্বনাশ হল॥'

বিনয় রায়ের লেখা জাপবিরোধী গান–

'হোই হোই হোই জাপান ঐ
আইসে বুঝি হামার টারিত
বাইর‍্যাও গাঁওয়ের গেরিল্লা জুয়ান।'

কবি সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে সুরারোপিত–

'অবাক পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে ছাড়খার তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত ও সুরারোপিত-

'ওরে ও চাষী ভাই'

সুনামগঞ্জের কৃষক নেতা রাজেন্দ্র নন্দীর ভাটের সুরে লেখা–

'আজি দেখ না চেয়ে' ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশরা চলে গেল। ভাগ করে দিয়ে গেল ভারত, কিন্তু ভাগের পুরো বঞ্চনা কাঁধে নিতে হলো বাঙালি জাতিকে। কেন যেন এই ভারতের বুকে যত দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বাঙালিকেই বরণ করতে হয়। পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ অবধি। তবু বাংলাদেশ সকল প্রহসন ভেঙে বেরিয়ে আসে বীরত্বের সৌকর্য বুকে ধরে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অতি জনপ্রিয় গান 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য' একটি শ্লেষাত্মক গণসংগীত। ব্রিটিশদের বিতারণের পর তাদের এতদিনের শাসনের কাল ও পরিণতি নিয়ে রচিত গান গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। গানটি হলো–

'মাউন্টব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও। ..'

দীর্ঘ দুইশতাব্দী অপশাসনের পর ব্রিটিশদের যে সুবিধা নেয়ার তার সবটাই নিয়েছিল শুধুমাত্র এই ভারত ভূখণ্ড এবং ভুখা নাঙা মানুষ গুলো ছাড়া। এর ভিতর দিয়ে ফ্যাসিবাদের দস্যুবৃত্তি ভারতকে তছনচ করে ফেলে। এর ভেতরেও মানুষ দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে প্রতিরোধ করে, এটা ভারতবাসীর জন্য বিস্ময়কর নয়। উর্বর মাটির উপর হাজার হাজার বছর ধরেই দস্যুবৃত্তি ছিল। তাই সংগ্রামই শিরোধার্য। অন্তত ব্রিটিশদের বিতারণের জন্য গান দিয়ে তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল বলেই তারা চলে যায়। ভারত স্বাধীন হয়, শুরু হয় নতুন নতুন সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের গান

বাংলাদেশে ১৯৪৩, ১৯৬৯, ১৯৭৪সহ নানা সময়ে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বিষাদময় ও প্রহসনমূলক ঘটনা বলে পরিচিত। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা এবং ব্রিটিশদের আখের গুছিয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্য যাবতীয় চাতুর্য, অন্যদিকে রাজনৈতিক মতবিরোধের কোপানলে সাম্প্রদায়িকতার হীনমন্য সংঘাত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের উপর প্রভাব ফেলেছিল দুর্ভিক্ষের মতো নিষ্ঠুর ফলাফল নিয়ে। আবুল মনসুর আহমদের স্বচক্ষে দেখা রর্ণনায় সেই চিত্র ভেসে উঠেছে করুণ ভাবে। "কলিকাতা শহরের রাস্তাঘাটে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তাই এতদিন পরেও বিষম যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মতোই স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং গা শিহরিয়া উঠে। অভুক্ত-নিরন্ন, রুগ্ন-অস্থি-চর্মসার উলঙ্গ নরনারীর মিছিল আমরা শুধু এই সময়েই দেখিয়াছি। ডাস্টবিনে খাদ্যের তালাশে মানুষে-কুত্তায় কাড়াকাড়ি করিতে তখনি আমরা প্রথম দেখিয়াছি। অভুক্ত উলঙ্গ কংকাল সমূহের এই মিছিলের যেন আর শেষ নাই। কোথা হইতে এত লোক আসিতেছে? খবরের কাগজে পড়িলাম, শস্য ভাণ্ডার পূর্ব-বাংলার পল্লীগ্রাম হইতেই এই মিছিল আসিতেছে বেশি।"[২৫] এই সময়কালে পূর্ববঙ্গে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক মতান্তরে ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। তেতাল্লিশের মন্বন্তর খ্যাত বিভীষিকাময় সময়ে বাংলার পথ-ঘাটে মানুষের লাশ। পশু-পাখির সাথে মানুষের খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির চিত্র ভেসে উঠেছে গানে কবিতায় চিত্রে ও নানা রকম মাধ্যমে। আর এটি যে ব্রিটিশ শাসকদের চক্রান্তমূলক রাজনৈতিক অভিযান এবিষয়ে তথ্য উদঘাটন করলে দেখা যায়–"১৯৪৩-১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানীয় উৎপাদন ঘাটতি অপেক্ষা ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বণ্টন ব্যবস্থা এবং অজন্মা সত্ত্বেও অব্যাহত শস্য রপ্তানিই অধিকতর দায়ী। এই সময় ভারতের ৪০ লক্ষ টন শস্য ঘাটতি সত্ত্বেও ১০ লক্ষ টন শস্য রপ্তানী করা হয়।"[২৬]

দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩, শিল্পী জয়নুল আবেদীন।

ফলে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদে গণজাগরণের বিকল্প আর কিছুই ছিল না। তা মিছিল-মিটিং-এর সাথে সাথে গণমুখী শিল্পের দিকে বেশি তাৎপর্য বহুল হয়ে উঠেছিল–'গণনাট্য সংঘ'ই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গণনাট্য সংঘের তৎপরতায় 'গণসংগীত', 'গণনাটক', 'গণসংস্কৃতি'র দুয়ার উন্মুক্ত হয় এবং পূর্ববঙ্গের সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণাসহ নানা অঞ্চলে গণসংগীতের চর্চা উল্লেখযোগ্য অবস্থা ধারণ করে। রচিত হয় অনেক গান ও কবিতা। এছাড়া ফ্যাসিবাদের দোসর জাপানের বোমাবর্ষণ এবং ব্রিটিশ বিরোধিতার পূর্বাপর সকল চেতনাকে বিক্ষোভী আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। গণজোয়ারের ফলেই ব্রিটিশদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। গণ-আন্দোলনে গণসংগীতের মর্মার্থে

Dhaka University Institutional Repository

বৈশ্বিক আদর্শ এসময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত ফ্যাসিবাদী যে দানবীয় শক্তি পৃথিবীর মানবসভ্যতা ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে একটি নৈরাজ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে উদ্যত। সারাবিশ্বের মানবশক্তিই তার বিরুদ্ধে তখন সক্রিয় সংগ্রামে রত, বাংলাদেশও সেই মোকাবেলার অংশীদার হয়। তারই সূত্র ধরে কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত, অনল চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, তুলশী লাহিড়ী, হরিপদ কুশারী, শাহ আবদুল করিম প্রমুখের গান দুর্ভিক্ষে ব্যাপকতা ধারণ করেছে। কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের মুখে–

'গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়
কে বাঁচাবে তারে কে বাঁচাবে ওরে, আয় ওরে আয়।
সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলে না রে আর সোনার পল্লী হলো যে আঁধার
নিশ্চিহ্ন হলো কতো পরিবার গ্রামবাসী আজ অসহায়॥'

মহা-মন্বন্তর জনিত এই গানটিতে পল্লী বাংলার ঘরে-বাইরের বাস্তব করুণ চিত্র বিধৃত হয়েছে। পল্লীবধূর ভিখারিণী বেশ অন্ন-বস্ত্রের খোঁজে, কেউ দাসীপনায়, কারো ঘরের সামনে শ্মশানের মানচিত্র, কারো সন্তান হারানোর ব্যথায় মূমুর্ষ ও কাতরতার বর্ণনা। কবিয়ালের আরেকটি গানে দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্যান্য জিনিষের সাথে লবনাভাব, বস্ত্রাভাব নিখুঁত বর্ণনা এসেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ সৃষ্ট প্রহসনমূলক কন্ট্রোল ব্যবস্থার বাস্তবতা স্যাটায়ারের আঙ্গিকে তুলে এনেছেন। গানটি হলো–

'আমার মাঞ্জুর মায়ে কন্ট্রোল বুঝে না
রান্‌তে গেলে কানতে বসে লবন ছাড়া রান্‌ধে না॥

ও আহারে, কার্ড লইয়া কত ঘুরলাম
কত্ত বাবুর পায়ে ধরলাম
ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে
ও আহারে, আমার ভাঙা ঘরে নেড়ার ছানি
মেঘ না হইতেই পড়ে পানি
টেপটেপানি গেল নারে
আমার টেপটেপানি গেল না॥'

এ ধরনের বিভিন্ন গানে উঠে এসেছে পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখময় জীবনের বয়ান। 'মাঞ্জুর মা' যিনি সমাজের ঠগ ও প্রতারণার কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রহসন বোঝেন না। খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার থেকে কী কী ভাবে দুর্নীতিবাজরা বঞ্চিত করেছে, মানুষ রোগে-শোকে ভুগে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরেছে। হাজার হাজার নারী-শিশুর করুণ মৃত্যুর বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন গানে। ১৯৪২-৪৩ সালের দিকে রচিত আরেকটি গান বস্ত্র, চিনি ও কেরোসিনের অভাব নিয়ে রচিত–

'বঙ্গনারী হইল বিবসনা
(তারা) দিবসেতে ঘর হইতে,
বের হইতে আর পারে না।...
গ্রামের দুস্তর পুরুষ নারী
যারা ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি
ভিক্ষা ছাড়া যাদের দিন চলে না

Dhaka University Institutional Repository

তারা লোক সমাজে মুখ দেখাতে
লেংটা হইয়া আর পারে না ।...
লবন কেরোসিন চিনি
আধসের আর দেড় ছটাক কিনি
রেশন কার্ডে কাপড় পাওয়া যায় না...
এমনি করে আর বা কত
থাকবে দেশ বসন বিনা?

কবিয়ালের আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে লেখা গানেও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসের ছায়া পড়েছে । যেমন কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে জারি গানের আদলে রচিত 'কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে' গানটির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ধরা পড়ে । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেই যে এইসব সংকটকে আরো দুর্বিসহ করে তুলে, বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করে । সে বিষয়ে লিখেছেন–

'বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া ।
চৈতন্য হইলে শেষে সংকটে পড়িয়া ।
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে কত মা বোন শিশু হাজারে হাজারে॥...

তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিত করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরদের সামিলে রাখিয়া
ছালার মুখ বান্ধিয়া ঢালে উপুড় করিয়া
'দেড় ছটাক কন্ট্রোলের দোকান গরীব বাঁচিবার
সাহীদার হইল যতো প্রেসিডেন্ট মেম্বার রে॥

ও হায় রে–
মুখ চিনিয়া বিলি হইল কন্ট্রোলের কুইনাইন
টেক্স নাই যার কার্ড পাইবা না সাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার
কেউ পায় না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে॥'

এই গানে তৎকালীন সামাজিক অবস্থান থেকে সরকারি মহলের সাথে লুটেরা, দালাল, চোরদের সংঘবদ্ধতায় মানুষের জীবনের চরম বিপর্যয়ের ঘটনা উঠে এসেছে প্রত্যক্ষ ভাবে ।

ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পী হরিপদ কুশারী, তাঁর গানে মুনাফাখোর, ব্রিটিশ শাসক ও জাপানি বিমানের যে আগ্রাসনের বর্ণনা করেছেন, তাতে উঠে এসেছে এদেশের সকল সম্পদ লুট করে নেওয়ার পরও যেন তাদের ক্ষুধা মেটে নি । এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দা-কুমড়ো সম্পর্ক দেশ ভাগাভাগি নিয়ে । রুঢ় বাস্তবতা হলো কৃষকের ধান কাটার অধিকার, মাঝির দাঁড়ে টান দেয়ার অধিকার নেই । একই নদীর সহজাত জলপ্রবাহ, চিরকাল ধরে এই জলের উজান-ভাটির সাথে সম্পর্ক, কিন্তু মানুষের জন্য শুধু ব্যারিকেড । এ বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

'মরণ শিয়রে দলাদলি করে কেমনে বাঁচিবি বল
সোনার বাংলা হলো শশ্মান, একসাথে সব চল॥'

তৎকালীন কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক অনুষ্ঠানের উপরোক্ত গান সম্পর্কে স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ লুতফর রহমান বলেন–"যতোই শুনতে লাগলাম, ততোই মনে হ'তে লাগলো, এমন গানও হয়! আগে কখনো শুনিনি তো। আজ দেশের যে অবস্থা, চারদিকে তাকালে মনে হয় সেই অবস্থারই হুবহু ছবি আঁকা আছে গানটিতে। ...তবে গানটার যে দু'টো লাইন আমাকে বেশি আকর্ষণ করলো, সেটা ছিল এরকমের–"মরণ বাছে না হিন্দু মুসলমান, গ্রামগুলো সব হলো গোরস্থান।" সত্যিই তাই। শত শত মানুষ মরছে আর কোথাও গর্ত করে সেইসব মানুষের লাশ একসাথে পুঁতে ফেলা হচ্ছিলো। এপিডেমিকের ভয়ে। হিন্দু মুসলমান–নারী–পুরুষ–বৃদ্ধ–যুবা নির্বিশেষে।"[২৭]

শিল্পী অনল চট্টোপাধ্যায়ের কিছু গানে দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি ও বাস্তবতা গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে। যেমন–

'আজ বাংলার বুকে দারুন হাহাকার
চাষের জমি পড়ে আছে চাষীর ঘরে অনাহার
গ্রামের লোকে পায় না খেতে জমিদারের গোলায় ধান
গোপন পথে আঁধার রাতে শহর মুখে যায় চালান
শহরেতে চালের পাহাড় লুকিয়ে রাখে মজুতদার॥'

এই গানে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে অনল চট্টোপাধ্যায় মজুতদারদের কু-চক্রান্তমূলক ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলার মানুষকে বসে থাকলে চলবে না, প্রতিবাদ করতে হবে, তার জন্য আহবান জানিয়েছেন। আরেকটি গান–

'কোথায় সোনার ধান হায়রে
শূন্য খামার কাঁদে ভাইরে।'

গানটির মধ্যে আকাল প্রসঙ্গে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন–

'দারুন রোদের তাপে ভাইরে
ফাটা মাটি কাঁপে
গাছের ডাল ঝরে রে
নদী পুড়ে মরে ও... আ....
ঘরে ঘরে আসে বুঝি
আকালেরই বান॥'

এখানে অন্য কোনো অর্থ বিচার না করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই প্রধান করে দেখেছেন। গানগুলো ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের সাক্ষ্য বহন করে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জারির আদলে লেখা একটি গান, যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানবিক বিপর্যয় সহ অসহায়ত্বের নির্মম বর্ণনা তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি গভীর প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে উঠে এসেছে–

Dhaka University Institutional Repository

'ও হারে কৃষক মরিলায়
ডুবিল ডুবিল তরী অকূল দরিয়ায়...
পিতা ছাড়ে পুত্র আর পতি ছাড়ে সতী
মা বেচে দেয় কোলের ছেলে হায়রে কি দুর্গতি
মানুষ যত পশুর মত পথে ঘাটে মরে
দিন দুপুরে টেনে নেয় শিয়াল ও কুকুরে
হায় কৃষক মরিলায় ।'

শিল্পী বিনয় রায় মন্বন্তরের উপর একটি মর্মস্পর্শী গান লিখেছিলেন । তিনি শহরবাসীর উদ্দেশ্য করে বলেছেন ক্ষুধিতের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে উঠতে । গানটি হলো–

'শোন ওরে ও শহরবাসী, শোন ক্ষুধিতের হাহাকার
দেশবাসী না এগিয়ে এলে দেশ বাঁচানো বিষমভার ।
ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে, মা বেচে দেয় ছেলে মেয়ে
শেষ সম্বল ইজ্জত বেচেও জোটে না ক্ষুধার আহার ।
হাজার হাজার লক্ষ-কোটী, মরণ পথে চলছে ছুটি
ভেদাভেদ আজ দূর করে নাও, দেশ বাঁচানোর সকল ভার ।
অন্ন বস্ত্র, আর্থ দাও ক্ষুধিতের সেবার ভার নাও
জনরক্ষা, আত্মরক্ষা, সাহায্য চায় সবাকার ।'

এই সকল গানে একধরনের উদ্দীপনা দেখানো হয়েছে । কিন্তু কাদের জন্য বলা হয়েছে যারা এই অভাবেও অভাব বোধ করে নি । ক্ষুধিতের নিকট এই গান উপস্থাপনের তেমন প্রয়োজন নেই । নির্মম বাস্তবতার মধ্যে গান শুনে বা গেয়ে তো আর বুভুক্ষুদের পেটও ভরবে না । বিশেষ করে রিলিফ তোলার সময় বা সেইসব শোষকদের কানে পৌঁছে দেয়ার জন্যই হয়তো এই গানগুলো বিবেককে তীব্র করেছিল । রিলিফ তোলার সময় যেভাবে গণসংগীত শিল্পীরা কাজ করেছে সে সম্পর্কে কলিম শরাফীর বক্তব্য হলো–

"১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে দল বেঁধে আমরা গেয়েছিলাম নবজীবনের গান , 'ফ্যান দাও, মা ফ্যান দাও, দু'টি ভাত দাও' বা 'সোনার বাংলা হলো শশ্মান, এক সাথে সব চলো ।' গানগুলোই এমন যে এর সুরে সুরেই উঠে এলো এর শ্লোগান । অথবা শ্লোগান এসে মিশেছিলো গানের সুরে ।"[২৮]

ত্রাণ তোলা এবং তা বিতরণের কাজ গণনাট্য সংঘ যেভাবে করেছিল, এমন সক্রিয় ভাবে আর কোনো সংস্থাকে মাঠে ময়দানে দেখা যায় নি । ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ত্রাণ তোলার জন্য হিন্দি গানও তৈরি করা হয়েছিল, যা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দল পরিচালনা করা হয়েছিল । বিনয় রায়ের তেমনি একটি গান–

'সুনো হিন্দ্‌কে রহনে বালোঁ সুনো সুনো–
তুম হিন্দ্ হো য়া মুসলিম হো
অওরত মরদ আমীর ফকির সভী তুম্ সুনো সুনো ।
আজাদীকা ঝণ্ডা জিস্‌নে উঁচা রখা হায়

Dhaka University Institutional Repository

দুষমন কে মুকাবিল জিস্‌নে ময়দান লিয়া হ্যায়,
বো হিন্দুস্থান কী পূরব দুয়ারী বংলাকে ইনসান
ভূখসে লড়কর কর রহে জিন্দগী কুরবান সুনো সুনো ।'[২৯]

দুর্ভিক্ষের গানে শোষকের ভূমিকায় সাধারণত জমিদার, মজুতদার ও সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধেই বলা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ব্রিটিশদের কৃত্রিম সৃষ্ট একটি কৌশল, যার টোপ ফেলেছিল অনেক আগেই সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে । তুলসী লাহিড়ীর একটি গানে তাই অন্যদের থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করা যায়–

'ভুলো না রেখো মনে বাঁচবে যত কাল
সোনার দেশে ক্যান এলো পঞ্চাশের আকাল ।...
তকমাধারী ন্যায়ের মালিক যারা
মুখোশ খুলে খোস মেজাজে লুটে বেড়ায় তারা
(আবার) পচায় গলায় ছালায় ছালায়
চিনি আটা ময়দা চাল
এলো পঞ্চাশের (বাংলা সন ১৩৫০) আকাল॥'

চোরেরা রক্ষকের বেশে, লুটেরা অভিভাবকের আসনে, তকমাধারী মালিকের মুখোশ চিহ্নিত করেছেন । শেষে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য উদ্দীপ্ত করেছেন । এই আকালের ভিতর কী ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল তার সুচারু দৃষ্টিভঙ্গি সর্বহারা মার্কসবাদীদের মধ্যে কীভাবে কাজ করেছে তা নিয়ে অনেকের মতবিরোধ আছে। ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে গিয়ে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক চাতুর্যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয় । তখন মজুতদার ও মুনাফালোভীরা খাদ্যশস্যকে পুঞ্জিভূত করতো, ফলে গণ-আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের প্রসঙ্গ আসাটা ছিল অনেক জরুরি । শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উপলব্ধি–

"আমার-আমাদের সবারই এই সময়কার রচনায় এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে । দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গানে কবিতায় কেবল মজুতদারের কথা, কেবল উৎপাদন বাড়ানোর কথা, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ-দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করলো, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও নেই । সুকান্তর বিখ্যাত 'শোনরে মালিক শোন রে মজুতদার' কবিতার মধ্যে কি কোথাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য আছে? বিষোদগার কেবল মজুতদারের বিরুদ্ধে । এইসবই পার্টিলাইনের প্রতিফলন ।"[৩০]

পার্টি লাইনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মনোভাব যে ছিল না এটা অনুধাবন করা যায়, কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ যে মুহূর্তেই পাল্টে যাচ্ছিল, ফলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি । দূরদর্শিতার সাথে প্রতিরোধ করার মতো সফল পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যেই কিছু কিছু অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়েছে ।

এ তো গেল কমুনিস্টদের চেতনার প্রকাশ । তখন প্রধান রাজনৈতিক সরকারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভার পতনের পর নাজিমুদ্দিন সরকারের ক্ষমতা দখল, তারপরই আকালের শুরু, সেই সময়ের তথ্যচিত্র দিতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

"বিশ্ব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা হৃদয়-বিদারী এই দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ও অপরাধ বর্তে গিয়া নাযিম মন্ত্রীসভার ঘাড়ে। পড়িবেই ত। তাঁদের আমলেই ত এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।"[৩১] তিনি পরে নিজস্ব মতামত প্রদান করতে গিয়ে অন্য এক রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন–"প্রকৃতপক্ষে ঐ আকালের জন্য এককভাবে দুই মন্ত্রীসভার কেউই দায়ী ছিলেন না। উভয় মন্ত্রীসভাই অংশতঃ দায়ী ছিলেন। আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিলেন ভারত-সরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অন্যতম পন্থা হিসাবে তাঁরা বাংলার চাউল যতটা পারিলেন 'সংগ্রহ' করিয়া বাংলার বাইরে সুদূর জব্বলপুরে গুদাম-জাত করিলেন। জাপানীদের হাত হইতে দেশী যানবাহন সরাইবার মতলবে 'ডিনায়েল পলিসি' হিসাবে নদী-মাতৃক পূর্ব-বাংলার সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দিলেন। চরম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা-হইতে-নেওয়া চাউলগুলিও ফেরত দিলেন না। বাংলা সরকার (নাযিম-মন্ত্রীসভা) যখন বিহার হইতে উদ্বৃত্ত চাউল খরিদ করিতে চাইলেন, তখন বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-নেতারা সরবহাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ কেউ স্পষ্টই বলিলেন, খাদ্য-ঘাটতির বাংলাদেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে।"[৩২] সাম্প্রদায়িকতার কালোবিষ প্রাসঙ্গিক তথ্যে উদঘাটিত হয়েছে, যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসকেরাই ছুঁড়ে দিয়েছিল।

'৪৩-এর পরেও কয়েকবার দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে হয়েছে এদেশবাসীকে, তবে কিছু চারণকবি ছাড়া ঠিক সেভাবে নতুন গণসংগীত পাওয়া যায় নি। রচনার চেয়ে পূর্বোক্ত গানগুলোই বেশির ভাগ সময়ে গাওয়া হতো। এসময়ের বিশিষ্ট লোককবি শাহ আবদুল করিমের দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা কিছুগান পাওয়া যায়। তাঁর দুস্প্রাপ্য রচিত 'গণসঙ্গীত' গ্রন্থের প্রথম গানটিতে দেখা যায়–

'এবারের দুর্দশার কথা
কইতে মনে লাগে ব্যথা
খোরাক বিনে যথা তথা– মানুষ মারা যায়॥

কেউ মরেছে অর্দ্ধ মরা
একেবারে বুদ্ধি হারা
হইয়া পাগলের ধারা ঘুরিয়া বেড়ায়।
হায়রে হায় খোরাক বিনে
শুকায় অঙ্গ দিনে দিনে
মায়ের বুকে সন্তান দুগ্ধ নাহি পায়॥'

আরো বেশ কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায় যা দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা। অত্র গ্রন্থের অধিকাংশই মন্বন্তর বিষয়ক। দুর্ভিক্ষ কালে কালে মানুষই সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক নিয়মে হয়তো মানুষের অধিক চাহিদার তুলনায় কখনো কখনো বৈরিতা দেখা দেয়। কিন্তু তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হ'তে পারে না। সংকট প্রকৃতির হলেও সংকটের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহতা সুবিধাবাদী মানুষের। সুবিধার নানা কৌশল জিইয়ে রাখে তারা। এইসব কৌশলকে যতদিন সমাজ থেকে বিচ্যুত না করা যাবে, ততদিনই বিপর্যয়ের আশংকা থেকে যাবে। সুবিধাভোগী সংখ্যা ও মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান

ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চর্চার ইতিহাস তিন হাজার বছরের। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যবাদীর শ্রেণীবিভক্তি সমাজের ধর্মীয় বর্ণবাদিতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ভারতের নিজস্ব ধর্ম বা মতবাদ 'বৌদ্ধবাদ'-এর প্রসার লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরবর্তীতে পৃথিবীতে ভারতের থেকে ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব-এশিয়াসহ সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। খ্রিস্টিয় ৪র্থ শতকে দেখা যায় সর্বকালের বিষাদময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা। তখন ছিল গুপ্তযুগ। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনামল। হিন্দু মৌলবাদিরা তাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধমতাদর্শীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি–সমূলে বিতাড়িত করেছে ভারত থেকে। ফলে তাঁদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ান্তর ছিলো না।

"বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাত করে সনাতন (হিন্দু) ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষকে হত্যা করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা সিংহল এবং বাঙলায় পালিয়ে যান। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ তাদের বৌদ্ধ পরিচয় লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে ইউরোপের ক্রুসেড নয়, ইতিহাসের ভয়ংকরতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ভারতে গুপ্ত আমলে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে। আর এজন্য ভারতীয় ধর্মমত হয়েও গুপ্ত আমলে ভারতে বৌদ্ধদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।"[৩৩] ভারতীয় উপমহাদেশ নানাসময়ে নানাজাতি দ্বারা শাসিত হয়েছে। এর পিছনে অন্যতম কারণ ধর্মীয় অজ্ঞতা ও সাম্প্রদায়িকতা। যা বিদেশীরা সুকৌশলে লালন করার জন্য প্রভাবিত করে জাতিবোধের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এতে তারা সফলও হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনকাল ও তার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাতিগত সুসম্পর্ক ছিল না বলেই তারা এই সুযোগে দুইশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন করে যেতে পেরেছে। নিজস্ব অধিকার, ভাষা-সংস্কৃতির অধিকার, সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকারের থেকেও যেন বড় হয়ে উঠেছিল ধর্মীয় একপেশে মনোভাব। উন্মুক্ত শান্তির দুয়ার বার বার বন্ধ হয়ে গেছে প্রতিনিয়ত–ঘৃণ্য হত্যা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে। ফলশ্রুতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে যত মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে–তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল নৈতিকতা ও মানবিকতা। উপনিষদ, পুরাণ, চার্বাক দর্শন, জৈন-বৌদ্ধমত, তান্ত্রিক মতবাদ, শৈব-শাক্ত মতবাদ, বৌদ্ধতন্ত্র, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, নাথবাদ, বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল মতবাদ প্রভৃতির যে উৎপত্তি, সবকিছুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে মানবতার জয়গান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুর।

দেখা যায় এই মতবাদ সমূহ কিছু কিছু গোষ্ঠী তাদের মত প্রচারের পথ হিসেবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনাকেই বেছে নিয়েছে। সহজিয়া-সুফি বাউলতো বটেই; বাউলমতের মধ্যে অন্যতম যেখানে বিভিন্ন মতবাদ এসে সমন্বয় ঘটেছে। তাই পরমত সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা তাদের মধ্যে সদা বিদ্যমান–বিভিন্ন গানের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেখানে জীবন ও মানবতার উদার দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়। ফলে তাদের কাছে মুসলমানের জন্য হিন্দু-গুরু আর হিন্দুর কাছে মুসলমান-গুরুর আশ্রয় কোনো সমস্যা তৈরি করে না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের আদর্শে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি প্রধান লক্ষ্য থাকলেও বলা যায় চর্যাগীতি থেকেই এর উপর রচিত হয়ে এসেছে অসংখ্য গান। এতে বোঝা যায় এদেশ কখনোই সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল না। বাউল কবি পাঞ্জুসাঁই এর একটি গানে দেখা যায়–

'জাতির বড়াই কি ইহকাল জাতি করে কি
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দিই হাতের মুখি।'

বাউল সম্রাট লালন সাঁইয়ের গানে আছে–

'কেউ মালা কেউ তছবি গলে
তাই তে কি জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কার রে॥

যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ
বামনি চিনি কিসেরে॥'

যদিও ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গণসংগীত রচিত হয়েছে। এ বিষয়ের উপর পঞ্চগীতি-কবিরও অনেক গান পাওয়া যায়। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ এর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে কোনো না কোনো স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। যেমন– "১৯২৩ সালে অমৃতসরে, ১৯২৪ সালে দিল্লীতে ও কলকাতায়, ১৯২৫-এ কলকাতা-দিল্লী-ফতেপুরে, ১৯২৬ সালে তিন দফায় কলকাতায়, ১৯২৭ সালে পটুয়াখালী-লারকানা-নদীয়া-মুলতানে, ১৯২৮-এ ব্যাঙ্গালোর ম্যূরতে, তামিলনাড়ুর তিরুপুরে, ১৯২৯ সালে বোম্বাইয়ে, ১৯৩০ সালে ঢাকায়, ১৯৩১-এ কানপুরে, ১৯৩২ সালে আবার বোম্বাইতে, ১৯৩৩ সালে আলোয়ারে, ১৯৩৪ সালে কাশ্মিরের শ্রীনগরে, ১৯৩৫-এ হাজারীবাগ-রাজশাহী-হায়দ্রাবাদ-লাহোরে, ১৯৩৬ সালে পুনায়, ১৯৩৭ সালে হরিয়ানা-কানপুর-বারাণসী ও কলকাতার কাশিপুরে, ১৯৪০ সালে সিন্ধুর শুক্কুরে এবং ১৯৪১ সালে ফের ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে।"[৩৪]

ফলে স্বদেশী আন্দোলনের কালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অনেক গণমুখী গানই গাওয়া হতো, যার আবেদন এখনো সমান ভাবে বিদ্যমান। যেমন কাজী নজরুল ইসলামের গানে জাত বিচার নিয়ে বলা হয়েছে–

'জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত-জ্বালিয়া খেলছে জুয়া,
ছুলে পরেই জাত যাবে
জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।'

অথবা– 'মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।'

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪১ সালে হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় ঢাকায়। যার প্রভাব নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়কালে প্রখ্যাত কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত রচনা করেন–

'হরি তোমার অপার লীলা বোঝা হল ভার
শুনতে পাই ঢাকা শ'রে, মানুষে মানুষ মারে
ঘর পোড়ায় দিন দুপুরে, করে নানা অত্যাচার
যে যাহারে পোড়ায় যেথায় পায়, ছুরিকাঘাত করে গায়
পিছন থেকে মারে মাথায়, নাই তার কোনো প্রতিকার।'[৩৫]

কবির এইগানে যে ছুরিকাঘাত ও পোড়ানোর কথা উল্লেখ আছে, তার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়ের কাছে। "১৯৪১ সালে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। দাঙ্গার সূত্রপাত, প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের বিধান সভার এক বিবৃতি অনুযায়ী, কয়েকজন বালকের ১৪ই মার্চ হোলির দিন কিছু সংখ্যক মুসলমানের গায়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রঙ্গিন জল দেওয়াকে উপলক্ষ করে। বড়দের হস্তক্ষেপে যে শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারতো, তদানিন্তন অত্যন্ত উত্তেজনাকর মানসিকতার জন্য তার বদলে দাঙ্গা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং গ্রামাঞ্চলকে ক্রমশ দাবানলের মতো গ্রাস করলো। পরবর্তী প্রায় ছয়মাস ঢাকায় দফায় দফায় দাঙ্গার অগ্ন্যুৎপাত ছাড়াও বিচ্ছিন্ন ছুরিকাঘাত ও প্রহৃত হবার ঘটনার পৌনঃপূনিক অনুষ্ঠান ঘটতে থাকে।"[৩৬] তথ্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সাম্প্রদায়িকতার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবেই সবসময় কাজ করেছে রাজনৈতিক প্রভাব। ফলে এই গানটি যে ১৯৪১ সালের দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখা এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না।

১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতায় শুরু হয় আরেক চরম ও ভয়াবহ দাঙ্গা। এই ঘটনায় কমপক্ষে চার হাজার লোকের মৃত্যু এবং চল্লিশ হাজারেরও বেশি লোক আহত হয়। নাশকতামূলক ভাতৃঘাতী দাঙ্গা ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন মিলনের গান লিখলেন সলিল চৌধুরী। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ লালিত গান দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয় ও গীত হয়েছিল। গানটি–

'ও মোদের দেশবাসী রে
আয়রে পরাণ ভাই, আয়রে রহিম ভাই
কালো নদী কে হবি পার
এই দেশের মাঝেরে পিশাচ আনে রে
কালো বিভেদের বান
সেই বানে ভাসেরে মোদের দেশের মান।'

গানটি রচিত হয় ১৯৪৯ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মিলনের সেতুবন্ধনের আহবান নিয়ে। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের বিরুদ্ধে শোষক-শাসকদের চিরন্তন হাতিয়ার হলো সাম্প্রদায়িকতা। শোষিত মানুষকে আরো বঞ্চিত করার মানসে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি এবং লুটের ষড়যন্ত্র করার সহজ পদ্ধতি। সলিল চৌধুরীর গান বাংলাদেশের গণআন্দোলনে বহুলগীত। পরেশ ধরের লেখা পঞ্চাশ দশকের আরেকটি বিখ্যাত গান–

'ও ভাইরে বন্ধু, বলতে কি পারো
আমার বুকের খুনে কেন হাত রাঙালে
বল কোন অপরাধে কার লাভের আশে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশীর চির চেনা ঘর জ্বালালে ।

তোমায় আমায় চেনে দেশের প্রতি ধূলিকণা
যুগে যুগে পাশাপাশি রয়েছি দু'জনা
সকাল সাঁঝে সবুজ মাঠে খেলেছি একসাথে
একযোগে বাঁধা ছিলাম কলে কারখানাতে
একি ছিল রে কপালে!

পূজা পার্বণ মহরম আর ঈদেরও উৎসবে
মেতেছি দু'জনে মোরা প্রীতির কলরবে
কৃষ্ণলীলা গাজির গানে কণ্ঠ মিলায়েছি
পীর পুরোহিতের কাছে বিপদে গিয়েছি
আজি কলংক মাখালে ।'

কলকাতার দাঙ্গায় যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ ঘটে, সেখানে চির-পরিচিত প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব হিন্দু-মুসলিম পরিবারের চলাফেরা ছিল । হঠাৎ তারা সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে । সেই দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায় ।

কবিয়াল রমেশ শীলের বেশকিছু সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান বিভিন্ন সময়কালে বেশ জনপ্রিয়তা পায় । তন্মধ্যে পুথির আঙ্গিকে লেখা একটি গান হলো–

'হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ
বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন ...
রাষ্ট্র সংঘের রায় মতে বিচারেতে হয়ে যাবে ধার্য
ভাইয়ের ঘরে ভাই সংহারে কি জঘন্য কার্য
স্বাধীন হলাম ষোলো বছর তার খবর জানি বন্ধুগণ
তবু কি না নিরীহের উপর এত নির্যাতন ।'

অথবা– 'ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কয়দিন চলিবে বল
সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁদে পা দিয়ে সর্বনাশ হল
আর কয়দিন চলিবে বল॥

ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্যসেন, টেগরা বল
দুই ভাইয়ে আন্দোলন করে, ব্রিটিশকে খেদালো জোরে
স্বাধীনতা কাহার তরে, মানুষ যদি না রহিল
বার বার দাঙ্গা দাপটে, গরীব মরে হাটে মাঠে
যার বুদ্ধিতে দাংগা ঘটে তার গায়ে কি আঁচড় পেল ।'

অথবা– 'তোমরা শুনছনি খবর
গুলি করে মানুষ মারে কলিকাতা শহর ।'

Dhaka University Institutional Repository

দাঙ্গার পিছনে যে বিশেষ সুবিধাবাদী চক্রই বারবার ইন্ধন যুগিয়েছে, কবিয়ালদের গানে তার বর্ণনা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ১৯৬৭ সালে গুরুদাস পালের রচিত একটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গানটি মূলত পাঞ্জাবী-অপাঞ্জাবীদের মধ্যকার ভীষণ দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। শ্লেষ, বাস্তবতা, কাব্যধর্মী নান্দনিকতা, প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ করা যায়। গানটি হলো–

'স্বভাব তো কখনো যাবে না, ও হো মরি
থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরিপানা
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে না॥ ...

জমিদারের স্বভাব করে চাষীর সর্বনাশ
খাতা ব্যাবসায়ীদের স্বভাব খোঁজে চৈত্রমাস
ধনীর স্বভাব গরীব মারার কলকাঠি বানায়
বিভেদ বিষের আগুন নিয়ে খেলছে এ বাংলায়
হিন্দু আর পাঞ্জাবী এই সেদিন বাগমারীতে
ছিল লাগ লাগিয়ে দিতে চিত্তেতে বাসনা।

গ্রাম-বাংলার মানুষের চেতনা জাগ্রত করার জন্য যে গান রচিত হয় শহুরে শিক্ষিত লেখক-শিল্পীদের প্রচেষ্টায়। গ্রামবাংলার মানুষ হয়তো সহজে আপন করে নিতে পারে নি। কিন্তু সময়ের হাওয়া তারা সবসময়েই টের পেয়েছে। তাদের যে বিপ্লব হয়েছে, তা আবার অনেক শিক্ষিতজনের চোখেই পড়ে নি। তারা জানেনও না এই ভাণ্ডার যে ধনাঢ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সারাবিশ্ব যে যুদ্ধের ক্রোধানলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তার পিছনেও মূলত সাম্প্রদায়িকতা দায়ী। ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম হত্য যজ্ঞ বলে স্বীকৃত নাৎসী বাহিনীর নারকীয়, নির্মম ইহুদী নিধনের চিত্র দেখেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িকতা বিশ্বের মানবতাকে বারবার কিভাবে কতো ভাবে পিছনে টেনে নিয়ে গেছে। সংখ্যা লঘু সর্বদাই শোষিত দলে এমন অলিখিত নীতি সবদেশেরই অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ধারার গানে যে বিভিন্ন আঙ্গিক এসেছে জ্যাজ, পপ, রক, ব্লুইজ এরমতো ধারা কোনো না কোনোভাবে বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাংগীতিক প্রতিবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা-আন্দোলনের গান

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনাই মূলসুর ছিল। ভাষা ও জাতিগত দিককে পঙ্গু করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য বিস্তারের গভীর ষড়যন্ত্র যে অনেক আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল– তা স্বাধীনতা লাভের বছর খানেকের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা ও জাতি বিভক্তির ফলে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেল ভিন্নরাষ্ট্র ও আদর্শের অঞ্চল অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তানকে একটি খণ্ডিত দুর্বল জাতি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান সুবিধা লাভের সহজ উপায় খুঁজতে শুরু করলো। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে প্রগতিশীল চিন্তার ধারাবাহিক চর্চাকে স্তব্ধ করে দিয়ে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার বাসনা কাজ করতে শুরু করে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ও সর্বহারাদের গণচেতনা অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায় এবং মুক্তচেতনার অপেক্ষা ইসলামী রাষ্ট্রের দোহাই তুলে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা দেখে বোঝা গিয়েছিলো–এই দুরভিসন্ধি ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মতোই নব্য-ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা। কিন্তু তা সফল হয় নি। পূর্ব-বাংলার ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের যে ধারালো ঐতিহ্য–তাকে দমন করতে গিয়ে বরং বারবার প্রতিঘাতের কাছে খান-পাঠানদের নতিস্বীকার করতে হয়েছে। তারা প্রথম থেকে সরকারি অফিস আদালতের কাগজ-পত্রে, স্ট্যাম্প, সীলমোহর, মুদ্রায়-মানচিত্রে উর্দু ও ইংরেজি ব্যবহার করে বাঙালিদের অস্তিত্বের উপর হুমকি স্বরূপ হয়ে ওঠে। পূর্ব-বাংলার বেশকিছু পাকিস্তানবাদী ও উর্দু দালাল-চক্র ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সদস্যরা পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তে মুসলিম সাহিত্য, বাংলাগানের পরিবর্তে ইসলামী গান, বাংলা সংস্কৃতির পরিবর্তে ইসলামী সংস্কৃতি ইত্যাদি বলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে মুগ্ধতা ও রাজনৈতিক আধিপত্য গ্রহণের চেষ্টা করে। তারা রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম কিংবা মধুসুদনকে অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে মুসলিম জীবনের আদর্শ প্রভাবিত উপন্যাস-কবিতা-গান নাটক রচনার প্রচেষ্টা চালায়। সবচেয়ে গুরুতর ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয় একটি মাতৃভাষাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। সুপ্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণাঙ্গ একটি ভাষা বাংলার পূর্ণ বর্ণমালা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও তা ভিন্ন বর্ণমালায় লেখা, আরবি-উর্দু-হিন্দিতে বাংলা ভাষা চর্চা, বাংলা শব্দার্থের পরিবর্তে সুযোগ পেলেই আরবি-উর্দু-ফারসি ভাষার শব্দ জুড়ে দিয়ে কিম্ভুত ভাষাবৈশিষ্ট্য তৈরির প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

বাংলা ভাষায় উর্দু আরবি ফার্সি ইংরেজি পর্তুগিজ ফরাসি সংস্কৃত হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থেকে অনেক শব্দই এসে সমৃদ্ধ করেছে একথা ঠিক। সহস্র বছর ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে বাংলার নিজস্ব ভাণ্ডারের অসংখ্য শব্দ ও পরিভাষা অন্তর্গত হয়েছে। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর দেখা যায় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা হেতু বেপরোয়া পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভারতের বাংলাভাষী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ায় হিন্দি ভাষার আধিপত্য বিস্তার করে আর পূর্ববাংলার ভাষায় আবেগের বশবর্তী হয়ে উর্দুর প্রভাব বিস্তার করে পাকিস্তানবাদী হয়ে ওঠার চেষ্টা চলতে থাকে। উর্দুপন্থী শাসকেরা অতিদ্রুত পদক্ষেপে ও সুকৌশলে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে উর্দুকে বাংলার গহীনে সংমিশ্রণের ধারাবাহিকতা রুপ্ত করে তোলে। বাঙালি জাতি যেন সাচ্চা (খাঁটি) মুসলমান হ'তে পারে তার জন্য ভাষার মধ্যে আরবিয়ানা রূপান্তর এমনকি উচ্চারণের মধ্যেও উর্দু-আরবির 'মাখরাজ' আরোপের মহড়া চলতে থাকে। প্রভাব যে প্রথমদিকে এদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যেও অবচেতনে

Dhaka University Institutional Repository

কম-বেশি পড়ে নি তা নয়। দেশভাগের আগে এদেশের সাংস্কৃতিক আবহ যেখানে মুক্তচিন্তা, ব্রিটিশ বিদ্রোহ, সমাজতান্ত্রিক চেতনা, ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার প্রবল আন্দোলনের প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল গণসংগীতের প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্র; গণসংস্কৃতির ধারণাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার পরেই যেন সব আদর্শ নড়বড়ে হয়ে একধরনের মেকি সংস্কৃতির দিকে যাত্রা শুরু করে। তার কিছু উদাহরণ দেয়াটা এখানে অবান্তর হবে না মনে করি। পাকিস্তান স্বাধীনতার পর মুক্ত পাকিস্তান নিয়ে যে সব গান রচিত হয়–তন্মধ্যে বিশিষ্ট গণসংগীত রচয়িতা ও শিল্পী আবদুল লতিফের তৎকালে গাওয়া গান যেমন–

'ভাঙিল জিন্দান টুটিল জিঞ্জীর
আগে চল্ আগে চল্ আজাদ রাহাগীর॥
জিন্দা গাজী ওরে ভুলিয়া ভয় ডর
ঝাণ্ডা হেলালী দুহাতে তুলে ধর
আজাদী অভিযানে কওমী জয়গানে
আসুক সাহারায় প্লাবন বারিধির–'[৩৭]

তিনি মুকুল ফৌজের আসরে যে গান শেখাতেন তার একটি উদাহরণ–

'কলিজার খুনে ওয়াতানের ধূলি করিয়া লাল
আজাদীর তরে শহীদ হলে যে বীর দুলাল
তাহারা মোদের সালাম নাও
তাহারা মোদের আশিস দাও
ভাঙা কেল্লার উর্ধ্বে যাহারা
উড়ালে নিশান আল্ হেলাল।'[৩৮]

"তখন স্বাধীন পাকিস্তানের জোশ চলছে। গানের কথাতে আরবি-ফারসির মিশাল তাই। আবার উচ্চারণ নিয়েও গবেষণা চালানো হয়, বাঙালের মুখে আরবি-ফারসি তো! 'আjাদ' না 'আzাদ', 'কলিjা' না 'কলিzা'–এইসব তর্ক চলছে। ...তখনকার গানে কলিজা আজাদী ওয়াতান শহীদ জিন্দান রাহাগীর জিন্দা গাজী হেলালী ঝাণ্ডা কওম সাহারা ধুমসে চলছে।"[৩৯] এই যে উর্দু মার্কা বাংলা ভাষায় গান-কবিতা সাহিত্য রচিত হচ্ছিল–যেখানে বাঙালি মুসলমান পরিচয়ধারীদের কাছে 'বাংলা' শব্দটাও উঠিয়ে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল। অথচ অনেক সাহিত্যিকদের মধ্যেই এ ব্যাপারে আত্মসচেতনতা লক্ষ করা যায় নি। তৎকালীন কিছু কবিতার উদ্ধৃতি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে–

'উড়াও উড়াও উড়াও মোদের কওমী নিশান
চাঁদ তারা সাদা আর সবুজ মিশান্
আমাদের কওমী নিশান কওমী নিশান কওমী নিশান
দ্বিতীয়ার চাঁদ এই নিশান মোদের
আরব আজম সাথে যোগ আছে এর...'[৪০]

প্রাজ্ঞ শিল্পদ্রষ্টা সৈয়দ আলী আহসান সারা জীবন অমিশ্র বাংলা ভাষায় কবিতা লিখেছেন, অথচ একসময় তিনি 'বোগদাদী ভাষা' না এড়াতে পেরে লিখেছিলেন–

'জরির জোব্বা, শেরোয়ানী আর আমার সজ্জায়

Dhaka University Institutional Repository

আতরের পানি, মেশকের রেণু খোশবু বিলায়ে যায়...
নেকাব খুলেছে নতুন কুমার–রাত্রি হয়েছে ভোর...
ইয়াকুতি আর জুমরাতের লেবাস পরিয়া সুলতানা আছে
তখতের 'পরে বসি'–
জোহরা সেতারা নেমেছে মাটিতে আসমান হ'তে খসি।'

তালীম হোসেনের কবিতায় দেখা যায়–

'মোবারক হো জিন্দেগী!
চল্ সিপাহী জিন্দাদিল,
কর আজাদ পাকিস্তান,
কোরআনের কর আবাদ-
মোবারক হো জিন্দেগী!
কর আজাদ জিন্দেগী!!
ইসলামের পাক ওয়াতান
পূণ্য রাহে আন জাহান!'

দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর হঠাৎ স্বাধীনতার মধ্যে যে আনন্দ–তার প্রবাহ হিন্দুয়ানী দাঙ্গা-যুদ্ধতিক্ত মুসলমান প্রত্যেকেই পরম আনন্দে ইসলাম চর্চার ব্যাপক ফুসরৎ পেয়ে যায়। "পাকিস্তান প্রস্তাবের অব্যবহিত পর থেকেই তাঁরা কবিতায় আরবি ফারসি শব্দ ও মধ্যপ্রাচ্যীয় উপাদান জড়ো করতে শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ-প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁদের আরবি ফার্সি-আকীর্ণ মিশ্রভাষাকে ব্যঙ্গ করে কবি আজহারুল ইসলাম 'কৈফিয়ত' *(মাহে-নও, ১৩৫৭, ২:৫)* নামক কবিতায় লিখেছিলেন–

'মরুর দেশের ঢঙ্গে শুরু করে কেহ বা বাঙলা লিখা
মওকা বুঝিয়া কেহ কেহ করে উর্দুরে আজি নিকা..
অর্থচিন্তা সবারি মাঝে খেলিতেছে মাস মাস
সাধে কি সকল লেখক করিছে বোগদাদী ভাষা চাষ।'[৪১]

এভাবে বাংলার সবুজ মনোরম সুজলা-সুফলা দোয়েল-কোয়েলের মায়া ছেড়ে আরবের বালুকা রাশি, বেদুঈন, উটের উপমা এসেছিল, শাড়ি-লুঙ্গি ছেড়ে জোব্বা শেরোয়ানি, ওড়না, মেশকের খশবু স্থান পেয়েছিল। তবে একথা ঠিক বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সাহিত্যে বিদেশী ভাষা ব্যবহারের উদারতা অনেক আগে থেকেই ছিল। কখনো তা ভাষামূল্য আবার কখনো ধর্মমূল্য থেকে। ভাষার ঔদার্য নিয়ে হিন্দু-সাহিত্যিকদের মধ্যে ঘোরতর দ্বিধা উভয়ই বিরাজ করতো। আসলে বাঙালি মুসলমানদের বাংলার স্বাতন্ত্র্য বা মুসলমানি বাংলা করার কোনো প্রবণতা ছিল না–কতিপয় দালাল প্রকৃতির পাকিস্তানপন্থী ছাড়া। কিন্তু কিছু শব্দ বা ভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সাংস্কৃতিক ঔদার্যময় পরিবেশের মধ্যদিয়েই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাঙালিরা তখন থেকে সোচ্চার হয়ে ওঠে–ভাষাকে ঘিরে বাঙালি মুসলমানরা প্রকৃত চেতনার পরিচয় দেয়। চেতনার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকেই। এ ব্যাপারে নজরুলের কবিতায় বিদেশী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি প্রশ্নও তুলেছিলেন, কিন্তু নজরুলের সাম্যবাদী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে তা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মানসিকতাই ব্যক্ত করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জাতি-বিভক্তির সংকটকাল সামনে এলে তখন থেকেই অর্থাৎ বিশ শতকের শুরু থেকেই অনেক বাঙালিকে সোচ্চার কথা বলতে শোনা গেছে। যেমন ১৯১১ সনে রংপুর মুসলিম প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন–"বাঙলা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা, এভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা"[৪২] তিনি পারসি ও উর্দু ভাষা সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

বলেন–"বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে এই দুইটি ভাষার কোনো আবশ্যকতা নাই।...যে মুসলমান উর্দু বলিতে পারিবেন না তিনি শরীফ হইতে পারিবেন না এইরূপ ধারণা আমি ঘৃণাপূর্বক উপেক্ষা করিতে চাই।"[৪৩] ১৯২১ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে একটি লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন যে–"ভারতের রাষ্ট্রভাষা যাই হোক, বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলা ভাষাকে।"[৪৪]

এ থেকেই বোঝা যায় ভাষার রক্ষা এবং অপশক্তির প্রভাব থেকে বাংলাকে মুক্ত রাখার চেতনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। একশ্রেণীর ক্ষমতাবান মানুষেরা ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় তখন থেকেই যে ব্যস্ত ছিল একথারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশ বিভাগের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা দেন হায়দরাবাদে। ৫ই ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার আবরণে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন প্রতিবাদ স্বরূপ প্রস্তাবনা রাখে– বাংলাকে পাকিস্তান ডমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক; রাষ্ট্রভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।[৪৫]

১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন–"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি, এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজে হাতে আমাদের চেহারায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা–তীলক–টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"[৪৬]

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে অনুমোদনের সুপারিশ করলে মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতা ও কটাক্ষের কারণে বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) ঢাকা এলেন। ঘোষণা দিলেন যে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', এবং ভাষা-আন্দোলনকারীদেরকে ভারতের চর, কম্যুনিস্ট ও রাষ্ট্রবিরোধী বলে অভিহিত করেন। জিন্নাহ সাহেবের আগমণের সংবাদে সারা দেশের মানুষ তার মুখের কথা শোনার জন্য ছিল উদগ্রীব। কিন্তু তিনি ঢাকা আসার আগে যেসব ঘনিষ্ট রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের সাথে আলোচনা করেন– তারা ছিল বাঙালি জাতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে দাবিয়ে রাখার পাঁয়তারায় লিপ্ত। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিনসহ অনেকেই পরামর্শ দিলেন "বাঙালি জাতটাকে দাবিয়ে রাখতে হলে তাদের মাতৃভাষার কথা ভুলিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে হবে। তাহলেই তারা দিন দিন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভূত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে"[৪৭] সেই সূত্র ধরে জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চে এক নাগরিক সম্বর্ধনায় বলেন– "যদি সত্যিই পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তাহলে তার রাষ্ট্রভাষা হবে একটা এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তখন মাঠের একপ্রান্তে বেশকিছু ছাত্র এই উক্তির প্রতিবাদ করে বসে। প্রচুর হৈ চৈ এর ভিতরেও উচ্চকিত সেই প্রতিবাদ জিন্নাহর কানে পৌছায়। তিনি আবার বললেন– আপনারা ভুল পথে চলেছেন। এদের উদ্দেশ্য ভালো নয়, বিভ্রান্ত করতে চায় মানুষকে। মুসলিম লীগই একমাত্র দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল। এতে

Dhaka University Institutional Repository

দলে দলে সবাই জোগদান করুন।"[৪৮] "জিন্নার এই রকম ভাষণ চলছিল যখন, তখন ছাত্রদের ভিতর থেকে গুঞ্জন ওঠে এবং তাদের ভিতর থেকেই আবদুল মতিন ও গোলাম মাওলা তীব্রভাবে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। রাতে কায়েদে আজমের ছবি পর্যন্ত এরা ছিঁড়ে ফেলে।"[৪৯] এই সময় ভাষা-আন্দোলনের উপর প্রথম গান রচিত হয়। ভাষা প্রশ্নে দেশের মানুষের ভিতর কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল–গানের মধ্যে তার বর্ণনা শ্লেষাত্মক রূপে পাওয়া যায়। আনিসুল হক চৌধুরী তাৎক্ষণিক ভাবে লিখে গানটি শেখ লুতফর রহমানের কাছে সুর করতে দেন। সুরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মঞ্চে পরিবেশন করলে ব্যাপক প্রশংসা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গানটি হলো–

'ওরে ভাইরে ভাই — বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই।
যারা ভিড় করে এই পথে-ঘাটে — বাঙাল যাদের বল,
এদের স্বদেশে নিজেদের দশা — করে টলমল॥

বাঙালি তো হিন্দুরা — বাংলা ভাষা তাগোর
হুজুর যা কয়, ঠিক কথা, — আলবৎ হইবো জরুর,
বলে বাঙালি খান পাঠান ওরা — মীরজাফরের চাঁই॥
আজব কথা! গাঁজার নৌকা — পাহাড় দিয়া যায়,
জলে ভাসে শিলা, কিবা — বানরে গীত গায়;
ওরা ধানের গাছে খেজুর খোঁজে — লাজে মরে যাই॥

শোনেন হুজুর– — বাঘের জাত এই বাঙালেরা
জান দিতে ডরায় না তারা,
তাদের দাবি বাংলা ভাষা — আদায় করে নেবেই॥'[৫০]

পরবর্তীকালে গানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এম. হলে গাওয়া হলে শাদা পোশাকধারী পুলিশ এসে গানের কপিটি নিয়ে যায় এবং সাবধান করে দেয় শিল্পী লুতফর রহমানকে, যেন কোনোদিন আর এই গান গাওয়া না হয় বলে বন্ডসই করিয়ে নেয় সেই সাথে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, দ্বিতীয়বার এই গান গাওয়া হলে এদেশ থেকে চলে যেতে হতে পারে।[৫১]

বিভিন্ন সময়কালে ছোটবড় নানা ধরনের প্রহসনমূলক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানের জনসভায় জিন্নাহরই পুনরাবৃত্তি করে বলেন–'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। এর ফলে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিভিন্নরকম আন্দোলন-কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদে'র পক্ষথেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ভীতু সরকার ২০ তারিখ হ'তে পরবর্তী একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারির মাধ্যমে সভা, শোভাযাত্রা, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে। পরিস্থিতি বিবেচনায় আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' এক জরুরি সভায় ১৫ জন মিলিত হয়। সেখানে ১১ জনই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, একজন বিরত থাকেন। মাত্র ৩ ছাত্র নেতা অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও গোলাম মাওলার দৃঢ়তায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। আসে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে একত্রিত

Dhaka University Institutional Repository

হ'তে থাকে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ, উদ্দেশ্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শাসক সরকারের ঔদ্ধত্যকে দমিয়ে দিতে হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত ক্রমে দশজন করে একেকটি দল মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। আর পুলিশরা তাদের গ্রেফতার করতে থাকে, এভাবে অসংখ্য উত্তেজিত ছাত্র যখন বেরিয়ে আসে। পুলিশেরা ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস, গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার দীর্ঘ আন্দোলনে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার এছাড়া অসংখ্য বিপ্লবী ছাত্র-জনতা আহত হন[৫২]। এ বিষয়ে ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদে পত্রিকায় যে তথ্যটি ছাপা হয়–

"গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল প্রায় ৪টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাশের ছাত্র মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (২৬) ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। রাত্রি ৮ টার পর তাহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জব্বার (৩০), আবুল বরকত (২৫) ও বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন আহমদের (২৭) মৃত্যু হয়। আহতদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।"[৫৩]

মহান ত্যাগের মধ্যদিয়েই বাঙালি জাতির প্রধান মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘটনায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গ্রামীণ সকল জনপদ শিউরে উঠলো এবং প্রকৃতপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল বাঙালির স্বপ্ন ও অধিকারের সাথে সরকারের স্বপ্নের পরিকল্পনা। সরকারের দরবারে বাজতে থাকলো পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের গান আর জনতার মঞ্চে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গান। রচিত হলো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সত্যিকার অর্থে বাঙালির সাহিত্য-কবিতা-গানে হঠাৎ করে ব্যাপক পরিবর্তন এসে গেল মাত্র পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই। ভাষা, বিষয়, চেতনা, দেশপ্রেম, বিদেশী শব্দবর্জন করে শুদ্ধ বাংলাভাষা চর্চার পরিমাণ বেড়ে গেল সকলের মনে। একুশের গান তেমনি একটি কবিতা।

'আবদুল গাফফার চৌধুরী একটি কবিতা হিসাবেই রচনা করেছিলেন যা আবৃত্তি করা হয়েছিল গেণ্ডারিয়া হাইস্কুল মাঠে যুবলীগের এক উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে। আবদুল লতিফের সুরে ঐ কবিতা প্রথম গান হয়ে ওঠে আবদুল লতিফ ও আতিকুল ইসলামের কণ্ঠে। তিপ্পান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবসে' ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানে ঐ গান গেয়ে আর ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তুলে আতিকুল ইসলাম এবং আরো কয়েকজন কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে আলতাফ মাহমুদ গানটি আবদুল লতিফের কাছ থেকে শিখে নেন এবং আরো পরে নতুন করে সুর করেন। এখন আলতাফ মাহমুদের সুরেই গানটি গীত হয়।[৫৪] প্রভাতফেরীতে গাওয়ার জন্য সেই বিখ্যাত গানটি হলো–

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি॥'[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত গানটি একুশের প্রভাত ফেরির গান বলা হলেও ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবসে যে গানটি গাওয়া হয়েছিল তা গাজিউল হক (১৯২৯–) রচিত ও নিজামুল হক সুরারোপিত একটি গান।

'ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না
লাঠি গুলি আর টিয়ার গ্যাসে,
মিলিটারি আর মিলিটারি
ভুলব না॥

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ দাবিতে ধর্মঘট
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ
ভুলব না॥

স্মৃতিসৌধ ভাঙিয়াছে জেগেছে পাষাণে প্রাণ
মোরা কি ভুলিতে পারি রাঙা জয় নিশান
ভুলব না॥'[৫৬]

তবে একুশের রক্তাক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে সর্বপ্রথম যে গানটি রচিত হয়, সেটি খুলনার প্রকৌশলী মোশাররফ উদ্দীন আহমদের (১৯২০-১৯৫৬) লেখা। মৃত্যু-ভাষা-জীবন-ত্যাগ ও বীরত্বের অপূর্ব বর্ণনা সম্বলিত একটি বিখ্যাত গান–

ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনার

'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল
ভাষা বাঁচাবার তরে
আজিকে স্মরিও তারে
কোথায় বরকত কোথায় সালাম
সারা বাংলা কাঁদিয়া মরে
আজিকে স্মরিও তারে॥

যে রক্তে বানে ইতিহাস হলো লাল
যে মৃত্যু গানে জীবন জাগে বিশাল
সে জাগে এ ঘরে ঘরে
আজিকে স্মরিও তারে॥

এই দেশ আমার এই ভাষা আমার
এ নহে দাবী এ যে অধিকার
গড়িব আবার লড়িব আবার
ভাসিব রক্তে বয়ে
আজিকে স্মরিও তারে॥'

একই সময়কালে আরেকটি গান রচনা করেছিলেন ২১শে ফেব্রুয়ারির পরপরই গ্রামীণ গীতিকার শামসুদ্দীন আহমদ। তারই সুরারোপিত গানটি হলো–

Dhaka University Institutional Repository

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙ্গালি
ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি, ও বাঙালি...

মাও কান্দে বাপও কান্দে কান্দে জোড়ের ভাই
বন্ধু-বান্ধব কাইন্দা কয় হায়রে খেলার সাথী নাই॥

ইংরেজ যুগে হাঁটুর নীচে চালাইত গুলি
স্বাধীন দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে উড়ায় মাথার খুলি॥

গুলি খাওয়া ছাত্রেরই লাশ কবরে না দেয়
সেই লাশের উপর দিয়া হায়রে আগুনে পোড়ায়॥

গুলি খাওয়া বাঙালির রুহু কাইন্দা কাইন্দা কয়
তোমরা বাঙালি মা ডাকিও আমার জনম দুঃখী মায়রে॥'

এই গানটির মধ্যে মর্মস্পর্শী ঘটনার বর্ণনা ও মূল্যায়ন সার্বজনীনতাকে ধারণ করতে পেরেছে। ভাষা-আন্দোলনের গানের মধ্যে আবদুল লতিফের (১৯৩৫-২০০৫) একটি গান সর্বোপরি বাংলা ভাষা-সাহিত্য-ঐতিহ্যগত দিক থেকে অমর সৃষ্টি। গীতিকার তুলে ধরেছেন বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতির নানামুখি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অধিকার, দর্শন, তত্ত্ব, মনীষী, নিসর্গ, মা-বোনের মধুর ডাক-বুলি, বাঙালির চরিত্র, সংগ্রাম ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাসহ বিচিত্র উপমা। ১৯৫৩ সালে জারির সুরে রচিত দীর্ঘ গানটির নমুনা হলো–

'ওরা আমার মুখের কথা
কাইড়া নিতে চায়,
ওরা, কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়॥...

এই ভাষারই লাইগা যারা
মায়ের বীর দুলাল
দেশের মাটি বুকের খুনে
কইরা গেছে লাল॥...

কইরো না আর দুঃখ শোক
শোন রে গাঁও গেরামের লোক
শোন শোন গঞ্জের সোনা ভাই
একবার– বুক ফুলাইয়া কওরে দেখি
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই॥'

৩০টি অন্তরায় বিন্যস্ত গানটি বেশ দীর্ঘ হলেও গায়নের সময় আবেদন কখনো কমে নি। আবদুল লতিফ এরপরে আরো অনেক সংখ্যক ভাষা ও দেশের গান লিখেছেন। কয়েকটি গানের তালিকা নিচে দেয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালে রচিত– 'বুকের খুনে রাখলো যারা
মুখের ভাষার মান
ভোলা কি যায়রে তাদের দান ।'

১৯৬৫ সালে রচিত– 'আমি কেমন কইরা ভুলি
মুখের কথা কইতে গিয়া
ভাই আমার খাইছে গুলি ।'

১৯৬৮ সালে রচিত– 'এসেছে আবার অমর একুশে
পলাশ ফোটানো দিনে
এদিন আমার ভায়েরা আমার
বেঁধেছে রক্ত ঋণে ।'

১৯৭০ সালে রচিত– 'সেবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে
যে বীজ হয়েছে বোনা
সে বীজ বৃক্ষে ধরিয়াছি ফল
স্বাধীনতা সোনা সোনা ।'[৫৭]

আবদুল লতিফের ভাষার গান ও শহীদের চেতনাকে কেন্দ্র করে এত বিচিত্র বিষয়বোধের সন্নিবেশ ঘটেছে যে–সংগীত ও গণসংগীতের ধারাকে ভাষার গানের অবস্থান থেকে উচ্চতার আসনে বসিয়েছে। যেখানে জাতীয়তাবোধ থেকে আন্তর্জাতিকতা বোধের অধিকারকে চিহ্নিত করেছে নানামুখী বক্তব্যের সমাহারে। যেমন প্রসঙ্গ এসেছে–রূপকথার কিচ্ছা-কাহিনী, ভাষা-সংরক্ষণের তাগিদ, শহীদের বীরত্বকে সামনে রেখে সাহসী পথচলা, আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ, বিদেশী ভাষার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণনা আর কারুর রচনায় এত পূর্ণাঙ্গতা পায় নি।

১৯৫৩-৫৪ সালে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আরেকটি কবিতা রচনা করেন, শেখ লুতফর রহমান (১৯২০-১৯৯৪) তাঁর সুর দিয়েছিলেন। বহুল প্রচারিত এই গানটির–

'রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা
ফাল্গুনে আজ চিত্ত আত্মভোলা
আমি কি ভুলিতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারি॥

ঘুরে ঘুরে আসে প্রতি বছর শেষে
আমার ভাইয়ের রক্তে আগুন মেশে
উজ্জীবনের নতুন পতাকা তোলা
রক্তে আমার আবার লেগেছে দোলা
আমি কি ভুলিতে পারি একুশে ফেব্রুয়ারি॥'[৫৮]

প্রভাত ফেরীর জন্য আরো একটি গান লিখেছিলেন বদরুল হাসান। আলতাফ মাহমুদের সুরে গানটি হলো–

Dhaka University Institutional Repository

'ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙাতে ঘুমিয়ে গেল যারা
জ্বলছে স্মৃতি আলোর বুকে ভোরের করুণ তারা ।

পাষাণ পুরীর প্রাণ জাগো
নিথর গাঙে বান জাগো
ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙো॥'

গণসংগীতের আরেক শক্তিমান গীতিকার পশ্চিমবঙ্গের পরেশ ধরের (১৯১৮-) লেখা গান ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে প্রভাতফেরীর গান হিসেবে পরিবেশিত হয় । গানটি যদিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে পঞ্চাশ-এর দশকে লেখা, তবু ভাষার ক্ষেত্রে বর্ণনা অনুযায়ী বেশ প্রশংসিত হয় । অবশ্য গানটির রচনাকাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ভিন্নমতও পাওয়া গেছে । অন্যমত হলো–"গানটি রচিত হয় ১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে । প্রথমে গীতিকার নিজেই সুরারোপ করেন; পরে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপ করেন ।"[২৯] গানটি হলো–

'ও ভাইরে বন্ধু, বলতে কি পারো
আমার বুকের খুনে কেন হাত রাঙালে
বল কোন অপরাধে কার লাভের আশে
প্রতিবেশীর চির চেনা ঘর জ্বালালে॥

তোমায় আমায় চেনে দেশের প্রতি ধূলিকণা
যুগে যুগে পাশাপাশি রয়েছি দু'জনা
সকাল সাঁঝে সবুজ মাঠে খেলেছি একসাথে
এক জোটে বাঁধা ছিলাম কলে-কারখানাতে
একি ছিল রে কপাল॥'

শহীদের রক্তে বোনা বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীত যতটুকু অর্জিত হয়েছে তার থেকে শতগুণ রয়েছে ত্যাগের ইতিহাস । হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) গানে তার চিত্র ভেসে ওঠে । শেখ লুতফর রহমানের সুরারোপিত অতি জনপ্রিয় এই গানটি হলো–

'মিলিত প্রাণের কলরবে
যৌবন ফুল ফোটে রক্তের অনুভবে
শহীদ মুখের স্তব্ধ ভাষা
আজ অযুত জনের বুকের আশা
ওদের মরণে প্রাণ পেলাম আজ আমরা সবে ।'

নাজিম সেলিম বুলবুলের লেখা ও সুরারোপিত একটি গান–

'নিষ্ফল কভু হয় না ধরায়
রক্তের প্রতিদান
দিকে দিকে তাই ফেব্রুয়ারির
শোন ঐ জয়গান ।

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি নয় নয় ও যে
শুধু এক শোক মাস
এতে আছে ত্যাগ, সংগ্রাম-বাণী
মুক্তির আশ্বাস॥'

লোকমান হোসেন ফকিরের লেখা ও সুর করা একটি গান শহীদ দিবসকে স্মরণে রেখে–

একুশে আসে জানাতে বিশ্বে
ভাষার কতটা মূল্য
ভাষার দাবীতে নেই কোনো জাতি
বাঙালির সমতুল্য॥

যতদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবী
একুশের কথা একুশের ছবি
এ দেশের প্রতি শহীদ মিনারে
প্রিয় তোমারই মাল্য॥'

নাজিম মাহমুদের লেখা ও সাধন সরকারের সুরে একটি গান বিষয়গত দিক থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম। যেখানে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে যে, কিভাবে একুশ আমাদের জাগাতে পারতো এবং একটি উন্নত জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য এই আত্মত্যাগ কতটা অনুপ্রেরণা বস্তু! গানটি হলো–

'আমাদের চেতনার সৈকতে
একুশের ঢেউ মাথা কুটলো
শহীদের রক্তের বিনিময়ে চোখে
জল কয় ফোঁটা জুটলো॥'

ভাষা শহীদের রক্তে কালো পিচ ঢালা পথ যেন রাঙিয়ে দিয়েছে। কামাল লোহানী সংগৃহীত এবং মাহমুদুন্নবীর করা মর্মস্পর্শী সুরে একটি গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল–

'এই পথ এই কালো পথ
পিচে ঢাকা ইতিহাস'

একুশের কবিতা হিসেবে প্রথম লেখা হয় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। ২১শে ফেব্রুয়ারির রাতেই কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) কবিতাটি অবশ্য পরবর্তীতে সুরারোপ করেন মোমিনুল হক। কবিতাটি হলো–

'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে-ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ,
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি,
ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি॥'[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও পরবর্তী হাজার হাজার পৃষ্ঠা কবিতা-গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে একুশকে নিয়ে। তন্মধ্যে অন্যতম হলেন শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে অনেকটা পরিষ্কার হয় যে বাংলা ভাষার মানরক্ষার জন্য সংগীতের দিক থেকেই এদেশের গীতিকারগণ কী অসীম ভূমিকা রেখেছেন এবং আরো অসংখ্য গান রয়েছে যার ব্যাপকতা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সংযুক্ত করা অসাধ্য। তবে শহুরে শিক্ষিত শিল্পীদের বাইরে থেকে ও গ্রাম-গঞ্জের কবি-গায়েনেরাও যে কতো অজস্র পরিমাণ ভাষা বিষয়ে গণসংগীত রচনা করেছেন তার উদ্ধার করা খুবই দুরূহ কাজ। তবে বেশ কিছু নমুনা পাওয়া গেছে এদেশের প্রণম্য কবিয়াল-গায়কের কাছ থেকে। পাঞ্জুসাঁই, মহীন শাহ, শাহ আবদুল করিম, বিজয় সরকার, কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সিলেটের প্রখ্যাত গণশিল্পী শাহ আবদুল করিম ভাষা শহীদের স্মরণে রচনা করেছেন বেশ কিছু গান তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

'ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে
সালাম বরকতের বুকে
গুলী চালায় বেঈমানে॥

বাঙালির বাংলাভাষা
এই যে তাদের মূল ভরসা
এই আশায় বঞ্চিত হলে কি চলে
ভারত যখন স্বাধীন হল
পাকিস্তান চলে এল
দেশ বিভক্ত করা হয় কৌশলে।
উর্দুভাষী শোষক যারা
ধর্মের ভাওতা দিয়ে তারা
বন্দী করিল পাকিস্তানে॥'[৬১]

আরেকটি গান– 'সালাম আমার শহীদ স্মরণে
দেশের দাবী নিয়া দেশ প্রেমে মজিয়া
প্রাণ দিলেন যে সব বীর সন্তানে॥

জন্ম নিলে পরে সবাইতো মরে
স্বাভাবিক মরা এই ভূবনে
দেশের জন্য প্রাণ যারা করে দান
স্মরণ করি আজ ব্যথিত মনে॥'[৬২]

বিশিষ্ট বিচারগানের শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি ভাষার উপর 'ভাষা-আন্দোলনের জারী' নামে একটি দীর্ঘ জারিগান রচনা করেছেন। এতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট থেকে শুরু করে বাহান্নর শহীদ এবং তার পরবর্তী পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী দীর্ঘ বয়ান উঠে এসেছে। ভাষা-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস বললেও ভুল হবে না, কারণ রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি সামাজিক, পারিবারিক, জাতীয় ও মানবিক বোধের নানাদিক উন্মোচন করা হয়েছে এই গানে। নিম্নরূপ মাঝের কয়েক ছত্র তুলে ধরা হলো–

'একুশে ফেব্রুয়ারি সুপ্রভাতের কালে
জীবন মরণ খেলা আজ বাঙালির কপালে
বিশে ফেব্রুয়ারি রাত্রে থমথমে ভাব
কারো চোখে ঘুম নাই একুশের খোয়াব
আহম্মদ রফিক বলেন কি হবে উপায়
সরকারের চৌচল্লিশ ধারায় নিষেধাজ্ঞা রয়
আবার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের মতে
আপোষবাদী নীতি তারা চাইয়াছেন চালাতে॥'[৬৩]

পশ্চিমবঙ্গের অনুভূতি

দেশ বিভাগের পরেও সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির কারণে পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ভঙ্গুর হয়েছে। এর বাইরে সব সময়েই একটি সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক জাতিগত সম্পর্ক, ভালবাসা ও সহমর্মিতা সব সময়েই অক্ষত থেকেছে। ভাষা-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের খোঁজ-খবর পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরাও গভীর মনোযোগের সাথে অবলোকন করেছিল। বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি বর্ণনা থেকে তা অনুভূত হবে। তিনি লিখেছেন–

'পূর্ব-বাংলা থেকে ভেসে এলো সংবাদ–বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবী করে শহীদ হয়েছে আবুল বরকত, রফিক। ...প্রচণ্ড নাড়া লাগলো মনে। ঠিক করলাম পালা গান লিখবো। কিন্তু এতবড় ঘটনাকে ধরি কোন সুরে? গুনগুন করতে করতে মনে হলো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যালাডের সুরেই বোধহয় ধরা যাবে। মনে পড়লো, নেত্রকোণার নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের রসিদউদ্দিন ও জামসেদ উদ্দিনের কথা। সেদিন সমাগত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এই দুই গায়ক অনাহুত এগিয়ে এসেছিলেন গান গাইতে গাইতে : 'আমার দুঃখের অন্ত নাই/ দুঃখ কার কাছে জানাই।/ সুখের স্বপন ভাঙলোরে, চুরাই বাজারে।' সেই সুরেই রচিলাম 'ঢাকার ডাক'

'...ও ভাইরে ভাই–
ছিল বুড়িগঙ্গার মরা পানি
তার বুকে কে আনলো জোয়ানী রে
কার কইলজার গুণে রয় উজানী
শুকনা বালুর চরে।

ও ভাইরে ভাই–
একুশে ফেব্রুয়ারি দিনে
খুশির মধু নয়া ফাগুন রে
হঠাৎ দিন দুপুরে অমানিশায়

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকলো অন্ধকার ।...'

এই গানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন– "গান রচনা করতে করতে এমনি অভিভূত হয়ে পড়িনি কোনোদিন। ...সংস্কৃতি আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালেই পার্ক সার্কাসে Peace cultural conference-এর এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। তাতে সারা ভারত থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন। ওমর শেখ সেই প্রথম কলকাতায় জনসমক্ষে গান করেন। এই অনুষ্ঠানে দশ হাজার লোকের সামনে 'ঢাকার ডাক' বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। মনে আছে পৃথ্বিরাজ কাপুড়–তিনি বাংলা বুঝতেন খুবই ভালো–অনুষ্ঠান শেষে আমায় জড়িয়ে ঘরে বলেছিলেন, 'Undoubtedly the best production from west Bengal"[৬৪]

একটি বিকাশমান ভাষার উপর হিংস্র থাবা মেরে ভাষাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল যারা। এতদিন পরে হলেও সেই ভাষাই পৃথিবীর সকল ভাষার আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। সত্যিকার অর্থে যারা জীবন দিয়েছিলেন ভাষার জন্য তাদেরকে সামনে রেখে যে গান ও কবিতা রচিত হয়েছে, এই সম্পদই ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'[৬৫]-এর মর্যাদা সৃষ্টি করে বিশ্বের সকল মাতৃভাষাকে দিয়েছে উচ্চতম সম্মান। এমনকি উর্দুভাষাকেও তার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলা ভাষা শহীদের আত্মোৎসর্গ ভূমিকা রাখতে পেরেছে। এই বিজয় যতটুকু ভাষা-শহীদদের, ভাষাসৈনিক-শিল্পীদেরও তার থেকে কমপ্রাপ্তির নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটের গান

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পরবর্তীতে যে কোনো সভা-সমাবেশের শুরুতে ও শেষে এমনকি অনুষ্ঠানের মাঝে চলতো নানা ধরনের সাংস্কৃতিক পর্ব। গান, পুথিপাঠ, গণকবিতা, জারিগান ইত্যাদির প্রচলন হয়ে উঠেছিল গণনাট্য সংঘের থেকে পাওয়া অভ্যাসের গুণে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তখনো প্রগতিশীলদের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারে স্বদেশীগান গাওয়া হতো। সব ধরণের নির্বাচনী প্রচার এবং নির্বাচনের উপর্যুক্ত প্রার্থীর বিষয়ে গ্রামীণ জনপদের মধ্যে যেমন অপার কৌতুহল ছিল একইভাবে কবিয়াল ও জনদরদী শিল্পী ভোটের গান পরিবেশন করে জনমত সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা তৈরি করতেন।

ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে। ক্ষমতাবান মুসলিম লীগের আচরণ ও নব্য সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়ে গেছে এদেশের মানুষের সামনে। তাই নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাশার চেয়েও পেল অনেক বেশি প্রাপ্তি। কারণ সেই নির্বাচনী প্রচারাভিযানে হক-ভাসানী নেতৃত্ব 'যুক্তফ্রন্টের' প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিল স্বপ্রণোদিত গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ। সংগীত রচনা, পুথিপাঠ, নাটক, জারিগান প্রভৃতি দিয়ে যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করেছিল যুক্তফ্রন্টকে (যুক্তফ্রন্টের সাথে যুক্ত তৎকালীন নেজামে ইসলাম বা খেলাফতে রব্বানী পার্টি ব্যতিত)। ৪৮-এর ভাষা বিরোধ, ৫২'র ভাষা-আন্দোলন, মুসলিম লীগ-এর সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও শোষণ বাংলার মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলেই এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। গবেষণার এই পর্বে ৫৪'র নির্বাচনই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাশীল মুসলীম লীগের হলো লজ্জাজনক পরাজয়। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব-পাকিস্তানের কাউন্সিল অধিবেশনে ২১ দফার উপরে ভিত্তি করে হক-ভাসানি-সোহরাওয়ার্দীর নেতত্বে এই নির্বাচনী অভিযান চালানো হয়।[৬৬] এ কে ফজলুল হক ও আবদুল হামিদ খান ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি যে সকল কারণে ছিল–তার মধ্যে বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ ও বৈষম্যমূলক নীতি। একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার হীন-চক্রান্ত এবং ১৯৪৮ সালের জুন মাসে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বহিষ্কার করা; জুলাই মাসে পুলিশ বিদ্রোহ, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, মার্চ ১৯৪৯-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ধর্মঘট। তাদের সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচনের প্রত্যক্ষদর্শী রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের দৃষ্টিতে–"হক-ভাসানী-সুহরাওয়ার্দীর সমবায়ে দেশময় যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল। ফল যে এমন হইবে পনর দিন আগেও আমি তা বুঝিতে পারি নাই। জনগণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারী জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দা রক্ষা করিয়াও দলে দলে মেয়েরা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে। পর্দারক্ষার জন্য তারা এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে : চারজন যুবক একটা মশারির চারকোণা ধরিয়াছে। পনর বিশজন মেয়ে ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি ঘিচি করিয়া ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে। মশারির মধ্যে মেয়েরা চলিয়াছে। প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম হইতে মিছিল করিয়া ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে। কাগয ও বাঁশের খাবাসি দিয়া যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রতীক বিশাল আকারের নৌকা বানাইয়া চলিয়াছে নিজেরাই। সেই নৌকা কাঁধে করিয়া 'যুক্তফ্রন্ট যিন্দাবাদ' 'হক-ভাসানী যিন্দাবাদ' যিকির দিতে দিতে তারা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে।'[৬৭]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ শাসনামলে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের কালে প্রায় সকল নির্বাচন ছিল এলাকা প্রতিনিধির ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। এরমধ্যে ১৯৫৪ সালের ভোট সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৩৭ সালেও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সব নির্বাচনেই আন্দোলনের গান গাওয়ায় বা রচনার রেওয়াজ ছিল। উপরতলার মানুষদের ইচ্ছা-ভাবনা অনুসারে ক্ষমতাবাজ লুটেরাদের হাতেই সবসময় শোষিত হয়েছে যা দ্বারা রাষ্ট্র ও জনগণের বিপক্ষেই গেছে সর্বক্ষণ। তৎকালীন নির্বাচনে যে সকল গান গাওয়া হতো, তার প্রাসঙ্গিক লিখিত তথ্যাবলী খুব একটা পাওয়া যায় না। তবে সংগীত মনস্ক যে সময়ের আন্দোলনে অংশীদার ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ ও ব্যক্তিগত অভিমত থেকে এই গানগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এরমধ্যে কিছুগান সরাসরি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, কিছুগান ১৯৪৮-৫২'র ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। বেশির ভাগ গান ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গণসংগীত এবং তার পূর্ববর্তীকালের স্বদেশীগান ইত্যাদি।

সরাসরি নির্বাচনী প্রচারণার গানও নেহায়েৎ কম নয়। কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের শ্লেষাত্মক ও ছড়াগান এবং কবিয়াল রমেশ শীলের গানই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কিছু অজ্ঞাত রচয়িতার গান পাওয়া য়ায়। বেশ কয়েকটি প্যারোডি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো–

ভোটের গান একধরনের গণসংগীত বলার কারণ হলো–এ গান মূলত গণমানুষকে সচেতন করে প্রকৃত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করার বাসনায় গণশিল্পীদের দ্বারা তাৎক্ষণিক সৃষ্ট গান করা–যা জনসভায়, প্রচারণায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তবে অনেক সময় অযোগ্য প্রভাবশালী প্রার্থীরাও এই কাজটি করে থাকে। কিন্তু গ্রামীণ নীতিবাদী কবিয়াল সবকিছুর উপর ছাপিয়ে বিবেক-চরিত্রের মতো মানুষকে তাদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের জন্য বাণী প্রচার করেন গানের মাধ্যমে, যেখানে কৃষক-মজুর-খেটে মানুষের জন্য কে ভালো বা কোন দল ভালো তা অনুভব করিয়ে দেয়। এই গান যেহেতু তাৎক্ষণিক অতএব গানের কথার ভিতর সমৃদ্ধি বা সুরের নিরীক্ষা প্রবণতা ততটা কাজ করে না। সেইসাথে পুরাতন জনপ্রিয় গানের প্রভাব নিয়ে বা প্যারোডি করে এই গানগুলো গীত হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু ভোটারদেরকে সোচ্চার করা। সেই নিবেদনটাই আসল। দেখা গেছে চুয়ান্ন সালের ভোটে এমন কিছু গান পরিবেশন করা হয়েছে যার রচয়িতা ও সংযোজনকারী এক নয়। আবার রচনার মধ্যে দেখা যায় অন্য কোনো গানের লাইন এসে জুড়ে বসেছে। "বেশ কিছু গান রয়েছে যার আস্থায়ী বা অন্তরার কলি মূলানুগ রেখে একেক এলাকায় একেক ভাবে নতুন নতুন কলি সংযোজন কখনোবা নতুন ভাবে রচনা করা হয়েছে, কখনোবা তা গ্রহণ বা চয়ন করা হয়েছে অন্য এক বা একাধিক জনপ্রিয় গান থেকে।"[৬৮] এমনকি কখনো কখনো আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবেও গীত হয়েছে অঞ্চলভেদে। তেমনই একটি গান 'ভাবকি চমৎকার গো দেশের দেশের ভাব কি চমৎকার' মন্বন্তরের সময় কন্ট্রোল ব্যবস্থার সমালোচনা করে রচিত হয়েছিল। কিন্তু সব মিলে নির্বাচনে যখন গীত হয়, সেখানে দেখা যায় অনেক গানের সম্মিলনে একটি গান গীত হয়েছিল। গানটি হলো–

'মোরা কী দুখে বাঁচিয়া রবো
মোরা উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিতে

Dhaka University Institutional Repository

চির উপবাসী হবো
কী দু'খে বাঁচিয়া রবো!

বারো মাসই মোরা রহিব রোজা
বহিব না পেটে ভাতের বোঝা;
আর খালি পেটে পেটে বুকে হেঁটে হেঁটে
মুখে জিন্দাবাদ কবো
কী দুখে বাঁচিয়া রবো!

স্বর্গে যাবো গো! স্বর্গে যাবো গো!
খালি পেটে পেটে স্বর্গে যাবো গো
খালি পেটে পেটে স্বর্গে যাবে গো!
বুকে হেঁটে হেঁটে স্বর্গে যাবো গো
বুকে হেঁটে হেঁটে স্বর্গে যাবে গো!
রাণীমা'র আঁচল ধরে স্বর্গে যাবো গো
রাণীমা'র আঁচল ধরে স্বর্গে যাবে গো!
মোরা গামছা গলায় নাগর দোলায়
গাছে গাছে ঝুলে রবো
মোরা কি দুখে বাঁচিয়া রবো॥

দেশের ভাব চমৎকাব ভাব চমৎকার
বলিব কি ভাই ভাব চমৎকার
চোরেরা খায় মণ্ডা মিঠাই
সাধু করে হাহাকার ।
কত মানুষ আছি আজো গৃহহারা
ভাত পায় না দিনান্তে তারা
ঘোরে দ্বারে দ্বারে ঘোরে পথে পথে
না পায় কূল কিনারা॥

স্বর্গে যাবো গো! স্বর্গে যাবো গো!
থালা বাসন হাড়ি কুড়ি গৃহস্থের বেসার
সমুদয় বিক্রি করে স্বর্গে যাবো গো

অভাব গ্রস্থ প্রায় সমস্ত গৃহস্ত বেকার
অস্তি চর্মসার হইয়া স্বর্গে যাবো গো
তাই কি দুখে বাঁচিয়া রবো
মোরা উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিতে
চির উপবাসী রবো
কি দুখে বাঁচিয়া রবো॥'[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

গানটির প্রথম স্তবক 'কী দুখে বাঁচিয়া রবো' এবং নিবারণ পণ্ডিতের লেখা 'ভাব কি চমৎকার গো' মনে হয় এই দুইটি গানের সন্নিবেশ করা হয়েছে। হেদায়েত হোসেন মোরশেদ বলেছেন– "গানটির কিছু অংশের বাণী জোগাড় করা হয়েছে শহীদ আলতাফ মাহমুদ-এর ঘনিষ্ট এক বন্ধু, একদা গণসংগীতের শিল্পী বরিশালের রমিজুল হক (চুন্নু)'র কাছ থেকে। গানটির পাঠ ও পর্যালেচনা করলে দেখা যায়, লোকজ ধারায় গানের রচয়িতা তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সগড়া গ্রামের নিবারণ পণ্ডিত এর লেখা কিছু গানের কলি এই গানটির ভেতর রয়েছে।" [৭০]

নিবারণের গানটি দুর্ভিক্ষের সময় কন্ট্রোল ব্যবস্থায় উদ্ভুত চরম দুর্নীতির সমালোচনা করে রচিত ছিল। 'কি দুখে' গানটির অর্থ সে কালীন দুর্ভিক্ষের সময় সরকার কিংবা রাষ্ট্র-প্রধানদের অবহেলা ও অনৈতিক নির্মমতার উপরই রচিত বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু এই গান দু'টির সমন্বয়ে সুরের ও সময়ের প্রয়োজনে কথারও বেশ হেরফের করা হয়েছে। যেমন–

নিবারণের গানে : ভাব কি চমৎকার গো দেশের ভাব কি চমৎকার
এই গানে : দেশের ভাব চমৎকার ভাব চমৎকার/ বলিব কি ভাই ভাব চমৎকার
নিবারণের গানে : কত মানুষ গৃহহারা, ভাত পায় না দিনান্তে তারা
এই গানে : কত মানুষ আছে আজো গৃহহারা/ ভাত পায় না দিনান্তে তারা
নিবারণের গানে : না পাইয়া কূল কিনারা ঘুরে দ্বারে দ্বার
এই গানে : ঘোরে দ্বারে দ্বারে ঘোরে পথে পথে/ না পায় কূল কিনারা।

উপর্যুক্ত গানের সংযোজন বিয়োজন দেখে মনে হয় এটি একটি কম্পোজিশন যা সময় ও নির্বাচনের উপযোগী করে সংযুক্ত করা হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের গান হলেও তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের শোষণ ও অত্যাচারী শাসনের ফলে বাংলার মানুষ ভেতরে ভেতরে রুষ্ট হয়ে ওঠে। নির্বাচনের আগে গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের নির্বাচনের আগে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশদের শাসন চলাকালীন একটি সাধারণ নির্বাচন হয়। তখন গণসংগীতের কাঠামোগত অবস্থা বেশ শক্ত আসনে। আইপিটিএ'র কর্মকাণ্ড যে কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কারের সাথে একাত্ম। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, বিনয় রায় এবং নিবারণ পণ্ডিত সারাবাংলা করে তুলেছেন উতালা। কবিয়াল নিবারণ সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রচনা করেন একটি গান। তৎকালীন 'স্বাধীনতা' ও 'জনযুদ্ধ' (১০ই জানুয়ারি ১৯৪৬) পত্রিকায় গানটি প্রকাশিত হয়। গানটিতে নির্বাচনের আগে পুঁজিপতি ক্ষমতালোভীরা ক্ষমতায় যাবার আগে সাধারণ মানুষের ভোট জব্দ করার জন্য কী কী আচরণ ও কৌশলের আশ্রয় নেয় তার বর্ণনা করা হয়েছে। কবি দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন–

'তোমরা এবার লও চিনিয়া
আসছে কত দেশ-দরদী, ভোটাভুটির গন্ধ পাইয়া॥

শুনতে পাই হাট বাজারে এবার যত জমিদার
টাকা পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া
খদ্দর টুপি ধরেছেন কেহ কোলাব্বর ছাড়িয়া
আইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করেন

Dhaka University Institutional Repository

কেমন আছেন সেলাম দিয়া॥'

এই সময়কালে 'রাজদ্রোহ' নামক মিথ্যা মামলার আসামী কবিয়াল সংগ্রামী গুমানী দেওয়ান তার একটি গানে দেশের মানুষের ভাগ্যের যে অপরিবর্তনীয় অবস্থা। দারিদ্র্য, কষ্ট, ভাগ্যের লিখন নিয়ে রচনা করেছিলেন প্রতীকি অথচ শ্লেষাত্মক গান–

'বাবারে, ও বাবারে, কোনদিকে বা যাই
আমার একূল ওকূল দু'কূল
বিলকুল কিনারা নাই....
এবার আসছে ইলেক্শান
মশারি খুব থেকো সাবধান
রগড়া নিতে বিগড়ে গেছে সব হিন্দু মুসলমান
তারাই দেবে এর সমাধান
করে তোমার রামছাটাই, বাবারে...'

এভাবে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে যে জনসচেতনামূলক গণসংগীতের প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তার প্রভাব সুস্পষ্ট অন্তত গানের ভাষারীতি ও শ্লেষাত্মক বর্ণনার মাঝে। চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীলের একটি গানের চরণ লক্ষ করা যাক। পুথির ভঙ্গিমায় লেখা ও সুর করা–

'হুনছনি ভাই দ্যাখছনি, দ্যাখছনি ভাই হুনছনি
স্বাধীনতার নামে আজব কাণ্ড দ্যাখছনি
হাডত বাজার কইত্তাম যাই জিনিষের নাম দেখিও ভাই
মাথায় উড়ে ঘুন্যির বাই রক্তেতে দ্যায় চিরকানি॥ ...

জমিদারী আইজ আছে ইশ্কুল কলেজ উইঠ্যা গেছে
এখন বিদেশী হরফে চলে দেশী রাজার কাণ্ডানী॥ ...'

এই ভাবে বড় বড় পুথিপাঠের মাধ্যমে মুসলিম লীগের বেপরোয়া নিপীড়ন, দুর্নীতি, ট্যাক্স, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে গান রচিত হয়েছে। ইত্যাদির খিস্তি-খেউড় জাতীয় শব্দাবলি করে প্যারোডি গান করা হতো। এসময় যারা ছিলেন সক্রিয় গণশিল্পী–তাঁদের মধ্যে নিজামুল হক, মোমিনুল হক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, নূরুল ইসলাম, চিরঞ্জীব দাস শর্মা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য[৭১]। তাঁরা এ সময় আরো বেশকিছু গান গেয়ে গেয়ে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন যেমন–

'মরি হায়রে হায় দুঃখ বলি কারে
মুসলিম লীগের কাণ্ড দেইখ্যা
পরাণ উঠে জ্বলি রে

লীগের মন্ত্রীরা আজি কাঁদে ঘরে ঘরে
ভোট দিমু ভাই হক-ভাষানীর নায়ে॥'

Dhaka University Institutional Repository

এই গানগুলোয় আদতে রমেশ শীলের গানের চরণের প্রভাব পড়েছে। তার একটা কারণ হলো রমেশ শীলই ভোটের উপর অনেক সংখ্যক গান রচনা করেছেন। নিচে তাঁর লেখা কয়েকটি গানের কলি প্রদান করা হলো, যেমন ভোটের আহবান করে লিখেছেন–

'ইলাক্সানে যাইও,
হিন্দু-মুসলেম, কৃষক-মজুর এক হয়ে দাঁড়াইও রে
বন্ধুগণ রে–স্বার্থলোভী মুনাফাখোর তারে চিনি লইও।'

কমিউনিস্ট চেতনা থেকে লিখেছেন–

'এবার এসেম্বলি ভোটের সময় এলো বন্ধুগণ।
আইন সভাতে এবার মোদের জীবন মরণ পণ।
ভেবে চাও রিলিফের কাজে, কে অগ্রণী দেশের মাঝে
কার প্রচেষ্টায় হলো দেশে রেশন প্রবর্তন।
কমিউনিস্ট কর্মীগণ দেশে নানাস্থানে
খাদ্য কাপড়ের কারণে কারো আন্দোলন।'

প্রার্থীদের অসৎ মনোবাঞ্ছা নিয়ে লেখা একটি গান যেমন–

'কৃষক বন্ধুরে উঠে দাঁড়াও গণআন্দোলনে ...
ভোটের আশা মনে নিয়া, কৃষকের দরদী হইয়া
পাড়ায় পাড়ায় ফিরে আপন মনে।

দেশপ্রেমিক দেখ যারে, ভোট দিও বিনা বিচারে
তবে মোরা বাঁচিব পরাণে।'

সাবধান বাণীমূলক একটি গান–

'এবার ভোট দিতে হুঁশে থাকিস ভাই তোরা
নইলে ভাই যাবো মারা, মেম্বার উঠছে দেশ জোড়া
গরীব গেলে কাপড় আনতে তিন ঘণ্টা থাকে খাড়া
বড় লোক যার কাপড় আনতে চোখে করে ইশারা
ফাইন শাড়ি পায় চার জোড়া।'

ভোটের সময় যে ছোট ছোট পুরস্কার দিয়ে প্রার্থীরা ভুলিয়ে রাখে তার উপর রচিত–

'হুন্যনি ভাই খবর দিয়ে ভোট দিতা যাইতা
চা'র দোয়ান ফিরি দিব পেট ভরি খাইতা।'

হুঁশিয়ারমূলক গান–

'একি চমৎকার, দেশে এল ফাঁক তালের কারবার
গরীব মারার কল বসেছে, হুঁশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার।'

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে প্রার্থীগণ নির্বাচন ঘনিয়ে এলে ভোট নেয়ার জন্য নানারকম তোষামোদ করে থাকে। এতে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। নানারকম পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে লিখেছেন–

'ভোট দিবা কারে তোমরা
ভোট দিবা কারে
ভোটের জ্বালায় অস্থির হইলাম
টিকতে নারি ঘরে॥'

ভোটের ফলাফলের পর মানুষের যে জীবন অপরিবর্তনীয়ই থেকে যায় তার বর্ণনা করেছেন–

'শুন শুন দেশের ভাই বোনরে বন্যা এল দেশে
কিছু মুসলিম নরনারী মরে উপবাসে
ভোট দিয়া মেম্বার বানাইলাম উপকারের তরে।'

এইভাবেই চোখে আঙুল দিয়ে সমাজপতিদের দুর্নীতি ও অরাজকতার সব বিবরণ তুলে ধরতেন কবিয়ালরা। ফলে গণমানুষের মনে প্রকৃত নেতার সম্পর্কে ভালোমন্দ খুঁটিনাটি, অতীতের আচরণ, ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা ছিল সেইসব গানে। আরেকজন প্রতিভাবান কবিয়াল ফণী বড়ুয়া রমেশ শীলের অন্যতম প্রধান শিষ্য। তাঁর গানের মধ্যে বিশেষ করে নন্দনতাত্ত্বিক রূপরেখা ও ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। পুরোমাত্রায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ধারণ করতেন এই কবি। নির্বাচনী প্রচারণায় তিনিও বেশ কিছু গান লিখেছিলেন। যেমন–

একটি গানে জনগণের দুরবস্থা বর্ণনা করে রচিত হয়েছে–

'ও ভাই হুঁশিয়ার, ভোটের সময় আজগুবি কারবার
দালালের ফাঁদে পড়িয়া হইও না বাঘের শিকার
স্বাধীনতা আইসাছে গত হইল ছয় বৎসর
কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত কবরে বেঁধেছে ঘর
এক বেলা ভাত, ছেঁড়া কাপড় মিলিয়াছে কয়জনার।'

ফণী বড়ুয়ার গানের মধ্যে প্রবাদ উপমা উপদেশ আসতো বেশ সাবলীল ভাষায়, যেমন একটি গান–

'ভাল-মন্দ জানিয়া ভোট দিও, ও ভাই ভাইয়াইন রে
হুঁশের মানুষ তুষের বাড়া, দিয়া হলি সর্বহারা ....
যারা চায় না নিজের স্বার্থ, হজরত ওমরের মত
তারে ভোট দিয়া আইন সভায় পাঠাইও॥'

অথবা– 'ভোট দিও গরীব দরদী ভাই
আমার দেশের ভাই
ভোটের সময় দেশের মাঝে
মুরগীর বন্ধু শৃগাল সাজে
দোষ ঢাকিয়া নিজের গুণ দেখায়॥'

তাঁর গানের মধ্যকার বিভিন্ন কলি আছে খুব গভীর মর্মপোলব্ধির, যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

'স্বাধীনতার গণতন্ত্রের যাহারা দুশমন
ভোট বেচিয়া টাকা পাইলে খুশি হয় তার মন।
লক্ষ টাকার সমতুল্য শুধু একটা ভোট
স্বাধীনতার মূল অধিকার নাগরিক পাসপোর্ট রে॥'

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় রমেশ শীলের সাহচর্যে এবং রাইপোপাল দাশকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন ফণী বড়ুয়া। তাঁর গানে বাংলার ইতিহাস, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অধিকার ও সুবিধাবাদ নিয়ে যে সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই কথাগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেই যুক্তফ্রন্ট বিপুল ব্যবধানে জিতেছিল। চুয়ান্ন সালে আরেকটি গান বহুলগীত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিজামুল হকের কাছ থেকে প্রাপ্ত[৭২] এই গানটির অংশবিশেষ হলো–

দ্বীনের ভাইরে, শোন রে লীগের কারখানা
দ্বীনের ভাইরে, মোছলেম লীগের কারখানা
দ্বীনের ভাইরে।

সিদ্ধ লীগের মনস্কাম
ঘিয়ের ডাবল তেলের দাম
ছয় আনা প্যাক বিড়ির দাম
লীগ শাসনের দুর্গতি
দুই আনা হয় ম্যাচ বাতি
লীগ শাসকের গুণ কেমন
ছয়শো টাকা নুনের মণ
তেল চিনিতে মিইশ্যা গেলো
আরকি দেখমু কলিকালে
কেয়ামতের নমুনা, দ্বীনের ভাইরে॥'

এই গানে নিত্য ব্যবহার্যের দাম বৃদ্ধি, শিক্ষার অভাব, দুর্ভিক্ষ, ব্যবসাহীনতা, বেকার, সব মিলিয়ে লীগ সরকারের সব ধরণের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ লুতফর রহমানের সুরারোপিত গানের ভূমিকাও ছিল অন্যতম। অতি জনপ্রিয় লোকসংগীত 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে'-এর প্যারোডি গান রচনা করেছিলেন আবদুল করিম। অংশ বিশেষ হলো–

'এই আসমানের নীচেরে জমিন আর জমির মালিক কারা
আর সেই জমিতে ফসল ফলাই আমরা সর্বহারা।
আল্লাহ ভাত দে কাপড় দে বাঁচতে দে রে তুই আল্লাহ ভাত দে॥

এই দেশের দশের খাবার জোগাই আমরা মরি ভাতে
মোদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে ধনি উঠলো জাতে
আল্লাহ ভাত দে কাপড় দে বাঁচতে দে রে তুই আল্লাহ ভাত দে॥'

Dhaka University Institutional Repository

ভোটের গানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গান হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযান 'একুশ দফা' এর বিষয় ভিত্তিক গান। দীর্ঘ এই গানটি সম্মিলিত ভাবে গীত হতো। এরমধ্যে একটি নাটকীয় বিষয় জনগণকে বেশ আনন্দ জোগাতো। এখানে দুইটি চরিত্রের একজন হলো মুসলিম লীগ নেতার স্ত্রীর সাথে দালাল স্বামীর ঝগড়া বা কাইজ্যা। ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ভরা গানটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে আঞ্চলিক ভাষায় গীত হয়েছিল। গানটির লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ২১ দফা নিয়ে সুদীর্ঘ গানটির অংশবিশেষ দেয়া হলো–

'শুনেন সভাজন শোনেন দিয়া মন
একুশ দফার দাবীতে ভাই সামনের নির্বাচন
রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা হতেই হবে ভাই
জমিদারি আর খাজনা আদায় কারীর উচ্ছেদ চাই।'

ফজলুল হক-এর নির্বাচন কার্যে অনেক কবিয়াল ও গায়ক সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম খুলনার শামসুদ্দিন আহমদ ও শিল্পী আবদুল লতিফ। আবদুল লতিফের একটি গান নির্বাচন নিয়ে লেখা হয়েছিল–

'হকের নায়ে চড়বি কেরে আয়
হক হাল ধইরা বইস্যা রইছে
ভাসানী তার বৈঠা বায়।
আতাউর আর মুজিবরে
গুণের রশি টাইন্যা ধরে
দ্যাখ নারে ভাই সোহরাওয়ার্দী
মাস্তুলে তার পাল ওড়ায়
হকের নায়ে চড়বি কেরে আয়।'[৭৩]

১৯৭০ সালে আরেকটি নির্বাচন সারা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিপুল ভোটে বিজয় সত্ত্বেও ক্ষমতা না হস্তান্তরের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় আইয়ুব-ইয়াহিয়া শাসক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ নামক নতুন রাষ্ট্রের জন্মের জন্য এই নির্বাচনের ফলাফল এবং ফলাফল পরবর্তী ঐতিহাসিক ন্যাক্কারজনক ঘটনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুরু হয় স্বাধিকার সংগ্রাম। এ সময় আবদুল লতিফ গান লিখলেন–

'ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই, ও যদু ভাই, ও মধু ভাই–
দুঃখের দইরা হইবা যদি পার,
দেখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাইল ধইরা রইছে নৌকার॥

এগারো দফাতে গড়া নৌকাখানা মনোহরা
মাস্তুলে তার বাদাম উড়ে দেখনারে ভাই ছয় দফার॥

আমরা ক্ষেতে ফসল বুনি বুলবুলিতে খায়
কতকাল আর এই অবিচার কওতো সওয়া যায়?
আমরা থাকি উপবাসী, ওনারা খাইয়া খোদার খাসি,

Dhaka University Institutional Repository

আইছে সুযোগ ভুঁড়িওয়ালার ভুঁড়ি ফাসাইবার॥'

১৯৫৪ নির্বাচনে আরেক অগ্রণী শিল্পী আলতাফ মাহমুদ। কেন্দ্রীয় স্বার্থবাদী চক্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে সারা বরিশাল অঞ্চল দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। নির্বাচনের প্রচারোপযোগী অনেক গান গেয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর পিতা নাজেম আলী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আলতাফ মাহমুদের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সৎ ও যোগ্যতার বিবেচনায় বাবার প্রতিপক্ষ যুক্তফ্রন্টের মহীউদ্দীন আহমদের পক্ষে বরিশালে গান করে মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন। যুবলীগ শিল্পী সংসদের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের গণসংগীত করতেন। তন্মধ্যে তাঁর সুরারোপিত[৭৪]–

'মোরা কি দুখে বাঁচিয়া রবো
মোরা উজিরে নাজিরে বাঁচায়ে রাখিতে
চির উপবাসী রবো।'

'মন্ত্রী হওয়া কি মুখের কথা
যদি না বোঝে জনতার ব্যথা।'

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক অবস্থা সবদিক থেকেই ভয়াল ছিল। একদিকে বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে থমথমে সামরিক শাসনের কোপানলে জাতির মুক্তির লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন। আলতাফ মাহমুদ এসময় একটি সফল গান রচনা করেন–

'এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো
এই বন্যা মোরা রুখবো
মায়েদের বোনেদের শিশুদের অশ্রু মুছবোই।

কত অবহেলায় মোরা কেঁদেছি
কত ভাঙা বীণায় সুর সেধেছি
কত পাষাণ দিয়ে বুক বেঁধেছি
আর তো মোরা শুনবো না
কোনো বাধা মানব না
আমাদের পাওনা হিসাবের খাতাতে তুলবোই॥'

গ্রাম-বাংলায় অসংখ্য কবি-গীতিকার আছেন যাঁরা বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গান রচনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দিয়েই মূলত তাদের আকাঙ্ক্ষার মানুষের জন্যে সাবধানমূলক বাণী প্রচার করেছেন। আবদুল গণি সরকার, কবিয়াল বিজয় সরকার, মোসলেম উদ্দীন বয়াতি, শাহ আবদুল করিম, মহিন শাহ্, সাইদুর রহমান বয়াতি প্রমুখ অন্যতম। সিলেট অঞ্চলের বাউল কবি শাহ আবদুল করিম তিনি বেশ কিছু ভোটের গান লিখেছেন যা প্রকাশিত হয়েছে ভাটির চিঠি গ্রন্থে। অনুমান করা যায় এই গানগুলো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লেখা। অসৎ প্রার্থীদের আসল চরিত্রকে ফাঁস করে দিয়ে তিনি লিখেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

'ভোট দিবায় আজ কারে
ভোট শিকারী দল এসেছে নানা রঙ্গ ধরে
ভোট দিবায় আজ কারে॥

দেশে আইল ভোটাভুটি পরে হবে বাটাবাটি
তারপরে লুটালুটি যে যেভাবে পারে
ভোট দিবায় আজ কারে॥'

অথবা– 'ভোট নেওয়ার সময় আসিলে নেতা সাহেব তখন বলে
এবার আমি পাশ করিলে কাজ করবো গরীবের দায় ।
পরে লাইসেন্স পারমিট দেওয়া ধনীর বাড়ী খাসি খাওয়া
সালাম দেওয়া নৌকা বাওয়া এইমাত্র গরীবে পায়॥'

কালনীর ঢেউ গ্রন্থে সংকলিত আরেকটি গান–

'বলো ভোট দিব আজ কারে?
ভোট দিব যে দেশের সেবক, ভোট দিব না যারে তারে॥

যারা মোদের ভোট নিয়া, ভোটের বলে নেতা হইয়া
গরীবের খুন বিকাইয়া নিজের স্বার্থ করে॥'

ভোট এলেই ভোটের গান লেখা সুর করা গাওয়া হয়ে থাকে । তা কখনো প্রার্থী প্রশংসা কীর্তন করে, প্রার্থীর টাকায় পরিচালিত বিজ্ঞাপনের অংশ হিসাবে, আবার কখনো বিপক্ষ প্রার্থী বা দলের দোষত্রুটি বের করে প্রচার করা হয় । বর্তমান কালের কলুষিত রাজনীতির সাথে সাথে ভোট ও ভোটের গানের সংস্কৃতিও সমাজের দুষ্কৃতিকারীদের হাতের অস্ত্র হয়ে গিয়েছে । কিন্তু একসময় বলতে স্বাধীনতা পূর্বকালের বিভিন্ন ভোটের অনুষ্ঠানে গানই হতো গণমানুষের সচেতনতার মাইল ফলক । বিশেষ করে গ্রামীণ কবিয়ালগণ সমাজের বিচক্ষণ চোখ হিসেবে, আদর্শের রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । তবে ভোটের বেশির ভাগ গান রচিত হতো মঞ্চেই, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্যারোডি বা জনপ্রিয় সুরে গান গাওয়া হতো । এগুলোর লিখিত তথ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় । তাছাড়া অন্যান্য গণসংগীত, দেশাত্ববোধক গান, স্বদেশীগানের অনেক তথ্যই পাওয়া গেছে যে গানগুলো ভোটের মঞ্চে অসংখ্যবার গীত হয়েছে । বিষয় ভিত্তিক বিবেচনায় অন্যান্য অধ্যায়ে গানগুলোর সংযুক্তি থাকায় এখানে উল্লেখ করা হলো না ।

গণসংগীতের মূল্যায়ন ও প্রাসঙ্গিকতায় দুইবাংলার প্রতিবাদী শিল্পীদের মধ্যে কেনো বিরোধিতা ছিল না । নানা সংকটে ভারতীয় শিল্পীরা পূর্ববঙ্গের গান সংগ্রহ করেছেন, এখানকার মানুষেরাও একই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের গান আমদানী করেছেন । ভোটের গান যে গণমুখীনতার স্বতন্ত্র আন্দোলন–যা বাংলার মানুষ গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল । ব্যক্তিগত দলীয় ও সাংগঠনিক তৎপরতায় এসব পরিচালিত হতো । তবে বিশেষ করে কয়েকটি সংগঠন চর্চা, প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় ছিল, তন্মধ্যে 'পূর্ব-পাকিস্তান শিল্পী সংসদ (পূর্ব পকিস্তান যুবলীদের সংগঠন), ধুমকেতু শিল্পী সংঘ (নেজামুল হক পরিচালিত গণনাট্য ও সংগীত স্কোয়াড), প্রান্তিক শিল্পী সংঘ (কলিম শরাফী প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের সংগঠন), অগ্রণী শিল্পী সংঘ (ঢাকা) অন্যতম ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান

আমরা সবাই জানি যে শিল্পভাষা ও শিল্পাঙ্গিক সবসময়ই দুইভাগে বিভক্ত ছিলো । প্রথমত দরবারের উচ্চাঙ্গ-ধ্রুপদী ধারা, আর দ্বিতীয়টি সাধারণ-অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের । গণসংগীত দ্বিতীয় পর্বের মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ধারা । এখানে স্থান পেয়েছে সেই মানুষের কথা যারা জীবনের মূল্যে রক্ষা করে শাসকের মুকুট, আবার সেই শাসকেরই চাবুকে নিষ্পেষিত হয়ে বিনীত প্রার্থনায় নুয়ে থাকে, প্রভু আজ্ঞা করে । তাঁরা কৃষক, শ্রমিক, জেলে, মজুর, তাঁতি অর্থাৎ সকল প্রকার শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষ । শ্রমিকদের অধিকার আদায়, জাগরণ, চেতনায় উদ্দীপিত করার কথা বলা হয়েছে গণসংগীতের প্রতিটি পদক্ষেপে ।

এছাড়া আরেক শ্রেণীর গান এই অধ্যায়ে সংযুক্তির দাবী রাখে, যা সারাসরি শ্রমিকের শ্রম ও বিশ্রামকালের সৃষ্টি । সংগীতের সাথে শ্রমের সম্পর্ক আদিকাল থেকে । পৃথিবীর সব দেশেই কাজের সাথে গানের সৃষ্টি নিত্য ঘটনা । পাশ্চাত্যে যাকে বলে Working song আর আমরা বলি কর্মসংগীত, যার রচনা শৈলী অন্যান্য লোকসংগীতের আদলেই বিন্যস্ত । অর্থাৎ মৌখিকভাবে সৃষ্ট । ক্ষেত্র বিশেষে সুর ও কথার পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাবিহীন জনপদ জীবনের মর্মপোলব্ধি-আবেগ ও প্রাণ সঞ্চারের প্রেরণায় রচিত । তবে রচনার বৈশিষ্ট্য ও প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন বলে অনেকে লোকসংগীত বললেও মূলত কর্মসংগীত বা শ্রমসংগীতই বলা হয় । শ্রমসংগীতের আরেকটি রূপ হলো, শ্রমদানের পর চিত্তবিনোদন বা ক্লান্তি লাঘবের জন্য গাওয়া গান । এই অধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ উন্মুক্ত করা হয়েছে তা শ্রমসংগীত থেকে বৈশিষ্ট্যগত ও উদ্দেশ্যগত বিচারে কিছুটা ভিন্ন । তবে শ্রেণী বিচার এবং উত্তরাধিকার বা আঙ্গিক ধার করার কথা বললে– গণসংগীতের ধারণা শ্রমসংগীতের থেকেই এসেছে । তাই এখানে উক্ত গান সম্পর্কে আলোচনা করা অনিবার্য । শ্রমসংগীত ও শ্রমজীবী সর্বহারার গণসংগীত উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একসাথে মূল্যায়ন করা হলো–

শ্রমসংগীতের সাথে গণসংগীতের স্বাতন্ত্র্য হলো, 'আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী', 'রাজনৈতিক সচেতন সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শ'-এর সার্থকতা । সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর গানে এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে । নিম্নরূপ শ্রমসংগীতের বৈশিষ্ট্যের সূত্রে একটি বিভাজন দেখানো হলো–

সাধারণ কর্মসংগীত

(জাপানের মদশ্রমিকের 'সাকে-সংগীত', রাশিয়ার কয়লা শ্রমিকের, বাংলাদেশের মাঝি, কুমার, গাড়িয়ালের গান): এইগান শ্রম ও কর্মের গুণগান আরোপিত ও সর্বহারা মানুষের জীবনের প্রেম-বিরহ-দুঃখ-স্মৃতির উপর রচিত গান । শ্রমকালীন সময়ের সাথে গভীর ভাবে সংযুক্ত নয় ।

শ্রান্তিগীত

(ভাটিয়ালি, রাখালি, কারাম, ঝুমুর প্রভৃতি): শ্রমের পর শ্রান্তিকালে কিংবা শ্রমকালীন সময়ের কণ্ঠনির্গত শব্দ কায়িক শ্রমের নির্দেশক হয়ে ওঠে । তার উপর ভিত্তি করে বাঁধা হয় গান ।

শ্রমকালীন গান[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

(ছাদ পেটানো, পাইলিং, পাল্কিবাহন ইত্যাদি): শ্রমের সাথে সাথেই যে ধ্বনি উচ্চারণ বা যৌথভাবে গীত হয় । গান গাওয়াটা মূল উদ্দেশ্য নয় বরং কাজের তালে তালে তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্টি হয় । এই প্রকৃয়ায় নানা শব্দ বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা পালন করে তালরক্ষা করে । যেমন ছাদ পেটানের সময় কাঠের দণ্ড, কুপার শব্দ, পাইলিং-এর কাজে চিৎকার 'হেইয়া মারি রে' ইত্যাদি ।

শ্রমজীবীদের অধিকারের গান । (গণসংগীত):

এইগানের সব উপাদান আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার ও জাগরণের নিমিত্তে রচিত । রাজনীতি সচেতন, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যে গান শ্রমিকদের সচেতন করে তোলে এবং অধিকার আদায়ের প্রশ্নে একত্রিত করে ।

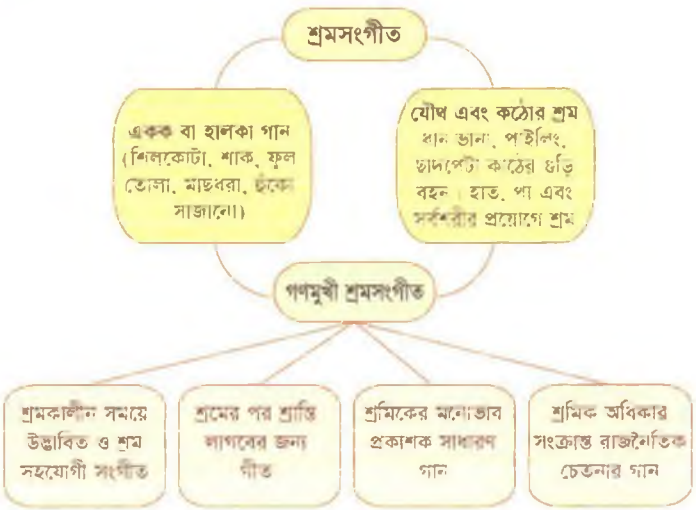

হারাবার যাদের আর কিছুই নেই, যা হারিয়ে ফেলতে পারে, শুধু তারপরও শোষকের আদেশ অমান্য করলে মৃত্যু কিংবা কঠিন শাস্তি । সারাজীবন ধনীক শ্রেণীর গোলামী করেও মেলে না সামান্য খাদ্য । তখন আর তাদের ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প কিছুই থাকে না । শোষকের বিরুদ্ধে শত মৃত্যু-বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ছিনিয়ে আনার জন্য গর্জে ওঠা তাদের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয় । তারাই সর্বহারা । আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেতনায় যারা শোষকের নির্মম অধীনস্থ, তারাই সর্বহারা শ্রেণী । সুকুমার ভট্টাচার্যের লেখা একটি গানে সর্বহারা মৌলিক অধিকারের ভাষা নিখুঁত ভাবে উঠে এসেছে । দিলীপ সেনগুপ্তের সুরে–

'হারাবার কিছু ভয় নেই শুধু শৃঙ্খল হবে হারা
জন কল্লোলে উত্তাল নদী মোহনায় দিশাহারা ॥

তুফানে তুফানে তুলেছে আওয়াজ সইবো না
আজন্ম কাঁধে শোষণের চাকা বইবো না
এবার লড়াই, এবার লড়াইয়ে অস্ত্র শানিয়ে দাঁড়া ॥

অনেক পাঁজর গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে অনেক রক্তের বিনিময়ে
বুঝেছি আমরা বাঁচবো না শুধু মৃত্যুর বোঝা বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে জীবনে বেজেছে আজিকে কোটি করতাল
আমাদের গানে গর্জে সিন্ধু কি উত্তাল ।
কোটি কণ্ঠের মিছিলে আজিকে মিলেছে সর্বহারা ॥'

সাধারণ শ্রমিকের গানে দুঃখ-বেদনা-প্রেম-শোষণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হলেও প্রতিবাদ, অধিকার আদায়, শ্রেণী জাগরণ কিংবা সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠার প্রত্যক্ষ আহবান থাকে না । শোষক ও মালিকপক্ষ সর্বদাই শ্রমিককে ঠকানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবে সংঘহীন করে রাখে । তাই খুব বেশী হলে জীবনের প্রতি ধিক্কার, শ্রমক্ষমতার নিন্দা বা প্রসংশা অথবা জীবনাচারে নেশাগ্রস্থতা,[৭৬] প্রভৃতিতে জড়িয়ে পড়ে । শ্রমজীবীদের জন্য রচিত গণসংগীত তাদের শোষণের বিরুদ্ধে, ন্যায্যমূল্যের পক্ষে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়, বিদ্রোহ বিপ্লবের জোয়ারে সংঘবদ্ধতার পথ খুলে দেয় ।

বাংলায় কৃষক আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকেই দানা বাঁধতে থাকে । ১৮৭১ সালে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়, আর এদেশে শ্রমজীবীদের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর আগে তেমন ভাবে সামনেই আসে নি, কৃষিশ্রমপ্রধান দেশ হবার কারণে । স্বদেশী আমলে শ্রমজীবী বলতে বাংলার কিছু পেশাজীবী উপলক্ষ করে গান রচিত হয় । শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯)একটি গীতির মধ্যদিয়েই প্রকাশিত হয় শ্রমজীবীদের জেগে ওঠার প্রত্যয় । কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষক নির্যাতনের ঘটনা যতটা উল্লিখিত হয়েছে, অন্য পেশীজীবীদের বিষয়টি ইতিহাসে ততটা স্থান পায় নি । বলা যায় বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রমজীবী গণসংগীত–

'উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই
উপস্থিত যুগান্তর
চলমান সব নারী নর
ঘুমাবার বেলা আর নাই ।'

কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রপথিক হিসাবে বিভিন্ন শ্রম ও পেশাজীবীদের উপর অনেকগুলো সফল গান রচনা করে সংগীতাঞ্চলকে সুশ্রাব্য ও সমৃদ্ধ করেন । স্বদেশী আমলে রচিত বলে বিচার করা হলেও গণ-আন্দোলনে গানগুলোর আবেদন কখনোই কমে নি । প্রধানত কাজী নজরুল ইসলামই গণসংগীত প্রবর্তনের মর্যাদা নিয়ে জনতার সামনে এসে উজ্জীবনের সৃষ্টি করেছেন । ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলন । সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীত রচনার দায়ভার পড়ে বিদ্রোহী কবির উপর । তিনি রচনা ও সুর করে নিজেই গেয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন । গানটি হলো–

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল ।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল্ ।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥'

Dhaka University Institutional Repository

গানটির মধ্যে শ্রমিকদের জীবন বাস্তবতা, কয়লাসহ অন্যান্য খনি খোঁড়ার কাজ, কুলি-মুটেদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সার্বজনীন আবেদন রেখেছিল। একই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে তিনি আরেকটি গান লিখেছিলেন। কৃষকদের জাগরণের বাসনা ব্যক্ত করে আহবান–

'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল
আমরা মরতে আছি–ভাল করেই মরব এবার চল॥'

তাঁতীদের নিয়ে তিনি চরকার গান লিখে ১৯২৪ সালে মহাত্মা গান্ধীর হুগলী এক জনসভায় পরিবেশন করেন। এতে তাঁতীদের জাগরণের নামান্তে চরকার ঘূর্ণনেই যেন ঘরে লক্ষ্মী ফিরে আসে, এই চরকাই যেন সুদর্শন চক্র হয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণকে রোধ করতে পারে। সম্প্রদায় গত দিক থেকে তাঁতীদের আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে কখনো সামনে আসে নি। নজরুল তাঁতীদের বিভিন্ন উপমা ও প্রয়োজনের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

'ঘোর–, ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর॥'

ঠিক একইভাবে জেলেদের উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে রচনা করেন–

'আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্ব সভায় উঠল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে
এবার উঠবো রে সব ঠেলে॥'

'অন্তর ন্যাশনাল' গানের মধ্যদিয়ে নজরুল সরাসরি নিজেকে মেলে ধরেছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদের ছায়াতলে। বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগীত ইউজিন পোতিয়ে-এর প্যারী কমিউন অবলম্বনে ভাবানুবাদ করেন সর্বহারাদের উদ্দেশ্যে লেখা এইগান। বলা যায় প্রথম বাংলায় আন্তর্জাতিক সংগীত–

'জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরনী ওরে ঐ আগত॥'

লেখক গানটির নামকরণ করেছিলেন 'অন্তর ন্যাশনাল'। ভারতীয় কমিউনিস্ট রাজনীতির অন্যতম পুরোধা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে তাঁরই পরামর্শক্রমে গানটি সার্থক অনুবাদ করেন। যদিও বর্তমানের ইন্টারন্যাশনাল সংগীত হিসেবে স্বীকৃত মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদটি। সর্বহারা ও শ্রমজীবী মানুষের জেগে উঠার জন্য এইগান সারা বিশ্বেই সমান ভাবে নন্দিত।

'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা

Dhaka University Institutional Repository

অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সারা
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস ।'

কবিয়াল রমেশ শীলের বেশকিছু গানে শ্রমজীবীদের অধিকার আদায়, সচেতনতার আহবান এবং বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে । সর্বহারাদের নিয়ে লেখা–

'সর্বহারার দল, ছুটে আয় সকল
দুশমন হঠাতে হবে ডাক পড়েছে ।
আমাদের খুনেতে যারা তুলেছে বাড়ি মিনার
রক্ত মাংশ চুষে খেয়ে করেছে কঙ্কাল সার...
যা হবার হয়ে গেছে, আর কারে ভয় ডর
আগ্নেয়গিরি সম দিকে দিকে ফেটে পড়
শুন সর্বহারা ভাই, এবার মোদের শেষ লড়াই
দুনিয়াময় গণডঙ্কা বেজে উঠেছে ।'

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে রচিত একটি গানে চা-বাগান, রেল, মিল-কারখানাসহ বিভিন্ন পেশায় জীবিকা ধারণ করা লোকদের কথা এসেছে–

'শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই, ও দেশের ভাই,
পেটের ক্ষুধায় শ্রমিক মরে কে শুনে তার ডাক দোহাই॥...
চা-বাগানে রেলে মিলে শ্রমিক ভাইয়েরা যেমন প্রাণ থাকতে মরা
মড়ার ঘাড়ে পড়ে খাঁড়া ভাতা বোনাস যদি চাই ।'

অথবা– 'হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার ...হুঁশিয়ার ।
বিভেদকারী কাছে আসি বন্ধুর ভাব দেখায়॥'

সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর, শ্রমিক ইউনিয়নে তারা ঘুরে নিরন্তর
শ্রমিকে শ্রমিকে দ্বন্দ্ব লাগাতে চায় অনিবার ।'

মাঝিদের নিয়ে একটি সারি ঢং-এর গান–

'মাঝি চলরে উজান বাইয়া,
বেগে ছুট পিছু না হট সামনের দিকে চাইয়া ।'

মজদুরদের নিয়ে–'উঠেছে শান্তির নিশান, ছুটে আয় মজদুর কিষাণ
বাজে মিলনের বিষাণ, চিন্তা কিরে আর ।'
প্রভৃতি বাংলাদেশের গণসংগীতের সমৃদ্ধ সম্পদ ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা মাঝিদের উদ্দেশ্যে নৌকা বাইচের সুরে রচিত এই গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল–

'লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাও-এর দে

Dhaka University Institutional Repository

ঢেউয়ের তালে তালে করতালি দে–কিরে হৈ হৈ হৈয়া
নয়া দিনের বইলরে বাও নয়া গাঙে॥'

মার্চের সুরে সর্বহারাদের জন্য লেখা–

'সৈনিক, মুক্ত শিবিরে হাঁকে বিউগল
আহবান শোনো ঐ সেনানীর ।'

কবিয়াল গুমানী দেওয়ানের লেখা–

'সঙ্ঘের ভেরী বেজেছে রে ঐ
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর ।'

বাসুদেব দাশগুপ্তের গানটি দুইবাংলার সমাজতান্ত্রিক স্কোয়াডের অতি জনপ্রিয় গান হিসেবে পরিচিত–

'হুঁশিয়ার–
ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাইসব হুঁশিয়ার॥...
রক্তে রক্তে বোনা ফসলের অধিকার
সাথীদের খুনে রাঙা পথে দেখ
হায়নার আনাগোনা ।'

এছাড়া বেশকিছু অনুবাদী গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছে যা বিদেশী গানের শাখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পিট সিগারের জন হেনরী, পোলান্ডের 'ভার্শ্বাভিয়াঙ্কা, মে দিবসের গানসহ নানা ধরণের শ্রমজীবীদের গানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় ।
নিম্নরূপ তার একটি সারণী প্রদান করা হলো–

ক্রম	শিরোনাম	গীতিকার/ অনুবাদক	সুরকার	মন্তব্য
১.	সকল কাজের মিলবে সময় আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস	স্বদেশী গান
২.	আমাদের সমাজনীতি দেখে প্রাণে জাগে ভীতি	রমেশ শীল	রমেশ শীল	সর্বহারা শোষিতের গান
৩.	শুন বন্ধুগণ, দুর্দিনে শ্রমিকের বিবরণ..	রমেশ শীল	রমেশ শীল	শ্রমজীবীদের গান
৪	ভাঙরে ভাঙ যত চোরের বাসা ও গরীব ভাইরে চাষী মজুর..	নিবারণ পণ্ডিত	নিবারণ পণ্ডিত	শ্রমজীবী ও সর্বহারার গান
৫	ও আয়রে ও আয়রে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	শ্রমজীবীদের গান
৬	বিচারপতি তোমার বিচার	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	জনতা বিদ্রোহ
৭	ও ভাই কৃষক ও ভাই শ্রমিক	রাই গোপাল দাম	রাই গোপাল দাম	শ্রমজীবীদের গান
৮	আর কতদিন ঘুমিয়ে রবি	রাই গোপাল দাম	রাই গোপাল দাম	কৃষক জাগরণ
৯	কারখানা কলে মোরা খাটি দলে দলে	পরেশ ধর	পরেশ ধর	শ্রমিক
১০	আমরা কোদাল চালাই পয়দা বাড়াই	সুধাংশু ঘোষ	সুধাংশু ঘোষ	চা-শ্রমিক প্রচলিত ঝুমুর গানের সুর
১১	আজি সপ্ত সাগরে ওঠে উচ্ছলিয়া	সত্যেন সেন	সত্যেন সেন	জেগে ওঠার গান

Dhaka University Institutional Repository

১২	জয় নিপীড়িত মানবের জয়..	মতলুব আলী	শেখ লুতফর রহমান	সর্বহারার গান
১৩	চলছে মিছিল চলবে মিছিল	দিলওয়ার	অজিত রায়	মিছিলের গান
১৪	ও দরদিয়া সাথী বন্ধুরে	বাসুদেব দাসগুপ্ত	বাসুদেব দাসগুপ্ত	সর্বহারার গান
১৫	নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন	কমল সরকার	কমল সরকার	রোবসন স্মরণে
১৬	স্ট্রাইক স্ট্রাইক যেখানেই থাক ময়দানে দেখা হবে	সুভাষ মুখো পাধ্যায়	সুধীন দাশগুপ্ত	হরতাল-ধর্মঘট বিষয়ক
১৭	এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াইয়ে জিততে হবে	দিলীপ সেনগুপ্ত	দিলীপ সেনগুপ্ত	সর্বহারা শোষিতের গান
১৮	বুক বেঁধে লড়তে হবে, ভাঙতে হবে	দিলীপ সেনগুপ্ত	দিলীপ সেনগুপ্ত	মে দিবসের গান
১৯	১৮৮৬ পয়লা মে শিকাগোর হে মার্কেট	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	মে দিবসের গান
২০	এ যুগ পয়লা মে এদেশ	দয়াল কুমার	শংকর মুখোপাধ্যায়	মে দিবসের গান
২১	আজ শুধু ঝড়ের গান	বিমল চন্দ্র ঘোষ	দিলীপ সেনগুপ্ত	মে দিবসের গান
২২	আমরা ফেরি করি পথে, বিড়ি পাকাই	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	বিড়ি শ্রমিকের গান

গানগুলো শ্রমিকের জীবনযাত্রায় অধিকার আদায়ে, ট্রেড ইউনিয়নের সভা-সমিতির প্রাণ ছিল। যদিও শ্রমিকেরা নিজেদের উৎসবে নিজেরাই গান বাঁধেন, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ও কল-কারখানায় সন্ধান চালালে শত শত শ্রমসংগীতের সন্ধান পাওয়া যাবে। সেগুলো 'আনুষ্ঠানিক গীতি' বা 'কর্মসংগীত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সেখান থেকেই যে গণচেতনার বীজ সুপ্তাবস্থা থেকে জাগ্রত হয়।

শ্রমিক শ্রেণীই সর্বহারা। তাদের অধিকারের প্রশ্নেই গণসংগীতের উত্থান। পৃথিবীকে যে মানুষ সভ্য উৎপাদনশীল করে দিয়ে যায়। জন হেনরী কিংবা কায়ুর বন্ধু, টংকের কৃষক নায়ক অথবা নাম না জানা অসংখ্য নির্যাতিত শ্রমিক শ্রেণী। তারাই অবহেলিত সর্বদা। সর্বধর্মে ও আদর্শে শ্রমিক শ্রেণীকে মহান করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টো। তারা জানে না তাদের অধিকার কি ও কতটুকু। প্রভুর লুকিয়ে রাখার প্রধান বিষয় এটাই। গণসংগীতের দ্বারাই শ্রমিক শ্রেণী তাদের ঘুরে দাঁড়াবার প্রাণ পেয়েছে বারবার।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদী গান

বাংলাগানে যত ধরণের ধারা চিহ্নিত করা যায়–তার থেকে গণসংগীতকে আলাদা করা গেছে যে গানগুলোর মাধ্যমে, তা জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতাকে উৎরে গিয়ে বিশ্বদুয়ারের সকল মানুষের মুক্তির চেতনায় নাড়া দিয়েছে বলে। বেশকিছু পরিস্থিতি এই গান সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ ও চিহ্নিত করেছে যেমন সমাজতান্ত্রিক দলের আদর্শ বাস্তবায়ন, সর্বহারাদের একদল, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা কিংবা বর্ণবাদিতার উর্ধ্বে থেকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের দুঃখী মানুষের প্রতি সমান সহমর্মিতা প্রদর্শন, পুঁজিবাদী-সামন্তবাদীদের স্বার্থের যুদ্ধ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে এক হওয়া, যে কোনো কারণে সর্বহারার ডাকে এক মিছিলে শরিক হওয়া, বহির্বিশ্বের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ইত্যাদি। যদিও অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গে এইগানগুলোর কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে– এখানে তার উদাহরণ দেখানো হবে সরাসরি আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ লালিত গান বলে। কারণ রুশ বিপ্লবের পর থেকেই 'গণ' শব্দটি শিল্পের বিভিন্ন শাখায় তৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে–সেই সূত্রের আদর্শে রচিত গান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছে এদেশের মানুষের কাছে। পল রবসনের উদাত্ত প্রতিবাদী গান, হ্যারি বেলাফন্টে, হ্যান্স আইসলার, উদি গাথ্রি, পিট সিগার, বব ডিলানসহ অনেকের গান। আফ্রিকা-আমেরিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, মার্টিন লুথার কিং, ভিক্টর জারা, নেলসন ম্যান্ডেলার উপর রচিত গান নবজোয়ারের সৃষ্টি করেছে এদেশে। তবে ফরাসী বিপ্লবের শ্রমিক কবি ইউজিন পেতিয়ের লেখা 'লা মার্সেই' আন্তর্জাতিক সংগীতের প্রথম উদাহরণ। গণসংগীত নামক ধ্যান-ধারনা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এর পারিভাষিক অনুবাদ করেন কাজী নজরুল ইসলাম।

'জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।'

এ গানটি কবি নিজের মতো করেই সুর দিয়েছিলেন বলে নজরুল সংগীত হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে; যদিও কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের অনুরোধেই তিনি ভাবানুবাদ করেছিলেন গানটি। ১৯৪২ সালে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করেন মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা আন্তর্জাতিক গান হিসেবেও গানটি সর্বজন গৃহীত হয়। অনুবাদটি হলো–

'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়েছে আজ সারা
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ॥'

পিট সিগারের সম্পাদিত 'We shall over come, some day'এর বঙ্গানুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ১৯৬৫ সালের অনুবাদ–

Dhaka University Institutional Repository

'আমরা করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয় ।'

গানটি গণসংগীত আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা আরেকটি গানে আন্তর্জাতিকতাবাদের বিভিন্ন শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ব প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা, মানুষের প্রশান্তির উৎসবে আনবিক বোমার আঘাত (জাপানের হিরোশিমায় আনবিক বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে), ভিয়েতনাম, এশিয়া আফ্রিকা-আমেরিকায় শোষিত বঞ্চিত মানুষের জাগরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।

'সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে
হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল
আমার দু'চোখে ঢেউয়ের দোলা
আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল ।'

এইগানে অনন্য সুরের বৈচিত্র্য ও বাণীর নান্দনিক রূপমাধুর্য পরিস্ফুটিত হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আরো কিছু গান আছে যা, সমাজতন্ত্রের জোয়ারে ধনতন্ত্র–বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ধারণার শিকড় উপড়ে যাওয়ার বর্ণনায়, সিনকিয়ান প্রদেশের উইঘুর প্রজাতির একটি বিখ্যাত লোকসুরের প্রভাবে রচিত–

'আমি যে দেখেছি সেই দেশ
উজ্জ্বল সূর্য রঙিন...
আমি যে দেখেছি শত ফুল বাগিচায়
পুবালি বাতাসে কি সুবাস ছড়ায়
ভ্রমরের গুঞ্জনে শুনেছি প্রচার
বিষাক্ত আগাছা হয়েছে বিলীন ।'

গানটির মধ্যে শত ফুলবাগিচা, পুবালি বাতাস, বিষাক্ত আগাছা, ড্রাগন বাহী, উচান, তাচাই, তাচিং এজাতীয় উপমা সদৃশ্য শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেখানে পুবালী বাতাস হলো পূর্বাঞ্চল যার সুবাসে পশ্চিমা শক্তি পিছু হটে, যা বিষাক্ত আগাছার ন্যায় বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক। চীনের সমাজতান্ত্রিক বিকাশের জয়গান গাইতে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন স্মরণীয় স্থানের নামও উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি প্রতীক-ই বিপ্লব, চেতনা ও নান্দনিকতার সাক্ষ্য বহন করে। এমনি প্রতীকী আরেকটি গান–

'ধীরে বহে ইয়াংসী,
ধীরে ধীরে বহে যাও
কতো রুধির অশ্রুধারা–ঢেউয়ে দোলাও...'

এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত নদী মিসিসিপি, গঙ্গা, নীলনদের ন্যায় ইয়াংসিকেও চরিত্রে দাঁড় করিয়েছেন, যে নদীতে শত্রুপক্ষ ডুবে মরেছে, সেই প্রতীক নিয়েই যেন এই নদীরা বেঁছে আছে। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠায় মহামন্ত্র দিয়ে মুক্তির সমবেত সংগীত হিসেবে মার্চের সুরে রচিত তাঁর আরেকটি গান–

'সৈনিক মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগল

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান শোন ঐ সেনানীর ।
তালে তালে ফেল পা কমরেড
শিরে তব গুরুভার ধরণীর॥

সংকটে সুযোগের ইঙ্গিত
গাও সবে ঐক্যের সংগীত
স্বদেশের স্বাধিকার নহে দূর
সমাপ্তি শাসকের শয়তানি॥

সর্বহারা আজ সেনাদল
শ্রমিকের পাঞ্জায় তলোয়ার
জনগণ সহে আর হীনবল–
দুনিয়ার খুনিদল হুঁশিয়ার
মুক্তির ফৌজ চলে টলমল॥'

গানটিতে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সাবধান করে দিয়ে সর্বহারাদের যুদ্ধপ্রস্তুতির আহবান দৃপ্ত প্রত্যয়ে ধ্বনিত হয়েছে ।

পল রোবসন বিশ্ব-সংগীতের অন্যতম প্রবক্তা কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি-আন্দোলনের মহানায়ক প্রচণ্ড দারিদ্র্য, শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা ও বর্ণবৈষম্যবাদী প্রতিকুল ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে বড়ো হন । তিনি নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে যোগ্য চাকুরি পেয়ে সেখানে যখন তারই অধস্তন শ্বেতাঙ্গের কাছে অপদস্ত হন । তখনই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন রাজনীতি, সংগীত এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠা । বিশ্বের সেরা রাজনীতিবিদদের সাথে এরপর সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং গণমুখী গান লিখে গেয়ে সারা বিশ্বে কৃষ্ণাঙ্গদের চোখের মণিতে আসীন হন । তাঁর বক্তব্য ছিল–'যতকাল কৃষ্ণকায় ভ্রাতা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে ততকাল সাদা চামড়ার মানুষের মুক্তিও অসম্ভব', তাঁর জনপ্রিয় গান ছিল 'Jhon Henry told his Captain' মে দিবসের গান বলে খ্যাত । পরবর্তীকারে হেমাঙ্গ বিশ্বাস 'নাম তার ছিল জন হেনরি' রূপান্তরিত করেন এবং নিগ্রো স্পিরিচুয়াল নামে বিখ্যাত একটি গান 'Old man River' জনপ্রিয়তার চূড়ায় নিয়ে যায় । দ্বিতীয় গানটিকে বাংলা গানের অন্যতম দিকপাল ভূপেন হাজারিকা 'বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নিরবে ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন ।' ভাবানুবাদ করে অনেক খ্যাতি পান । বিশ্বে আলোচিত এই মহানায়ক কে নিয়ে সারাবিশ্বের মানুষেরই আগ্রহের কমতি নেই । তাঁর আদর্শকে স্মরণ করে বিশ্ববিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের লেখা এবং বাংলা ভাষায় কমল সরকারের অনুবাদ করা গানটি অধিক মর্যাদায় সমুন্নত করে–

'ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না
নিগ্রো ভাই আমার–পল রোবসন
আমরা আমাদের গান গাই–ওরা চায় না॥

ওরা ভয় পেয়েছে রোবসন
আমাদের কুচকাওয়াজে ভয় পেয়েছে
আমাদের রক্ত চোখকে ভয় পেয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

হিম্মতের শক্তিতে ভয় পেয়েছে– রোবসন
ওরা বিপ্লবের ডম্বরুতে ভয় পেয়েছে– রোবসন॥'

ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে তাদের হাওয়া বদল করেছে। এতে দল ভেঙেছে কিন্তু আদর্শ ও দর্শনগত মূল্যবোধ এবং তুলমামূলক অবস্থান পরিষ্কার হয়েছে। চীন বিপ্লবের সাথে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন যেমন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের চীন প্রীতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, একই ভাবে বাংলার কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লবের সাফল্যে প্রণয়ন করেন–

'নিশি অবসান জাগরে তোরা
ভোরের বাতাস যায়রে বয়ে
রঙিন আলোয় আকাশ ভরা।'

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও রাষ্ট্রের দুই পুরোধা কমরেড লেনিন এবং কমরেড মাওসেতুঙকে নিয়ে রচিত হয়েছে বেশকিছু গান। কমরেড লেনিনকে নিয়ে সমরেশ বন্দোপাধ্যায়ের সুরে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত –

'লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে
যেন তাদের বুক জুড়ে আজ লেনিন।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত–

'দেশশুদ্ধ লোক যতদিন খেতে পায়নি কমলা লেবু
খাননি লেনিন...
আমার কাছে ছেলে বেলার
সেই গল্পই চির সত্য!
পৃথিবী আর কমলা লেবু
এক আকারে লেনিনের নাম
মৃত্যুঞ্জয় মনুষত্ব।'

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সুরে দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা–

'লেনিনের ডাক শুনি, পৃথিবীতে লেনিনের ডাক
সর্বহারা যারা বঞ্চিত শোষিত,
পেয়েছো রক্তের আহ্বান।' ইত্যাদি গান ছিল গণসংগীত আসরের প্রাণ।

চীনের সমাজতন্ত্রের মহামানব মাওসেতুঙ-এর উদ্দেশ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ১৯৭৬ সালে রচিত গান–

'আরো বসন্ত বহু বসন্ত
তোমার নামে আসুক'

এছাড়া 'এই সমাধিতলে
কত প্রাণ প্রদীপ জ্বলে।'

Dhaka University Institutional Repository

'আমি যাই শাওশান' ইত্যাদি রচনা করেন ।

চিলির মহান ত্যাগী নায়ক শহীদ ভিক্টর জারার হাত কেটে নেয়া হয়েছিল[৭৭] । কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি থেকেও জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন 'যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ গান' । জারার স্মরণে নিবেদিত সাধন দাশগুপ্তের লেখা একটি গান–

'শহীদ মিনারে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি
পৃথিবীর পশ্চিমে অনেক দূরে
প্রশান্ত সাগরে অশান্ত ঢেউগুলো
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস ওঠে পড়ে ।' একজন বিশ্বমানবের প্রকৃতি চিহ্নিত করে ।

একই কবির লেখা আরো একটি গান কিউবার বিপ্লবী নায়ক চে গুয়েভারাকে আদর্শ মেনে নিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রকে একটি আসনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে–

'আমাদের প্রশ্ন যদি করতে আসে কেউবা
কোন মাটিতে জন্ম নিলাম কোথায় মোদের দেশ
আমরা বলি দিল্লী, হ্যানয়, আফ্রিকা কি কিউবা,
সাদা কালো পীত লোহিতের একটি মহাদেশ ।
ভালবাসার একটি ভাষায় হলাম অনিঃশ্বেষ ।
(কোরাস) আমাদের যৌবন দুরন্ত সৈনিক,
কোটি হাতে ঘেরি পৃথিবীরে দৈনিক,
আমাদের মাটিতে শান্তির পাহারা
আমাদেরি এক নাম চে-গেভারা॥'

এভাবে অসংখ্য গান লেখা হয়েছে বাংলায় । এবং বিশ্বের সেরা গণসংগীতগুলো অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে রেখেছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ।

১৮৮৬ সালে ১লা মে শিকাগোর একটি মার্কেটে মালিকপক্ষের অন্যায্য শ্রমমূল্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ করায় সেদিন মালিকের হাতে শ্রমিক খুন হয় । এই মৃত্যু জাগিয়ে দেয় সারা বিশ্বের শ্রমিক জনতাকে । তাদের অধিকারের প্রতীক হিসেবে এই দিন পালিত হয় মহান মে দিবস নামে । মে দিবস উপলক্ষে রচিত কয়েকটি গান নিম্নরূপ–

ক্রম	শিরোনাম	গীতিকার	সুরকার	মন্তব্য
১	১৮৮৬'র ১লা মে, শিকাগোর হে মার্কেট মজুরের তাজা খুনে ভেসে গেল খোলা রাজপথ..	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	মে দিবসের গান
২	বুক বেঁধে লড়তে হবে/ভাঙতে হবে দুঃখ শিকল/ শোষণের যন্ত্রখানা/আঘাত হেনে করবো বিকল ।	দিলীপ সেনগুপ্ত	দিলীপ সেনগুপ্ত	ঐ
৩	এ যুগ পয়লা মে এদেশ	দয়াল কুমার	শংকর মুখোপাধ্যায়	ঐ
৪	আজ শুধু ঝড়ের গান	বিমল চন্দ্র ঘোষ	দিলীপ সেনগুপ্ত	ঐ
৫	মে-দিন এদেশে প্রতিটি দিনই তো মে দিন	বিপুল চক্রবর্তী	বিপুল চক্রবর্তী	ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ১৯৫২ ভাষা-আন্দোলনের পর এদেশের মানুষ আন্তর্জাতিক চেতনা কিংবা সমাজতান্ত্রিক চেতনার অপেক্ষা মূল অধিকার ও আন্দোলনের বিষয় ছিল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন। তবে ষাটের দশক থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ নিয়ে রচিত হয়েছে বেশ কিছু গান। যেমন ১৯৬৯ সালে সাধন ঘোষের কথা ও সুরে একটি গান ছাড়া যেন গণসংগীত আসরের প্রাণই পায় না। বাংলার স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে এবং সর্বহারাদের উদাত্ত আহ্বান নিয়ে এই সংগীত মার্চের সুরে গাওয়া হয়–

'বাংলার কমরেড বন্ধু
এইবার তুলে নাও হাতিয়ার
ভূমিহীন কৃষক আর মজদুর
গণযুদ্ধের ডাক এসেছে
কমরেড কমরেড কমরেড।'

সিকান্দার আবু জাফরের লেখা এবং শেখ লুতফর রহমানের সুরে–

'জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।'

নামিবিয়ার স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে মোহাম্মদ মনিরুজ্জমানের লেখা–

'শৃঙ্খল ভেঙে ঐ আসলো স্বাধীন
নামিবিয়া নামিবিয়া।'

আফ্রিকার মুক্তির জনক নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে সেজান মাহমুদের লেখা–

'কালো কালো মানুষের দেশে
ঐ কালো মাটিতে
রক্তে স্রোতের শামিল
নেলসন ম্যান্ডেলা তুমি
অমর কবিতার অন্ত্যমিল।' বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের আগে ও পরে কবি আবুবকর সিদ্দিকের রচিত বেশকিছু গান বাংলাদেশের গণসংগীতের আন্দোলনকে যথেষ্ট বেগবান করেছিল। এরমধ্যে আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শের গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

'বিপ্লবেরই রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে
সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে॥'

অথবা– 'ভাসানীর ভাষা ভেসে আসে ঐ মিছিলের গর্জনে
কিষাণ কামার এই বাংলার মেহনতী লাখো জনে॥

শুধু কি বাংলার সারা দুনিয়ার,
আফ্রো এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার
মজলুম যত শোষিত জনের তুমি সাথী জাগরণে॥'

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা 'মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা, চায় কিহে রক্ত হে ।' উচ্চতম আসনে বসিয়েছে ।

ভিয়েতনামের সাথে মার্কিনীদের যুদ্ধ ছিল একপক্ষীয় । সারা পৃথিবীর মানুষ এক হয়েছিল মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে । ধীরে ধীরে ভিয়েতনামের গেরিলারা মার্কিনীদের পর্যুদস্ত করে । বাংলাদেশের মানুষকেও এই যুদ্ধ প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল । নাজিম মাহমুদের লেখা বেশকিছু গান খুলনার সন্দীপন[৭৮] বিভিন্ন মঞ্চে পরিবেশন করে থাকেন । উল্লেখযোগ্য একটি গান–

'দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম
মুক্তি পাগল রক্তস্নাত ভিয়েতনাম ।'

এদেশের লোককবিগণ গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের দিকেই ঝোঁকটা সর্বক্ষণ বেশি । কিন্তু এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, ফণী বড়ুয়া প্রমুখ । কবিয়াল ফণী বড়ুয়ার গানে যেমন দেখা যায় সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য আহ্বান–'সমাজতন্ত্রের জয় ডংকা', 'আমি বেঁচে আছি সর্বহারা হইয়া', 'ধনের কোনো সংজ্ঞা নাই/ শ্রমই হলো মুলধন ।' ইত্যাদি গান কবিয়ালগণ গ্রামের আসরে সাবলীল ভাবে গেয়ে বেড়িয়েছেন ।

উল্লেখ্য ফ্যাসিজমের আগ্রাসন ও বিশ্বযুদ্ধের উপর রচিত অনেক গানই এই অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্তির দাবি রাখে । কিন্তু গণসংগীত আন্দোলনে এই বিষয়ক গানগুলো এতই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছিল যে, আলাদা বিভাগেই তা উপস্থাপন করা হয়েছে বলে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

ট্যাক্সের গান

সামন্ত সমাজে শোষণের অন্যতম হাতিয়ার ছিলো খাজনা। সাধারণ প্রথানুযায়ী খাজনা সরকার পরিচালনার নিমিত্তে প্রজা সাধারণের আমানত হিসাবে গচ্ছিত ধন, যা জনগণের কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়। প্রজাগণ রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সু-শাসনের অভিপ্রায়ে সরকারকে তাদের উৎপাদন ও সম্পত্তির অংশবিশেষ খাজনা বা ট্যাক্স হিসেবে দিয়ে থাকে। কিন্তু শোষক সরকারের কাছে খাজনা প্রজা শোষণের দ্বারা রাজন্যবর্গের বিলাসিতার কারণ হয়ে যায়। রাজার ইচ্ছাধীন আইন-প্রজাগণ তার ভুক্তভোগী এটাই ইতিহাসের নির্মম দলিল। খাজনার নামে লুণ্ঠনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ব্রিটিশ আমলে তো অবশ্যই, বর্তমানকাল পর্যন্ত শোষিতের বিরুদ্ধে শোষকের এটা এক সূক্ষ্ম-সরলীকরণ পথ। কর বা খাজনার নামে লুণ্ঠন করে নিরীহ মানুষের ন্যায্য অধিকার। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গণসংগীতের ভাণ্ডারে খুববেশি গান জমা পড়েছে–তা নয়, কিন্তু লুণ্ঠন-অরাজকতা-কন্ট্রোল ব্যবস্থার নামে চুরি, দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া দামে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল মানুষ। সেই ক্ষোভ অনেক গানের মধ্যেই পাওয়া যায়। ব্রিটিশদের খাজনা নামে জমিদারদের ফসলের দ্বিভাগা, টাকা ঋণ দিয়ে বিনিময়ে ধান নেয়ার মাধ্যমে ঠকানো, লবন, সুপারী, পান, তেল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যবস্তুর উপর হাস্যকর 'কর' আরোপ করা দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে পথে নামিয়ে দিতে উদ্যত করে।

ট্যাকসের গান বলতে এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স বা খাজনার প্রচলন নিয়ে গান বোঝায়। প্রথাভিত্তিক, ফসলী জমির উপর ঋণশোধ, কন্ট্রোল ব্যবস্থা, বাসস্থান, নিত্যদ্রব্যের উপর যেভাবে কর আরোপ প্রভৃতি। নিম্নরূপ উল্লিখিত গানের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বিষয়ের বর্ণনা উঠে এসেছে। গণসংগীতের চারণ সম্রাট কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিতের গানে ফুটে উঠেছে সেই বাস্তব দুর্দশার চিত্র। বাংলায় হাজংদের বিদ্রোহকে স্তব্ধ করার জন্য জমিদারেরা যে অত্যাচার করে, সেখানে তামাক, লবন, পানি, সুপারি, চাউল প্রভৃতির উপর ট্যাক্স আরোপ করে; তার বর্ণনা এসেছে এভাবে যে–

'মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই
সারা বছর খাট্যা মরি পেটের ক্ষুধায় ভাই
ধনিক বণিক জমিদার আর বিদেশী সরকার
চারভূতে লুইট্যা খাইল মোদের সোনার সংসার। ...
করজা বাবদ ঋণের বাবদ মহাজনের ঘরে
লোটাবাটি গরু বাছুর লেইখ্যা নিল পরে
তামাক, লবণ, জলে ট্যাক্স দিয়া হইলাম খুন
তারপরে সুপারি গাছে লাগলরে আগুন।'

ট্যাক্স যে দুর্নীতির অন্যতম হাতিয়ার, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান শাসনকালে নানা পর্যায়ে দব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে, শুল্ক আরোপ, রেশন বা কন্ট্রোল ব্যবস্থার নামে সুবিধাবাদীদের চুরি-লুটপাট প্রভৃতি ঘটনা ঘটে। এবিষয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দ্রব্যের উর্ধ্বগতি খুবই দুর্বিপাকে ফেলেছিল। জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারের খাদ্যশস্য সৈনিকদের জন্য পুঞ্জিভূত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। এতে জনসাধারণ এক পর্যায়ে প্রবল ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসে ওঠে। চালু হয় কন্ট্রোল ব্যবস্থা। এ

Dhaka University Institutional Repository

তো আরেক প্রহসন। গরীবেরা সামান্য কিছুও পায় না, ধনি-সুবিধাবাদীরা নিয়ে যায় বেশি বেশি। নিবারণ পণ্ডিত এই পরিস্থিতির উপর লিখলেন–

'মিলে মজুর চাষী মধ্যবিত্ত
আনে তবে বাঁচার অধিকার...
কুটির শিল্পী জেলে তাঁতি
যদি তার পায় মাল যন্ত্রপাতি
পন্থা হবে তাদের বাঁচিবার
কমলে ট্যাক্সের উপর ট্যাক্সের বোঝা রে
ওরে আমার দেশবাসী ভাই
যত লক্ষ্মীছাড়া কপাল পোড়া
ছোট ছোট দোকানদার॥'

ট্যাক্সের অর্থ যখন জনগণের কল্যাণে সঠিক ভাবে বণ্টন না হয়ে সরকারের সুবিধাভোগী রাজন্যবর্গের বিলাসিতার উপকরণ হয়। তখনি ঘাটতি পড়ে, আবার নতুন করে বেশি ট্যাক্স আরোপের প্রয়োজন দেখা দেয়। জনগণের উপর তখন চাপ পড়ায় নিত্য দ্রব্যের মূল্য বাড়তে থাকে। অর্থনীতির এই ব্যবস্থার সাথে যাবতীয় ভালোমন্দ বিষয় জড়িত। উপরোক্ত গানে তারই সুক্ষ্ম অবলোকন ধরা পড়েছে।

১৯৪৬ সালে টংক বিদ্রোহ হয়। মূলত কৃষক বিদ্রোহ। তবে ট্যাক্স বা করের আলামতই এরমধ্যে প্রত্যক্ষ ছিল। টংক প্রথার নিয়ম ছিল টাকা না দিয়ে ধানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ বা খাজনা প্রদান। এর পরিমাণ প্রতি একরে ৩ থেকে ১২ মণ পর্যন্ত ধান দিতে হতো। কোনো উর্বরা ফসলী মাঠে প্রতি বিঘায় ৩ থেকে ৭ মণ পর্যন্ত ধান ঋণ দাতাকে পরিশোধ করতে হতো। সেরের ওজন যেখানে ৮০ তোলা, (কখনো ৯০ তোলা) অথচ জমিদাররা ১০০ তোলায় ১ সের ধরে ধান নিয়ে নিতো। জমিদার বাড়ীতে এই কারচুপি হতো হরহামেশা সরলপ্রাণ কৃষকদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে। একদিন যখন এই কারচুপি ধরতে পারে তখন তারা কমরেড মণি সিং-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিবারণ পণ্ডিতের এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত গান–

'শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরীব চাষী শুনেন সর্বজন
নব্বই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ' তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষি হে ছাড়ে না পেয়াদায়॥ ...
ললিত হান্নানের মতো কর্মী এল শত শত ফৌজি দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হে হইল চুরমার।'

টংক প্রথার মতো বড়ো ঘটনার কারণ মূলত ব্রিটিশদের দালাল জমিদারদের সৃষ্ট শোষণমূলক হীন চরিতার্থ পরিকল্পনা। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে অনেক আগে থেকেই কঠোর ও হিংস্র ছিল। যেমন ১৯৪৪ সালে করিমগঞ্জের চাপঘাটের সুপারির উপর ট্যাক্স আরোপ করে ব্রিটিশ সরকার। বৃহত্তর সিলেটের মানুষের জীবনে পান-সুপারী অত্যাবশকীয় আপ্যায়নের বস্তু। সুপারির উপর উচ্চমূল্যে ট্যাক্স আরোপের ফলে মূল্য হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া। মুনাফাখোর মজুদদারের খপ্পরে পড়ে খোলা বাজারে

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে গেল দুষ্প্রাপ্য । দেশবাসী ক্ষোভে দুঃখে ফুসে উঠলো । গণমানুষের হতাশা-ক্ষোভের অবস্থাকে উপলব্ধি করে সিলেটি আঞ্চলিক ভাষায় কবি আবদুল গফ্ফার দত্তচৌধুরী তীব্র রম্য ও শ্লেষাত্মক গান রচনা করেন । পরবর্তীকালে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও খালেদ চৌধুরীর কণ্ঠে গীত হয়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল । গানটি হলো–

'ও এগো সজনী, গুয়াগাছে টেক্সো লাগিলনি,
বাটার উপর পইল ঠাটা, গাল ভরি পান খায়তায়নি ।...

তামাক পাতায় টেক্সো ধরে পুকা মাকড় ভাগে ডরে,
(এগো) ধানের গোলা খাইয়া, গালের পানো আত (হাত) দিলনি॥

বাতাসেতে টেক্সো বইলো দমের হিসাব গণে লইলো
(এবার) টাট্টি গেলে টেক্সো লাগে পেসাবের হিসাব রাখনি॥

টেক্সো দিও বিয়া বইলে, টেক্সো দিও পুয়া অইলে
(এগো) মইলে এবার টেক্সো দিয়া চিতার আগুন জ্বালাইবায় নি॥

তারার টেক্সির তেল জুগাইয়া, আমরা মরি টেক্সো বইয়া
(এগো) ভূতের বেগার খাটিয়া মইলাম, মইলে ভূত হইমুনি॥'

এই গানটি সিলেটের আঞ্চলিক সুর 'ধামাইল'-এ শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী ও শিল্পী খালেদ চৌধুরী প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অধিবেশনে মহম্মদ আলী পার্কে যৌথভাবে প্রথম পরিবেশন করেন ।[৭৯] হেমাঙ্গ বিশ্বাস সিলেটি ভাষায় অনেক গান লিখেছেন এবং এইগানটি প্রচুর মঞ্চপরিবেশন করেছেন বলে অনেকে মনে করতো গানটি তার নিজের লেখা । কবি দত্তের আরো কিছুগান দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি নিয়ে রচিত । লবন, শাড়ি, পানে উপর্যুপরি ট্যাক্স আরোপের ফলে ঊর্ধ্বগতি ও আকাল সম্পর্কে গান ও কবিতা শিল্পীর মুখ্য প্রসঙ্গ ছিল । যেমন–

'বল ওগো সজনী, পয়সা দিলে নুন মিলেনি?
দেট টেকা নুনের সের, আর আমের চাটনি খায়তায়নি?
মরি শহুরে লোকে চিনি চাইলে
দেয় না চিনি নুন না লইলে
নুনের খনি লুকাইল কোথায় বুঝতে কিছু পায়লায়নি?'

লবন নিয়ে হবিগঞ্জের মোক্তার রোহিনী রায়ের লেখা একটি গান হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গোষ্ঠ বিহারী দাসচৌধুরী মিছিলে মিছিলে গাইতেন । গানটির কথা হলো–

'গান্ধী সজ্জিত বিরাট বাহিনী
নির্ভয়ে চলিছে বাধ নাহি মানি...
লবন শুল্ক করগো ভঙ্গ
ছেড়ে দাও আমোদ, ছেড়ে দাও রঙ্গ ।'

লবনের কৃত্রিম আকাল সে সময়ে এমন প্রবল হয়েছিল যে কাঁথি ও নোয়াখালীর সমুদ্র তীরে আইন ভঙ্গ করে লবন তৈরির উদ্যোগ নেয় হয় । এবং বিধুভূষণ চৌধুরীর নেতৃত্বে সিলেটে অনবদ্য মিছিল হ'তে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে সেই মিছিলেই উপরোক্ত গান গীত হয়ে লোক মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। নারী পুরুষ সমানে এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী–

"মিছিলের দৃশ্য ক্রমশ বদলে যেতে লাগলো। এই প্রথম গৃহবধূরা মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে মিছিলে যোগ দিলেন। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা/ এ ভারত আর জাগে না জাগে না'– ললনাদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল রাস্তার পাশের দর্শকদের উৎসুক্যও ততই বাড়তে লাগল। কে কোন বাড়ীর বউ তা নিয়ে একটা গবেষণা চলত, কেন না ঘোমটা দেওয়ার ফলে কারুর মুখ দেখা যেত না। আন্দোলনের হওয়া বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঘোমটাও ক্রমশ উপরে উঠতে লাগল; মুখগুলি স্পষ্টত দেখা গেল।"[৮০]

১৯৬৪ সালে সিলেটে শরিষার তেলের আকাল পড়ে, সে উদ্দেশ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনা করেন একটি গান। সিলেটি ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক গানটি ক্রিপস মিশন[৮১] কে নিয়ে লেখা -

'আজব দেশের আজব লীলা আজব খেলা
কোনো যুগে শুনছনি (সজনি)
হৈরর তেল কোন দেশে গেল খবর জাননি।'

মারফতি সুরের গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এখনো গণসংগীতের আসরে গানটির আবেদন কম নয়।

ট্যাক্স নিয়ে প্রহসন সবকালেই কম বেশি ছিল, তার উদাহরণ স্বদেশী গানের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। গোবিন্দ চন্দ্র দাসের (১৮৫৫-১৯১৮) গানে দেখা যায়– ট্যাক্সের প্রহসনের কথা ।

'স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়;...
একশ' রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয়?'

বর্তমানকালে ট্যাক্সের প্রহসন রীতি বদলেছে। মানুষ আজ জানে না অনেক ক্ষেত্রেই তাকে দিতে হয় অমার্জনীয় খাজনা, এর বাইরে অবৈধ ঘুষ–সুদ, চাঁদাবাজি, বকশিস নামে নানা ধরণের ট্যাক্স। কিন্তু মানুষ সয়ে নিয়েছে জীবনের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এ জাতীয় প্রহসন। ট্যাক্সের সঠিক ব্যবহার হলে যেমন মানুষের কল্যাণ হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দোসর বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তা কখনোই হয় না। ফলে মানুষের ভাগ্যের চাকাও বদলায় না।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র সংগীত আন্দোলন

বিংশ শতকে বাংলা সংগীতের রেনেসায় নানামুখী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্র সংগীত অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছে। গণসংগীতের সৃষ্টিলগ্নে রবীন্দ্রসংগীতকে মুষ্টিমেয় লোকের গান বা শ্রেণী-জাগরণে উপাদেয় নয়–এমন উপেক্ষাসুলভ বক্তব্য কোনো কোনো পক্ষ থেকে আসলেও, অবশেষে এই গানই প্রাণ-প্রাচুর্য এনে দিয়েছে জাতির জাগরণের নানা পদক্ষেপে। গণসংগীত যে ধারণায় বিকশিত সেই মতাদর্শ রবীন্দ্র সংগীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে স্বদেশী গানের উত্তরাধিকার হিসেবে রবীন্দ্রসংগীতের প্রভাবও এড়াতে পারে নি বরং কিছু গান গণসংগীতের আসরকে আলোকিত করেছে। যে যে গান গণসংগীতের আসরে বেশি বেশি গাওয়া হয়েছে তন্মধ্যে–'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি তোমার কোলে ঠেকাই মাথা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার ফুল বাংলার ফল', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' ইত্যাদি। এ তো হলো রবীন্দ্রনাথের গানের শক্তির অবস্থান। তাঁর গান ও আদর্শ পরবর্তীকালের বিভিন্ন আন্দোলনের পথকে একজন প্রবর্তকের ন্যায় পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার-অস্বীকারে এবং বিতর্কের সূত্রধরেই সমাজের প্রগতিশীলতার অবস্থান নির্ণয় করা যায়।

১৯৬১ সালে স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী আয়োজনে বিভিন্ন সংগঠন উদ্যোগ। কিন্তু কট্টর পাকিস্তানপন্থীরা রবীন্দ্র বিরোধিতা শুরু করলে আয়োজনের উদ্যোগ অন্যদিকে মোড় নেয়। অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে বিজাতীয় বলে চিহ্নিত করে সরকারিভাবে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন বানচালের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এতে সংস্কৃতি সেবীদের বিরাট অপমানের কারণ হয়ে ওঠে। দুইটি ভিন্নজাতিকে মুসলমান হিসেবে একখণ্ড জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস এসময় আরো ঘোরতর আন্দোলনের সূচনা করে। সরকারের সপক্ষীয় পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন, মুসলিম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবজ্ঞার ছলে তাঁরা বলেন–

"সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথের দোহাই তুলিয়া অখণ্ড বাংলার আড়ালে আমাদের তামুদ্দুনিক জীবনের বিপদ ডাকিয়া আনার সুযোগ দেওয়া চলিবে না। একদল লোক পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের অন্ধ-অনুসারী ও ভক্ত। তাদের রবীন্দ্রভক্তি বিপদের কারণ হইতে পারে এবং বাইরের যারা পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করে নাই, তারা এই সুযোগে তামুদ্দুনিক অনুপ্রবেশের খেলায় নামিতে পারে।"[৮২]

তৎকালীন দৈনিক আজাদে প্রকাশিত আরো মন্তব্য দেখে অনুমান করা যায়, সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাংলা সংস্কৃতি তথা রবীন্দ্রসংগীতকে কতটা বয়কট করার চেষ্টা করেছিল। দৈনিক আজাদের প্রায় একমাস ব্যাপী ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র বিরোধী প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। ১২ বৈশাখের 'রবীন্দ্র ও পূর্ব-পাকিস্তান' সম্পাদকীয়তে বলা হয়, রবীন্দ্রবার্ষিকীর অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে 'কোহেনেদার' ডাকের সমতুল্য এবং এটাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু।' ১৩ বৈশাখ ১৩৬৮ সালে আহমদ পারভেজের লেখা 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী প্রসঙ্গ' নামক সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয় "রবীন্দ্র সাহিত্যে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জীবন উপেক্ষিত। 'শিবাজী উৎসব', 'ভারত তীর্থের' মতো কবিতায় উপেক্ষাই নয়, মুসলমানদের প্রতি রীতিমত ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"[৮৩] এই মাসে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ছাব্বিশটির অধিক প্রবন্ধ ছাপা হয় যার মূল বিষয় ছিল এমন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অসহিষ্ণু ছিলেন বিধায় তাঁর অনুসরণ পাকিস্তানের ক্ষতি ছাড়া কিছুই দিতে পারে না।

এই লেখকদের সম্মিলনে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর আগের দিন অর্থাৎ চব্বিশে বৈশাখ ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন ফজলুল হক সেলবর্ষী, কবি খান মঈনুদ্দিন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, গোলাম আযম, মাওলানা মহিউদ্দিন ও হাফেজ হাবিবুর রহমান। "তারা রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিরোধী, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর সাধক ও প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শানুসারী বলে অভিহিত করে সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। (৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ১ম টি হলো) পাকিস্তানে ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভারত ও রামরাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশব্যাপী যে সাংস্কৃতিক অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।"[৮৪]

রবীন্দ্র বিরোধিতাকারীদের এসব কথাবার্তা ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সংগীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। তিনদিন ব্যাপী সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতিক প্রত্যয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। গণমানুষের সাংস্কৃতিক অধিকারের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ সামনে চলে আসে। শতবার্ষিকীর সাফল্যকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য এবং নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার প্রত্যয়ে জয়দেবপুরের এক বিকেলে 'ছায়ানট' গঠিত হয়। সভাপতি হিসেবে বেগম সুফিয়া কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কামাল লোহানী[৮৫]। ১৯৬৩ সালে ছায়ানট একটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে।

১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তানে যুদ্ধের সূত্রধরে পাকিস্তান রেডিও রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার বন্ধ করে দেয়। অবশ্য ৪ঠা মে থেকে আবার প্রচার শুরু করে। ১৯৬৬ সালে ৯ই মে বুলবুল ললিতকলা একাডেমী রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী পালন করে। ১৯৬৭ সালে পিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বাজেটে রবীন্দ্র বিতর্ক ও পূর্ববঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা হয়। ক্রমে ক্রমে সেটা সংস্কৃতি সেবীদের মধ্যে গুরুতর বিতর্কের সূচনা করে। সরকারি দলের নেতা আবদুস সবুর খান (১৯১০-১৯৮৪) বলেন যে, 'ইদানিং পূর্ব-বাংলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অশুভ তৎপরতা তিনি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছেন।' এবং ২৩শে জুন পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, বেতার ও টেলিভিশন থেকে পাকিস্তান বিরোধী রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের অন্য গানের প্রচারও হ্রাস করা হবে।[৮৬]

রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিবৃতির পক্ষে সেদিন অনেক বুদ্ধিজীবীই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের দোহাই তুলে এক বিবৃতিতে পাঁচজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দ্বিতীয়টিতে ৪০ জন সংস্কৃতিসেবী, এভাবে ৩০ জন মাওলানা, ও ৪৫ জন সংগীত শিল্পী পক্ষাবলম্বনের সমর্থন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ,

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইবরাহিম খাঁ, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ, ড. হাসান জামান, মুজিবুর রহমান খাঁ প্রমুখ [আজাদ জুন ৩০, ১৯৬৭] । মওলানাদের বিবৃতির ভাষা ছিল এমন–

"পাকিস্তান এছলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট কর্মসূচী লইয়া দুনিয়ার বুকে জন্মলাভ করিয়াছে । আমরা পাকিস্তানিরা তাই স্বকীয় তাহজীব তমদ্দুনের পরিপন্থী কোনো প্রচেষ্টাই বরদাশত করিতে পারি না । রবীন্দ্রনাথ বহু সঙ্গীতে মুসলিম তমদ্দুনকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির জয়গান গাহিয়াছেন । সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল । তাই বিলম্বে হইলেও সরকার এই সঙ্গীত পরিবেশন না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া জনগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন । আমরা সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাইতেছি ।"[৮৭] [আজাদ জুলাই ১, ১৯৬৭]

এইভাবে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে যখন বিরোধিতা আসতে থাকে, সর্বমহল থেকে সোচ্চার ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের দানা বাঁধতে থাকে । খাজা শাহাবুদ্দিনের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর সর্বপ্রথমে প্রতিবাদ জানায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ক্রান্তি' এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র সংসদের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ, ঢাকার 'অপূর্ব সংসদ'সহ বিভিন্ন সংগঠন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯ জন কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, শিল্পী শিক্ষাবিদ একটি স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক বিবৃতি প্রকাশ করেন ।[৮৮] বিবৃতিতে তাঁরা বলেন–

"স্থানীয় সংবাদপত্রে ১৩ই জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত এক সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । ইহাতে সরকারী মাধ্যম হইতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলিয়া মনে করি । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করিয়াছে, তাঁহার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীর সংস্কৃতির সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করিয়াছে । সরকারী নীতি নির্ধারণের সময়ে এই সত্তার গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য ।"[৮৯]

এর বাইরেও মওলানা ভাসানী, ঢাকার ১১ জন উর্দ্দুকবি, তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান, খুলনার সত্তরজন বুদ্ধিজীবী এই সরকারি নীতির বিরোধিতা করে । বিভিন্ন প্রতিবাদী সংগঠনের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য 'ক্রান্তি, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, সৃজনী, অপূর্ব সংসদ, ঐকতান, সংস্কৃতি সংসদ, হিল্লোল, স্পন্দন, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), আমরা ক'জনা, বাংলাভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বাণীচক্র, পুরবী, খুলনার সন্দীপনসহ ১৪ টি প্রতিষ্ঠান ।[৯০]

436790

অর্থাৎ সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সংগীত ও রচনাকর্মে সাম্প্রদারিকতার ছাপ না পাওয়া গেলেও তৎকালীন পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ এবং মৌলবাদী শক্তি সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দিয়ে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল । রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে প্রগতিশীল সংগঠনের গণজাগরণী মানসিকতা তৈরির কোনো পরিকল্পনা ছিল না । কিন্তু পরিস্থিতি তাদেরকে বাধ্য করেছিল । ফলে গণচেতনার উপযোগী গানের মধ্যে স্বদেশীগান, দেশাত্ববোধক গানগুলো গণসংগীত আন্দোলনে প্রাণ পায় । যার ধারাবাহিক চর্চা মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রেরণা জাগিয়েছে । গণসংগীত আন্দোলনে বিভিন্ন পদক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে । গণসংগীত আসরে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার সচেতন পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দীপনা ও গণজাগরণের গান

প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পের নৈতিকতা ও আদর্শের মধ্যে উদ্দীপনা ও জাগরণের নজির পাওয়া যায়। মধ্যযুগ, চৈতন্যের কীর্তন গান, রামপ্রসাদী, শাক্তগীতি, পঞ্চকবির স্বদেশী গানেও জাগরণের পরিচর্যা প্রধান আকারে ছিল। সাধারণ ভাবে বলা যায় গণসংগীতের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে গানগুলো এই চরিত্রে পড়ে–সেই গানগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। একথাও বলে রাখা ভালো যে, গণসংগীতের বেশ ঘরোয়া আন্দোলনেও পূর্বকালের স্বদেশী গানে জাগরণের গান পরিবেশিত হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' কিংবা 'বাঁধ ভেঙে দাও'; রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', 'আবার যখন গান ধরেছি'; মুকুন্দ দাসের 'বান এসেছে মরা গাঙে/ ছাড়তে হবে নাও', 'সকল কাজের মিলবে সময়/ ভাতের জোগাড় কর', কাজী নজরুল ইসলামের 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর,/ ঐ নতুনের কেতন ওড়ে, কাল বোশেখীর ঝড়', 'দুর্গম গীরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' ইত্যাদি গান ছাড়া গণসংগীতের আসর প্রাণচাঞ্চল্য পেতো না। আইপিটি-এর গণসংগীত যে উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হোক–এদেশের সাধারণ মানুষ তাদের বিশ্বাসে ও রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে গানগুলো জাগরণের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই গ্রহণ করেছে বেশি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিষয়টি যতটা স্পষ্ট হয় নি কিন্তু প্রাণের বক্তব্য হিসেবে শোষিত সর্বহারার পক্ষ সমর্থন করতে এদেশের মানুষ কোনো দ্বিধা বা আপত্তিজনক মনে করে নি। বিশেষ করে সলিল চৌধুরী, ভূপেন হাজারিকা, বিনয় রায়, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনেক গানই আন্দোলনের উপযোগিতা লাভ করেছে। সলিল চৌধুরীর 'ও আলোর পথযাত্রী এ যে রাত্রি, এখানে থেমো না', 'ঝংকারে ঝংকারে রুদ্রবীণা', 'নওজোয়ান নওজোয়ান', 'দুস্তর পারাবার কে হবি পার', 'গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির', 'চলো চলো হে মুক্তিসেনানী', 'ও মোদের দেশবাসীরে', আমার প্রতিবাদের ভাষা/ আমার প্রতিরোধের আগুন', 'ধিতাং ধিতাং বোলে' এখনো পর্যন্ত সগৌরবে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। পরেশ ধরের গানের জনপ্রিয়তাও ভাষা ও নান্দনিক চিত্রকল্পের গুণে কম নয়। যেমন–'প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও', 'এমন রাত্রি নেই যা প্রভাত হয় না', 'এমন একটা আসছেরে দিন', 'ফুলের মতো ফুটলো ভোর' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য। আবদুল করিমের লেখা বাঙালি অধিকারের প্রথম গান–'ও ভাই মোর বাঙালিরে', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের– 'এসো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার'; কমল সরকারের–'রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার'; মতলুব আলীর–'রাখবো না রাখবো না শোষণের চিহ্ন'; আবদুল লতিফের–'প্রতিরোধ প্রতিবাদ সংগ্রাম'; আলতাফ মাহমুদের–'এই বঞ্চনা মোরা রুখবো'; সুধীন দাশগুপ্তের 'ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন'; নিবারণ পণ্ডিতের 'নিশি অবসান জাগরে তোরা'; হাসান হাফিজুর রহমানের 'মিলিত প্রাণের কলরবে/ যৌবন ফুল ফোটে রক্তের অনুভবে' এমন অসংখ্য গানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে পূর্ণ বাংলা গণসংগীতের ধারা।

গ্রামগঞ্জের আরো অনেক লোককবি ও শিল্পীরা তাদের বিভিন্ন আসরে নারী, শিক্ষা, দুর্নীতি, অসামাজিকতার বিরুদ্ধে অনেক গানই গেয়ে থাকেন, যেগুলো গণসংগীতের বাইরে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে অসংখ্য গান হারিয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র ও নারীজাগরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছাত্রদের ভূমিকা সর্বোপরি অগ্রগণ্য। গণসংগীতের সৃষ্টিলগ্নে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতাকালে সোমেন চন্দের নিহত হওয়া; ভাষা-আন্দোলনে সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরের শহীদ হওয়াসহ সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিবাদ, স্বাধিকার আন্দোলনে আসাদের মৃত্যু, স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শহীদ ও বীরত্বের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বারবারই দেখা গেছে জাতির ক্রান্তিলগ্নে ছাত্ররাই হাল ধরেছে। শাসক-শোষক শ্রেণী পারতপক্ষে তাদের অন্যায়ের কার্যক্রম চালানোর জন্য যতটা সম্ভব ছাত্রদের নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। ছাত্র-রাজনীতিকে কিভাবে কলুষিত করা যায়, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা যায়, সে দিকে খুব সচেষ্ট থাকে। ছাত্র জাগরণের উপরই নির্ভর করে সামাজিক জাগরণ। গণশিল্পীরা সর্বদা ছাত্রদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তারুণ্যের জয় গান গেয়েছেন। সবকিছু মিলিয়ে ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস একটি প্রলম্বিত ইতিহাস, যা এই পরিসরের লক্ষ্য নয়, এখানে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কী ধরণের গণসংগীত রচনা করা হয়েছে তা উল্লেখ করা।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাত্র জাগরণের ক্ষেত্রে অভ্যুদয়ের আহবান রেখে বলেছেন, সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভুলে নিখিল সমাজের সামনে বিধাতার মতো দাঁড়াতে হবে। লিখেছেন–

'জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল
স্বতঃ উৎসারিত ঝর্ণাধারা প্রায়
জাগো প্রাণ চঞ্চল।
ধর্ম বর্ণ জাতির উর্ধে জাগোরে নবীন প্রাণ
তোমার অভ্যুদয়ে হোক সব বিরোধের অবসান।
সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে উর্ধ্বে ধরিয়া তোলো॥'

১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রযুবা সম্মেলন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। স্বকণ্ঠে গাওয়া গানটি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অপরিহার্য একটি কবিতা রূপে পাঠ্য।

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধে বিমান ঝড়-বাদল
আমরা ছাত্রদল॥'

শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস শিক্ষাহীন গৃহহীন কঙ্কালসার অসহায় জাতিকে প্রাণ দিতে, গানে গানে অন্ধকার পিশাচকে দুরে ঠেলে দিতে আহবান জানিয়ে লিখেছেন–

'উদয় পথের যাত্রী
ওরে ও ছাত্র-ছাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো ।
প্রেতপুরীর এই অন্ধকারায় আনো আলো॥...

শিক্ষাবিহীন গৃহহারা যারা কাঁদিছে আঁধারে
হে প্রগতির সৈনিক তোরা ভুলিবি কি তাদেরে ।

কঙ্কালে প্রাণ দাও, জীবনের গান গাও
ভুলি ভেদাভেদ অন্ধ আবেগ, হাতে হাত মিলাও
ধন পিপাসায় মূঢ় হতাশায় আগুন জ্বালো॥'

আরেকটি গানে বীর-কিশোরদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন চীন-রাশিয়ার কিশোরেরা যেভাবে দেশের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করছে ঠিক সেভাবেই তাদের হাতে হাত মিলিয়ে মুক্তির মুকুল ফোটাতে, দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে লিখেছেন–

বীর কিশোর দল
আমরা বীর কিশোর দল
আমরা যুগের স্বপ্ন ওরে আমরা জাতির বল॥...

ঘরেতে আজ হাহাকার, দ্বারে দস্যুদল
আমরা ফিরে দেখবো বসে মায়ের চোখের জল;
চীন রাশিয়ার বীর কিশোর
দেশের লাগি লড়ছে জোর
তাদের হাতে হাত মিলায়ে লড়ব মোরা চল ।'

এখানে শিল্পী সমাজতন্ত্রের আদর্শকে সুক্ষ্মভাবে অনুসরণ করেছেন 'চীন-রাশিয়া' উদ্দেশ্য করে ।

শিল্পী আবদুল লতিফ বেশ কয়েকটি ছাত্রদের নিয়ে গান লিখেছেন । একটি গান বাংলার ছাত্র-আন্দোলনে আত্মত্যাগের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে । ছাত্র-সমাজের প্রতিরোধ, ত্যাগ, সাহস, সচেতনতা, দেশ ও ভাষার মানকে ধরে রাখার বর্ণনা অতি চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে ।

'আমার দেশের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনা যে নাই
ওরা বছর বছর মরছে বলে আমরা বেঁচে যাই ।'

১৯৬৮ সালে এই গানটি তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ভাবে আলোড়িত করেছিল । ১৯৫৪ সালে লেখা আরেকটি গানে তিনি ছাত্রদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, সামনে দুর্গম পর্বত, আর সেই পথ অতিক্রম করলে বোবারাও কথা বলে, জুলুমবাজদের দরবার থেকে বন্দিরা পায় মুক্তি । তাই মুক্তির দুত বলে জালিমের রক্ত পান করতে বলেছেন । গানটি হলো–

'সাবধান ওগো সাবধান, যুগের নকীব নওজোয়ান,
সামাল সামাল সামালরে, নতুন যুগের কামাল রে
সোনার বাংলা ছেয়ে ঐ, আসছে ধেয়ে দেখরে ঐ
ও আহা সর্বনাশা বান॥'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ইলা মিত্র, প্রীতিলতা, রোকেয়া, সুফিয়া কামালের মতো অসংখ্য নারীনেত্রী ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছে। সক্রিয় আন্দোলনে নারীরা সব সময়েই সাথে থেকেছে তার ইতিহাস তেভাগা আন্দোলন, টংক বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা যায়। গণসংগীতে কৃষক, শ্রমিকের ন্যায় নারীদের নিয়ে গানও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে মুকুন্দ দাস এবং নজরুলের গানে নারী জাগরণের কথা জোরেশোরে এসেছে। ব্রিটিশ বিতারণের জন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন হলো বিদেশী দ্রব্য বর্জন । সেখানে মুকুন্দ দাস বঙ্গনারীদের সচেতন করে দিয়ে লিখলেন–

'ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না॥...
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যা।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না॥'

ব্রিটিশদের মূল কারবার ছিল ঠুনকো নকশাদার প্রসাধনী বিক্রি করে দেশের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে যাওয়া। এদেশের ধনরত্ন সবই তারা করায়ত্ব করেছে এভাবে। তাই দেশী জিনিস ব্যবহারের সচেতনতা সৃষ্টি করা ছিল মূল পদক্ষেপ। স্বদেশী গানের মূলমন্ত্র ছিল এটাই। রজনীকান্ত লিখেছিলেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন–

'জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত টিকা॥

দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥'

এমন একটি নারী জাগরণের গান বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। যেখানে দেশ-মাটি-মাতা-বিদ্রোহী-নারী ও দেবতার অপূর্ব সম্মিলনে বিশ্ব দুয়ারে আপন তেজে দাঁড়ানোর হুহুংকার আহবান ধ্বনিত হয়। অবশ্য আরেকটি সাম্যের গান লিখেছিলেন ১৯২৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর ১৯২৫ সালের শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের পরিচালনায় নামেন, যে দলের উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদ। যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক সাম্যের উপর ভিত্তি করে ভারতের স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ লাভ করবে। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯২৫ লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত–

'সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী ।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান ।
অথবা পাপ যে–শয়তান যে–নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে ।'

বাংলার ইতিহাসে গণ-আন্দোলনে যত শহীদ হয়েছে তার বেদনা যতটা একটি দেশ ধারণ করে আছে, প্রতিটি মায়ের সন্তান হারানোর বেদনা তার থেকেও অনেক গভীর ও মর্মস্পর্শী । তাই শহীদ মাতাদের জাগরণে, সান্তনা, ও আত্মত্যাগের সমবেদনা জানানো কোনোভাবেই সম্ভব নয় । নারীর এই উৎসর্গ নিয়ে বেশ কিছু গান পাওয়া যায় । বিনয় রায় লিখলেন অহল্যা মায়ের গান–

'আর কতকাল বল, কতকাল সইব এ মৃত্যু অপমান
প্রাণ আর মানে না॥...

চন্দন পিঁড়ির সরোজিনী অহল্যা মা–
তাদের খুনের অর্পণ হল না
সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলাল সে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,
রক্তে ধার বেঁধে মোদের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
কবে বল কবে শুধব তা
প্রাণ আর মানে না॥'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে লেখা এবং বিনয় চক্রবর্তীর সুরারোপিত–

'একদিন মাকে দিয়েছিলাম দোষ
মা আমার আধা ভিখারী
না হয় আমরা ঘরে করবো উপোস
তাই ব'লে কি যাবে রাজার বাড়ী?'

নির্মল চৌধুরী ও ভাস্কর বসুর ঝাঁসির রাণী লক্ষী বাই-এর তুলনা করে মালতীর বীরত্বকে উপস্থাপন করেছেন । বীরভূমের মালডিহা গাঁয়ের কিশোরী মালতীকে পঞ্চায়েতের লোকেরা যখন খুন করতে প্রবৃত্ত হয় । মালতী তখন সর্বহারার সাথে ঝাণ্ডা তুলে মিছিলের আগে আগে ছুটে চলে । সেই বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই গানে–

'ধন্য তুমি বঙ্গ জননী,
তুমি মোদের প্রাণ–মাগো...
এই মাটিতে জনম নিলাম
এই মাটির গান গাই ।
তুমি যে মা বীর প্রসবিনী
কত গরবিনী মা ।
তারি মধ্যে একটি মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মালতী তার নাম–মাগো
(সে যে) তোমারই সন্তান ।...
বিজয় মিছিল নিয়ে যখন
হাজার কিষাণ চলে
সবার আগে যায় মালতি মা
ঝাণ্ডা উঁচা করে ।
যেমন ঝাঁসির রাণী চলে॥'

বাংলায় নিবেদনমুখী গানের মূল বিষয়ই মা । মা-মাটি-দেশ-দেবী একসূত্রে গাঁথা । দেশকে মাতা বলা, মাতাকে দেশ বলার মাহাত্ম্য হলো এক মাতা জন্মদাত্রী অন্য মাতা অন্নদাত্রী । উভয় অর্থেই দাত্রী । আরেক অর্থে মানব জন্মের সার্থকতায় নারীকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখা হয়েছে এদেশে । ফলে যে বিষয় ফলনশীল ও প্রবাহিত তার লিঙ্গ নারী । যেমন নদী, ঝর্ণা প্রভৃতি । আর নারীর সর্বোচ্চ সম্বোধন মা । একারণেই দেশ হলো মাতার ন্যায় । আরেক অর্থে কন্যাও, মাকে আদর করে ডাকা হয় কন্যা । বাংলার অধিকাংশ মুক্তির দেবতাও নারী । শ্যামা, চণ্ডী, দুর্গা, লক্ষ্মী, স্বরসতী প্রভৃতি । ফলে বাংলাগানের মধ্যে স্বদেশাত্মক বিষয়ে মা প্রসঙ্গটি অনিবার্য হয়ে যায় । স্বদেশী গানে যেমনভাবে মা প্রবলভাবে এসেছে, গণসংগীতে সেভাবে আসে নি । না আসার কারণ রাজনৈতিক, দর্শনগত এবং বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে অভিযাত্রা । সেখানে দেশ বন্দনার থেকেও অধিক সংকট নিয়ে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের কথা এসেছে সরাসরি । ধর্মীয় দেবদেবীকে সেভাবে মূল্যায়নের প্রসঙ্গ বা দৈবের উপর ছেড়ে দেয়ার আর সময় নেই । তবুও এসেছে প্রাসঙ্গিকতায়, প্রয়োজনে । সলিল চৌধুরীর একটি গানে দেখা যায়–

'শ্যামল বরণী ওগো কন্যা
এই ঝিরঝির বাতাসে ওড়াও ওড়না...

এ জীবন ধন সাধের সাধনা
তোমায় কে দিয়েছে ব্যথা আমায় বল না?
সুনীল নয়ন কেন ছলছল
তোমারে দেখেছি আজি গৃহহারা
পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিছ
ঘরে ঘরে যত সন্তানদের জাগাতে, ওগো...'

এভাবে নারীকে মূল্যায়ন করা হয়েছে বাংলা গণসংগীতে । নারী যদি জাগে তাহলেই দেশ জাগবে । নারীর প্রেরণাই পুরুষের অস্ত্র ধরার সাহস । নারী শুধু প্রেমের বস্তু বা জন্মের বস্তু নয়, কখনো তাকে সরাসরি ময়দানে এসে হাজির হ'তে দেখা গেছে । তাই গণসংগীতে নারীর আসন অপরিসীম ।

গণসংগীত চর্চায় নারী নেতৃদের অবদানও কম নেই । নারী পুরুষ একসাথে বিভিন্ন অঞ্চলে সম্মিলিত ভাবে পরিবেশন করে আসার ধারাবাহিকতা সবসময়েই ছিল । গণসংগীতের অগ্রজ পর্যায়ে রেবা রায়চৌধুরী, জলি বাগচী, রুমা গুহঠাকুরতাসহ অনেকের অবদানই খুব গুরুত্বপূর্ণ । তবে সংগীত রচনায় তাঁরা খুব বেশি এগিয়ে আসেন নি ।

Dhaka University Institutional Repository

সমবায়ের গান

সমবায় বলতে প্রধানত অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য যৌথ মালিকানা বোঝায় । যৌথভাবে অধিকার ভোগ করার জন্য একটি সম্মিলন, প্রত্যেকের সম-অধিকার সৃষ্টির জন্য একটি মৌলিক অর্থনৈতিক আন্দোলন । তবে অর্থনীতির পরিভাষায় গ্রামের সমবায় সমিতি দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও সচ্ছলতার পথকে সুগম করে দিয়ে থাকে । সমাজতান্ত্রিক চেতনায় এর গুরুত্ব আরো গভীরে । মূলত খেটে খাওয়া দিনমজুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিত হয়ে যে জনশক্তি গড়ে ওঠে, এখান থেকেই শ্রেণী জাগরণের সূত্রপাত । সাংগঠনিক দক্ষতা, উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণীর শোষণ থেকে রক্ষা, পুঁজিবাদের প্রভাব এমনকি রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের দ্বারা চাপানো প্রহসন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো জনশক্তি সৃষ্টি করতে পারে । তেভাগা বা কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে সমবায় শক্তির ভূমিকা ছিল অপরিসীম । তবে আদর্শ সমবায় গড়ে ওঠার জন্য বেশকিছু শৃঙ্খলার প্রয়োজন ।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়– "গ্রামের সমবায় সমিতির সাফল্যের পূর্বশর্ত হলো গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশকিছুটা সামাজিক সাম্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা । এসকল পূর্বশর্ত ভারতের গ্রামে বিদ্যমান ছিল না এবং বর্তমানকালেও এ পর্যন্ত কোথাও নেই । ভারতে সমবায় আন্দোলনকে যদি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হয় তাহলে অবশ্যই দু'টি জিনিস প্রথমে সংগঠিত হ'তে হবে । (১) গ্রামের ক্ষমতাবানদের ক্ষমতাকে নিশ্চয়ই হ্রাস করতে হবে, আর (২) সরকারকে সাধারণ মানুষের হাতিয়ার অবশ্যই হ'তে হবে এবং সাধারণ মানুষেরা সরকারকে সে রকমই গণ্য করতে হবে ।"[৯১] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ভারতীয় সমাজ ও প্রকৃতির উপযোগিতা সবসময়েই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূলে ছিল বলে বিদেশী বেনিয়ারা হাজার হাজার বছর ধরে শোষণ করতে পেরেছে । ভারতীয় জনগণের মধ্যে সমবায়ী মনোভাবকে গড়তে না দেয়ার চক্রান্ত কাজে লাগিয়েছে বিভিন্ন কৌশলে । অশিক্ষিত করে রাখা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, বর্ণবাদ, দাসপ্রথা চালু, শোষণ, লুট, খাজনা সকল দিক থেকেই নিরীহ জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল । তাই সমবায় সাফল্যের দুইটি পূর্বশর্তের কোনাটিই ঘটাতে পারে নি জোতদার মজুতদার জমিদার ও বেনিয়াদের রাষ্ট্রযন্ত্র কব্জাগত করে রাখার কারণে ।

স্বদেশী আন্দোলনের থেকে অর্থনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হয়েছে । ফলে এসময়ে দেশীপণ্যের প্রতি ভক্তিস্বরূপ নিজ দেশের মোটা কাপড় ছেড়ে বিদেশী শাড়ি না পরা, কাচের চুড়ি বর্জন করে শাঁখের বালা পরার মতো স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আহবান উচ্চস্বরে গীত হয়েছে । ১৯৪০-এর পরে স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে ভারত, পাকিস্তানে সমবায়ের চেতনা সরাসরি প্রতিফলিত হয়েছে । এমনকি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সংবিধানেও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্গত হয় সমবায় মালিকানা । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির মধ্যে মালিকানাকে তিনটি নীতির উপর বিভাজন করা হয়েছে । ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, খ) সমবায়ী মালিকানা, গ) ব্যক্তিগত মালিকানা । উৎপাদন, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বন্টন প্রণালী সমূহের মালিক জনগণ । ২য় ভাগের ১৩ খ সংবিধানে বলা হয়েছে–"সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমূহের মালিকানা ।"[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমবায়ী মালিকানা ভিত্তিক সংবিধান দীর্ঘ এক আন্দোলনেরই ফসল। এ নিয়ে অনেক গণসংগীত লেখা হয়েছে। নবজীবনের গানের স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর বিখ্যাত গান 'এসো মুক্ত কর' গানে সমবায়ের কথা বলেছেন এভাবে–

'এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে,
এসো জনতার মুখরিত সখ্যে,
এসো দুঃখ-তিমির ভেদি দুর্গম ধ্বংসের
নিষ্ঠুর ভয় করি চূর্ণ
এসো প্রাণের ভবন করি পূর্ণ॥'

সত্যেন সেনের সমবায় ভিত্তিক একটি উৎকৃষ্ট গানের সন্ধান পাওয়া যায়–

'জনরক্ষা সমিতি গড় সেই আমাদের জোর
আত্মরক্ষা সমিতি গড় সেই আমাদের দায়
দশ মিল্যা হাত মিলাইরে,
সব রইব বজায় আর সব হইব আদায়
এই কর উপায় রে ভাই এই কর উপায়–
খাইতে পরতে মায়ের ইজ্জত রাখতে যদি চাও
দেশের যত হিন্দু মুসলিম রে
গায়ের যত মেয়ে-মরদ রে
সমিতির ভলান্টিয়ার হও
এই একতার জোরে আনব জাতীয় সরকার।'[৯৩]

কবিয়াল ফণী বড়ুয়া সমবায়ের উপকারিতা, রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক সার্থকতাসহ নানা উদাহরণে কয়েকটি গান উপহার দিয়েছেন। সমবায়ের প্রকৃত সার্থকতা কি, সে সম্পর্কে বলেন–

'পণ্যের মত গণ্য করি শ্রমিকের শ্রম কিনে
শ্রমিকগণের সুখ-সুবিধা নাহি ভাবে মনে।
সমবায়ী শিল্পে জাগায় দেশাত্মবোধ প্রীতি
পরস্পর সাহায্য করা সমবায়ের নীতি।
সকল প্রকার কুটিলতার করি অবসান
প্রমাণ দিল কুমিল্লাতে আকতার হামিদ খান।
সম্মিলিত শক্তির গুণে দরিদ্র সমাজ
ঘুচাইতে দরিদ্রতা উঠিল আওয়াজ।
বিশ্বব্যাপী সমবায়ের গাহে জয়গান
সুবুদ্ধি সততা হলো সমবায়ের প্রাণ।
সম্মিলিত পুঁজির গুণে বহু স্বাধীন দেশ
সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যপথে করিল প্রবেশ।

আরেকটি গান–

'কৃষক ব্যক্তিসত্তায় বাঁচতে চায়

Dhaka University Institutional Repository

মার খাইয়া হতাশ হইয়া বাঁচার পথ নাহি পায় ।
টাউট টন্নি জুলুমবাজের লেজুড়বৃত্তি করতে চায়॥
সমবায়ে চাষ করিতে ঐক্যবদ্ধ নয়
পরস্পর বিরোধী মনে জাগে দ্বন্দ্ব ভয়
ম্যানেজারের সুবিধা হয় মুনাফার লোভ বেড়ে যায় ।

সমবায়ের ফলাফল কি তার উদাহরণ দিয়েছেন চমৎকারভাবে । যেখানে ঐক্য এবং অনৈক্যর সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শোষণ আর সাহসের সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে । সমবায় যে একটি সংঘবদ্ধতার প্রতীক, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন যার আধুনিক উদাহরণ । সেই বিষয় উঠে এসেছে কবিয়ালের আরেকটি গানে–

পাঁচতলা-সাততলা যত পাক্কা বাড়ী উঠে
পরস্পর সংলগ্ন থাকে নীচের তলার ইটে ।
সিমেন্ট বালি লোহা-ইটায় হয়ে শক্তিশালী
পাক্কা বাড়ি গড়ি উঠে সমবায়ে মিলি ।
কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত গরীব-ধনি যত
সমাজের কল্যাণে সকল হয়ে সংগঠিত ।
দেখতে পাবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে
বিন্দুতে হয় সিন্ধুর সৃষ্টি মিলি পরস্পরে ।...
অনৈক্যে সদ্‌মানুষে করে দুষ্টের সেবা
অনৈক্যে বাপের গালে পুতে মারে থাবা ।
ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে মুখে হাসি ফুটে
দুর্নীতিবাজ স্বৈরাচারী নেতার পতন ঘটে ।

উপরোক্ত গান থেকে বোঝা যায় সমবায় শুধুমাত্র অর্থ উন্নয়নের ক্ষেত্র নয় । এর ফলাফল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিকল্প শক্তিসংঘে পরিণত হ'তে পারে । যেখানে শধু দরিদ্র নয় সবশ্রেণীর মানুষের সমমনা ক্ষেত্র তৈরি করে, সামাজিক ভাবে প্রত্যেকের পরিচয়, জানাশোনা এবং বিপদে-আপদে একে অপরের বন্ধু হ'তে পারে । এ জাতীয় সকল সম্ভাবনা সমবায় গঠনের মধ্যে লুকিয়ে আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট ও মিছিলের গান

'দুনিয়া মজদুর এক হও' বাক্যটি পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণীর মিছিলের প্রধান শ্লোগান। রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে মিটিং এবং মিছিল অন্যতম। যখন যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সে বিষয়ে গান সভামঞ্চে বক্তৃতামালার আগে বা পরে গীত হয়। রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হিসেবে এই আনুষ্ঠানিকতা চিরাচরিত। মিছিলে এই ধরণের আয়োজনের সুযোগ নেই শ্লোগান ছাড়া, মিছিলের সংগীতই শ্লোগান। মানুষের অধিকারের ভাষা এখানে এত প্রবল থাকে যে সকল বাধা-শৃঙ্খলা ভেঙে চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে চায়। মিছিলের বিভিন্ন ধরণ আছে। কোনো কোনো সময় শোক মিছিল, মৌন মিছিল আবার দুর্বৃত্ত প্রশাসনকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিতে, দুর্নীতি ও শোষণের বেরিকেড ভেঙে দিতে জনতা সবসময়েই মিছিলের আশ্রয় নেয়। মিছিলের কোনো কোনো শ্লোগান হয়ে ওঠে সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আবার কোনো সংগীতের পঙক্তিও শ্লোগান হয়ে যায়। গণসংগীত সৃষ্টির আগে মিছিল ছিল, কিন্তু মিছিলের ভাষা সংগীতকে সেভাবে ধারণ করতে পারে নি। পরবর্তীতে মিছিল পরিচালনার কাঠামোগত এবং জোয়ার সৃষ্টির জন্য কিছু গানও রচিত হয়েছে। মিছিলের গান বলতে গাওয়ার জন্য যতটা নয়–মিছিলে যাওয়ার জন্য প্রতীকাকারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, দ্বিধা-শংসয় ভুলে এককাতারে শ্লোগান দেবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে এ গানে। মিছিলেও কিছু কিছু গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। দেখা গেছে ভোটের মিছিল, বিজয় মিছিল, শোকের মিছিল ইত্যাদিতে বিভিন্ন গান উপজীব্য হয়। কিন্তু তা ক্ষণিকের উল্লসিত প্রকাশ, যা মিছিলেই থেকে যায়; সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এভাবে অজস্র মিছিলের গান হারিয়ে গেছে বাতাসে। কিছু কিছু পাওয়া গেছে তা উপস্থাপন করা হলো।

কমল সরকারের লেখা ও সুরে–

'রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার
হাতের মুঠোয় নিয়ে হাতিয়ার
আজ আমরা মিছিলে এসেছি
তিল তিল মরণেও জীবনের গান গাই
জীবনকে এত ভালবেসেছি
আজ আমরা মিছিলে এসেছি।
একা নই সাথে আছে অনেক মানুষ
আলো ভরা পৃথিবীতে বাঁচার আশায়
মুখরিত প্রতিবাদে জ্বলে ওঠে কোটি চোখ
অগ্নিগর্ভ এই গানের ভাষায়॥'..

শত্রুর ভীরু চোখে শঙ্কার ছায়া দেখে
উত্তাল কলরোল হেসেছি
আজ আমরা মিছিলে এসেছি॥'

রাত্রি যত কঠিন কালো,
ততোই উজল ভোরের আলো

Dhaka University Institutional Repository

পথের আঁধার পথেই থাকে,
আলোর রেখা পথের বাঁকে
তাই প্রাণের মিছিল আজ চলছে ।...
এ মিছিল আঁধারের পার হয়ে
আলোকের দেশে মোরা সব অভিযাত্রী..
এ মিছিল আমাদের, পার হয়ে মরণের
পারাবার সেই দিনই থামবে
যবে জীবনের আরো ধার নামবে॥'

ষাটের দশকের গণেশ চক্রবর্তী লিখেছেন–

'এগিয়ে চলে প্রাণ মিছিলে–দলে দলে আওয়াজ তুলে
লাখো পায়ের সাড়ায় কাঁপে কঠিন মাটির বুক
লড়াইয়ের ময়দানে আজ নতুন নতুন মুখ॥'

রমেশ শীলের গান–

'এগিয়ে চল এগিয়ে চল, এগিয়ে চল
মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী মোরা ,
মুছাব মায়ের চোখের জল ।'

সলিল চৌধুরীর লেখা–

'চলো চলো হে মুক্তি সেনানী
বিভেদ সর্প শির দলি
মিলন মন্ত্র সম্বলি
কে রাখে এই তেজ দীপ্ত
মিলিত মিছিল বন্যাকে
একসাথে কোটি হাতে
আঘাতে চূর্ণ করি
ক্লেদ ঘৃণা দস্যুকে...চলো চলো॥'

অথবা– 'চলছে আজ চলছে কাল শান্তির এই মিছিল
যত না দিন যুদ্ধবাজ ফেলবে অস্ত্র তার....
বইতে দেবো না আর
রক্ত রুধির ধার
দীপ্ত অঙ্গিকার
কোটি কোটি প্রাণ কোটি কোটি মন
বিশ্বে আজ শামিল॥'

Dhaka University Institutional Repository

গণসংগীতের জগতে যে গানটি সবচেয়ে আদর্শ সংগীত হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বোপরি সব ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকাশের শিল্প শৈলী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্রোতা ও গবেষকদের চোখেও অসাধারণ আবেদন নিয়েছে সেই গানটি মিছিলের আদর্শ নিয়ে রচিত[৯৪]। সলিল চৌধুরীর লেখা এই গানটি হলো–

গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরি হও
ঘরে ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আঁধার তৈরি হও
এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার এই মিছিল।'

মিছিলের ন্যায় হরতাল ধর্মঘট, অবরোধ নিয়েও বেশকিছু গণসংগীত রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। যেমন ১৯৪৬ সালে সর্বভারতীয় ডাক, রেল ধর্মঘট-এর পরিপ্রেক্ষিতে সলিল চৌধুরীর লেখা–

'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে...
শোষণের চাকা আজ ঘুরবে না–ঘুরবে না,
চিমনীতে কালো ধোঁয়া উঠবে না–উঠবে না,
বয়লারে চিতা আজ জ্বলবে না–জ্বলবে না
চাকা ঘুরবে না, চিতা জ্বলবে না, ধোঁয়া উঠবে না।
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে
হরতাল! হরতাল! হরতাল!
আজ হরতাল! আজ চাকা বন্ধ।'

Dhaka University Institutional Repository

জেল বিদ্রোহ

রাজনৈতিক জীবনে আত্মোৎসর্গের ন্যায় সাহসী সৈনিকদের জেলে ঢুকিয়ে শোষকশ্রেণী যেমন আন্দোলনকে দমন করে। অপর দিকে জেলে বসেও অনেক সাহসী সৈনিক আশ্রিত কয়েদিদের সংঘবদ্ধ করে নতুন আন্দোলনের বা বিদ্রোহের সূচনা করে। জেল একদিকে সমাজের চোখে অপরাধীদের বিচারের রায়ের শাস্তিকেন্দ্র। অপর দিকে অসৎ ক্ষমতাবান লোকের আশ্রয়কেন্দ্র। জেল কখনো ন্যায় বিচারের প্রতীকাকারে সমাজের রক্ষা-কবজের ভূমিকা নেয়, আবার কখনো তা সরকার ও প্রসাশন তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সংগ্রামী ত্যাগী জননেতাদের আটক করে অবিচারের-অন্যায়ের সাজঘরে রূপান্তরিত হয়। সবই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। কিন্তু যখন আদর্শ প্রচারক অবিচারের বশবর্তী হয়ে জেলে আটক হয়। তখন জেলও জনমঞ্চে পরিণত হয়। ভিন্নদিকে মোড় নেয়। চক্রান্ত যে সবসময় সফল হয় না। জেলে বসে ত্যাগী নেতারা আন্দালনকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলেন। এমন ঘটনা ইতিহাসে অহরহ। জেলে কয়েদীদের জন্য যে পাওনা, কখনো তা থেকেও বঞ্চিত করে। জেলে হত্যাও করা হয়েছে অসংখ্য নেতা কর্মীকে। ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ মালাবারের কায়ুর গ্রামে ৪ জন কৃষক নেতাকে প্রহসনমূলক বিচার ফাঁসি দেয়া হয়েছিল কালাপুর জেলে। এই কৃষকনেতা চারজনের মাদাতিল আপ্পু, কুনজামর আয়ার, আবুবকর ও চির কন্দর। শিল্পী বিনয় রায় কৃষক নেতাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন–

'আর কতকাল, বল কতকাল,
সইব এ মৃত্যু অপমান
প্রাণ আর মানে না
শহর বন্দরে চাষীর কুটিরে
নর খাদক দলের অভিযান
এ আর সহে না।'

১৯৪৯ সালে রাজশাহী জেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন কৃষক মাধব নাথ। তাঁর স্মরণে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সৃষ্টি করলেন–

'আমরা তো ভুলিনাই শহীদ
সে কথা ভুলবো না
তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো কে
আন্ধার জেলখানা॥'

এগুলো জেলের প্রহসনকে উদ্দেশ্য করে লেখা গান।

কিন্তু এমন কিছু গান আছে যা জেলে বসে আন্দোলন করার সামিল। কাজী নজরুল ইসলাম তার প্রবর্তক বলা যায়। বাংলা স্বদেশী গানের যুগে বসে তিনি লিখেছিলেন জেলে বসে জেলের তালা ভেঙে ফেলার শ্লোগান–

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী

Dhaka University Institutional Repository

ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস-নিশান উঠুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদী॥'

অথবা– 'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল ।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল॥

তোদের বন্দ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়॥'

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা গণসংগীতের অনন্য সাধারণ সৃষ্টি 'নবজীবনের গান' যেখানে গণআন্দোলনের সবধরণের ইঙ্গিত প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে । জেলকে অস্বীকার করে রচিত একটি অংশ সমবেত ভাবে গীত–

অসহ্য অসহ্য অসহ্য!!
ভেঙে ফেল ভেঙে ফেল
ভেঙে ফেল এই কারা,
শত পাকে ঘিরে বাঁধে নিষ্ঠুর লৌহ,
তবু প্রাণ পাক ছাড়া ।...
ভাঙো ভাঙো ভাঙো
ভেঙে ফেল এই কারাগার
প্রাণ কল্লোলে গরজে মুক্তি পারাবার॥'

১৯৪২ সালে হিজলী বন্দীশালায় বসে ত্রিদিব চৌধুরী রচনা করেন–

'মোদের পতাকা লাল বরণ
শহীদ হল সে করিয়া রণ ।'

সত্যেন সেন অসংখ্য গান জেলে বসে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু তা সংরক্ষিত হয় নি । জেল যে বরাবরই রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল উত্তাল আন্দোলনের সময় জেল বিদ্রোহের ইতিহাস তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে আছে । 'জেলের তালা ভাঙবো, ... কে আনবো', নিজেদের নেতাকে মুক্তির জন্য এই শ্লোগান সবসময়েই ধ্বণিত হ'তে শোনা যায় বাংলার মিছিলে মিছিলে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও স্বাধিকারের গান

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রহসন মূলক গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে সরাসরি সামরিক আইন চালু হয় । জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইনের ক্ষমতা নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হন । জনগণের মধ্যে হঠাৎ পবিবর্তন আসে, মানুষ বর্হিচক্ষু দিয়ে দেখতে পেল একটি আইন-শাসনের কঠোর সরকার, কেউ কেউ খুশিও হলো, কেউ কেউ দেখলো জাতির জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অমানিশা । সাধারণত সামরিক আইন চালু হলে জনগণের কাতারে থাকা দুর্বৃত্তকারীদের ধরপাকড়, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন ঘটে । মানুষ অদূরদর্শিতায় এগুলোকে এক অর্থে ভালোই মনে করে । কিন্তু জনগণের সাথে সম্পর্কহীন সরকার জনগণের জন্য কী করতে পারে তা ধীরে ধীরে যখন প্রকাশিত হয়, তখন সরকার আখের গুছিয়ে বিদায়ের পরিকল্পনা হাতে নিতে থাকে । তেমনি একটি উদাহরণ দেয়া যায়, একজন লোককবি যশোরের মোসলেম উদ্দিন সামরিক আইন আসার পর তাকে বেশ ভালো চোখেই দেখেছেন এবং রচনা করেছেন–

'সামরিক আইন বড়ো মধুময় ।
ইচ্ছা থাক্‌লে রুচিমত মোণ্ডা (মণ্ডা) মিঠাই পাওয়া যায় ।
দুর্নীতি দূর্বৃত্ত দলে, চলে যায় দলে দলে
গুতার চোটে বাবা বলে, সাধে কি কেউ বলতে চায়?
লোভী কামী অত্যাচারী; তার পিছনে মিলিটারি;
পুরষ্কার তার বেতের বাড়ি, খেলে পরে প্রাণ জুড়ায় ।
মদ ভাঙ গাজা আফিমখোর, জুয়াচোর আর জেনাখোর
চোর ডাকাত আর হারামখোর, এইবার এইবার হায়
দেশেতে এল সংস্কার, রাস্তাঘাট ভাই সব পরিষ্কার
সোনার দেশ হইয়াছে সুন্দর, দেখসে তোরা আয় রে আয়॥'[৯৫]

কবি গণতন্ত্রে নামে যে প্রহসন দেখে এসেছেন পূর্ববর্তী ক্ষমতাবাজদের দৌরাত্ম্যের বাস্তবতায় । মনে করেছেন হয়তো ঐ পাপাচারী গণতন্ত্রকে রুখতে এই সরকারই ভাল । তবে মাত্র ৪ বছর পরই পরিষ্কার হয়ে উঠলো সামরিকের আসল চেহারা । যখন থেকে যখন নিত্য দ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকলো, চাকরি নাই, বাঙালির কোনো অধিকারই রাখা হলো না তখনই শুরু হলো অগ্নিঝরা সংগ্রাম । অধিকার বা দাবী পেশ করার মতোও কোনো স্থান নেই, ফলে ধীরে ধীরে রাস্তায় নামতে শুরু করলো । বিভিন্ন ধরণের দাবী দাওয়া নিয়ে শুরু হলো বিক্ষোভ । অবশেষে ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'লৌহমানব' খ্যাত নির্মম শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটাতে বাধ্য করা হয় ।

"৬২ থেকে যে অগ্নি-ক্ষরা, রক্ত-ঝরা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল সে সংগ্রামেরই চূড়ান্তরূপ । এই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল ।..সাধারণভাবে বলা যায়, ১৯৪৮ থেকেই আমাদের এ-দেশীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা । কিন্তু আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে বলা হয়, '৫২-র মহান ভাষা সংগ্রামই হল আমাদের জাতীয় চেতনার বিপ্লবী প্রকাশের প্রথম বিস্ফোরণ ।...'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের মত আর একটি ঘটনা আগেও না, আজও না– আর কখনো ঘটেনি । এই অভ্যুত্থান আইয়ুবের মত "লৌহ মানব" ডিক্টেটরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছেড়ে দিয়েছিল ।"[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের যে মুক্তিযুদ্ধ, তার সাহস ক্ষিপ্রতা, তীব্রতা ও উদ্দীপনার শিক্ষা '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের কাছ থেকেই শেখা। উভয় পাকিস্তানের মানুষ অন্তত একবার সম্মিলিত হয়েছিল এই প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রতিটি অঞ্চলের জনগণ, প্রতিটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী আইয়ুব খানের অবসানের লক্ষ্য নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব-বাংলার গণ-অভ্যুত্থানের রূপ ছিল অনেকটা ভিন্ন ও ব্যাপক। কারণ এর সাথে সূত্রাবদ্ধছিল স্বাধিকারের প্রত্যক্ষ সুর।

যদিও ১৯৬৮ সালের অক্টোবরেই গণতন্ত্র হত্যাকারী জেনারেল আইয়ুবের পতন সুনিশ্চিত হয়। পরিণামের অবস্থা বুঝে জুয়ারির শেষ দানের মতো সারা পাকিস্তান জুড়ে 'উন্নয়ন দশক' পালনে প্রবৃত্ত হন। 'উন্নয়নের আলোক সজ্জায় রাতকে দিন বানিয়ে দিলো। পরিণামে দিনও রাতে রূপান্তরিত হয়। এ ছিল গণরোষের আগুনে ঘি ঢালার মতো ঘটনা। 'আগড়তলা মামলা'র ষড়যন্ত্র করলেন, ঘুমন্ত জাতি একবারে জেগে উঠলো–যেন সুপ্ত ফসিলে প্রাণ পেল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আগড়তলা ষড়যন্ত্রে বন্দী করার দুর্বিপাকে, জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রবল বিদ্রোহে। তখন সভায় মিছিলে, অনুষ্ঠানে গণসংগীত পরিবেশনা, প্রচারণা ও রচনার মুখরতা লক্ষ করা যায়। এসময়ের উত্তাল দিনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে গণসংগীতশিল্পী ফকির আলমগীর বলেন–

"১৯৬৯ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারির কথা। পল্টনের বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা করলেন–'প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙ্গে মুজিবকে মুক্ত করে আনবো'–সভাশেষে মওলানা আকস্মিকভাবে মঞ্চ থেকে নেমে জনতার সমুদ্রে মিশে গেলেন, মওলানার নেতৃত্বে চললো মিছিল রাজধানীতে। পুলিশ মিছিলে হামলা চালালো। 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো', 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো' ধ্বনিকে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে চলতে থাকে সর্বত্র গণআন্দোলন, জেল, জুলুম, নির্যাতন।"[৯৭]

গণ-অভ্যুত্থান কেবল আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের ছিল না, এমনকি বামপন্থী ন্যাপ, কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল নেতাকর্মীদেরই ছিল না। বাংলার সকল জনগণের বিপ্লব ছিল এবং সকলেই কমবেশি জেল–জুলুম–নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। আন্দোলনের সূত্রধরে গণসংগীতে আসে ভিন্নমাত্রার জোয়ার এবং প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল অনেকগুলো সংগঠন। ১৯৬২ থেকে '৬৭-এর মধ্যে যে সংগঠন সমূহের সৃষ্টি হয় তার সংখ্যাও কম নয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগঠন যেমন–১৯৬৭ সালে স্থাপিত হয় 'ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী', সভাপতি ছিলেন আলতাফ মাহমুদ। ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী' যার প্রধান ছিলেন সত্যেন সেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ এই চার বছরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভাটায় আবার জোয়ার এসেছিল ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। মূলত '৬২ থেকেই অভ্যুত্থানের সূত্রপাত। গণসংগীতের আগুনও একে একে জ্বলে উঠতে থাকে। আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান, নিজামুল হক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, কামাল লোহানীসহ অনেকেই প্রত্যক্ষ আন্দোলনে শপথ নেন। ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে এই বিপ্লবী জোয়ারের মধ্যে বেশ কিছু গান খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। তন্মধ্যে সিকান্দার আবু জাফরের লেখা ও শেখ লুতফর রহমানের সুর করা–

'জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
হতমানে অপমানে নয় সুখ সম্মানে

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই ।'

গানটি ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রথম গীত হলে উভয় বাংলায় জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। দীর্ঘ এই গানের বক্তব্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছিল বাঙালির অধিকারের ভাষা, অন্যদিকে গণসংগীতের পরিভাষায় নতুনত্বের অবস্থানের রূপরেখা। ১৯৬৬-৬৭ সালের দিকে সত্যেন সেনের লেখা ও শেখ লুতফরের সুরে একটি গান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। গানটি হলো–

'এই আগুন নিভাইবো কে রে
এ আগুন নেভে নেভে নেভে না
এ আগুন জ্বলে দ্বিগুণ জ্বলবে দ্বিগুণ
চাপা দিলেও নিভবে না ।'

'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ও স্বাধিকার আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল কবি আবুবকর সিদ্দিকের লেখা গান। শেখ লুতফর রহমানের এবং সাধন সরকারের সুরে গানগুলো হাটে-মাঠে-কলে-কারখানায়, সভা-মিছিলে গীত হতো। নিম্নরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গানের স্তবক তুলে ধরা হলো–

শেখ লুতফর রহমানের সুরে–

'বিপ্লবেরই রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে
সর্বহারা জনতার জিন্দাবাদ বাতাসে
একটি কণ্ঠ– কণ্ঠ একটি
যদি থামো–থামে যদি
গর্জে শত–শত গর্জে
নিরবধি নিরবধি
কল্লোলিতা মহানদী
যুগে যুগে দেশের
জ্বলে আগুন হুতাশে॥'

অথবা– 'মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা
চায় কি হে রক্ত হে
জোঁকগুলো সব রক্ত চাটা
ভক্ত হে ভক্ত হে ।'

কিংবা– 'পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে
শান্তির পতাকা অজগর নিঃশ্বাসে টলছে ।
বুলেটের ডানা বেঁধা পাখনায়
পারাবত ওড়ে শুধু নিলীমায়
দুশমনী পাঞ্জায় প্রাণ যায়

Dhaka University Institutional Repository

পতাকার পদাতিক পথ কেটে কেটে চলছে॥'

সাধন সরকারের সুরে–

'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জান কি
বাংলার গাছে গাছে বিদ্রোহ জ্বলন্ত তুমি জান কি॥'

এবং– 'বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল
পাকে পাকে তড়পায় সমকাল॥'

কবি আবুবকর সিদ্দিক সাধন দাসের সুরারোপিত গণসংগীতের মধ্যে চারশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে গণ-আন্দোলনের জন্য যে গানগুলোর উল্লেখ করেন তা হলো–"ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল', ড্রাগনের বহ্নিবিষ হঙ্কায়', 'আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক', 'ঐ দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো', 'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম জ্বলন্ত-জানো কি', 'আমাদের সংগ্রাম চলবে–থামবে না', 'সংগ্রাম সংগ্রাম', 'বাংলার মাটি অতি দুর্জয় বীর্জের সন্তান সেনানীতে পূর্ণ', 'চাই চাই চাই চাই রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'শোনেন শোনেন ভাইগণে', হোই আইনুল ভাই কই গেলিরে' ইত্যাদি"[৯৮]

সাধন দাসের কথা ও সুরে একটি গান প্রথম কাতারে ছিল সবসময়, গানটি সম্পর্কে কামাল লোহানী তাঁর এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন–

"বাংলার কমরেড বন্ধু
এই বার তুলে নাও হাতিয়ার
ভূমিহীন কৃষক আর মজদুর
গণযুদ্ধের ডাক এসেছে।

এইগানের মধ্যে বাংলার স্বাধীনতার ঘোষণা আসলে লুকিয়ে ছিল। একজন অখ্যাত লেখকের বলে হয়তো গানটি তার প্রকৃত সম্মান পায়নি। কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতার আহবান এখানে সুগভীর প্রত্যয়ে ধ্বনিত হয়েছে নির্দ্বিধায়।"[৯৯]

খ্যাতিমান গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের একটি গান ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকে লেখা। সে সময় যে সর্বস্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ মুক্তির আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলো তার প্রমাণ এই গান–

'রক্ত শুধু রক্ত
রক্ত ছড়িয়ে আছে
রাজপথে ঘাটে আজি রে।'

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশ গুলি বর্ষণ করে অভ্যুত্থান ঠেকাতে গিয়ে উল্টো চরম জনরোষের শিকার হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ, কিছুদিন পরই ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করে তারা। হত্যার প্রতিবাদে বাংলার মানুষ এক হয়ে জেগে ওঠে, স্বৈরাচারী সরকারকে গদিচ্যুত করার অভিপ্রায়ে সকল মানুষ মাঠে নেমে আসে। বিশিষ্ট গণশিল্পী নিজামুল হক তখন একটি গান লিখেছিলেন–

'আসাদ জোহা আর যত শহীদের
রক্তে নিশান দেখেছি

Dhaka University Institutional Repository

তাইতো মোরা সব কিছু ভুলে
এক মিছিলে মিলেছি ।'

বিশিষ্ট সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের একটি গান গণ-অভ্যুত্থানের সময় লিখিত হয় । আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত গানটি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিসেনাদের মাঝে উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল । গানটি হল–

'আমরা পূবে পশ্চিমে
আকাশে বিদ্যুতে
উত্তরে দক্ষিণে হাসিতে সংগীতে
নদীর কলতানে আমরা
সাগরের গর্জনে চলি অবিরাম
অগ্নি আখরে লিখি মোদের নাম ।'

ফজলে লোহানীর রচিত আরেকটি গান সুর করেছিলেন খান আতাউর রহমান–

'শীতল পৃথিবী অবশ নগর
অসার আকাশ বাতাস নিথর
জীবনের রেণু কণা যত
পলাশ ফুলের ডগায় একুশে বিকেল ।'

সুখেন্দু চক্রবর্তীর লেখা ছয় দফার উপর ভিত্তি করে–

'ডিম পাড়ে হাসে খায় বাঘডাসে
শুনছনি ভাই শুনছনি ।'

শেখ লুতফর রহমানের সুরারোপিত বেশ কিছু গান সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা থেকে নেয়া । 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ/ কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে', 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' উল্লেখযোগ্য । ৫০'র দশকে আরো বেশকিছু আলোচিত কবিগীতিকারের নাম হলো–মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, জিয়া হায়দার, আহসান হাবিব প্রমুখ । মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের–'তারা এদেশের সবুজ ধানের শীষে', 'শহীদ মিনার ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে'; আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা–'ওরা ভেবেছিল লুট করে নেব', 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে যেদিন বর্ণমালা' গানগুলো ভাষা-শহীদদের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও গণ-মানুষের আন্দোলনের প্রাণ ছিল । গণ-অভ্যুত্থানের উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে তিনি একটি রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেন 'আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালবাসি,/ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস/ আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি' । সে সময়ে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল গানটি । যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের মর্যাদায় উন্নীত করা হয় ।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান যদিও আইয়ুব শাহীর ক্ষমতা বিচ্যুত করার আন্দোলন ছিল । তা উভয় পাকিস্তানের প্রধান আন্দোলনে রূপ নেয় । কিন্তু বাঙালির মধ্যে এই আন্দোলনের মধ্যে সুপ্ত ছিল স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা । আইয়ুব খানের পতনের পর যখন ইয়াহিয়ার দুঃশাসন শুরু হলো, বাঙালির বাঁধ

Dhaka University Institutional Repository

তখন ভেঙে গেছে। বাঙালির ভাষা অধিকার, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকারে রূপান্তরিত হয়। তাই গণ অভ্যুত্থানের গানগুলো স্বাধিকার আন্দোলনে প্রয়োগ হয় ব্যাপক ভাবে। তৎকালীন জনমানুষের স্পৃহা ও মর্মবিদারক অনুভূতির জন্ম দিতে এইসব গানের বিকল্প ছিল না। এই সময়ের গানগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অতিমাত্রার রক্ত, ক্রোধ, যুদ্ধ, পাঁজর, আগুন ইত্যাদি শব্দগুলো বেশি বেশি আসতে থাকে। বদলে যায় ভাষার আঙ্গিক। মুক্তির শ্লোগানের থেকে বন্দিত্ব, হত্যা, জুলুম, শংসয়ই বিরাজ করতো এসময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মধ্যেই সেই স্পষ্টতা লক্ষ করা গিয়েছিল। তাঁর উদাত্ত আহ্বান 'তোমাদের ঘরে ঘরে যা আছে, তাই নিয়ে নেমে পড়ো। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' এমন ঝাঁঝালো ভাষণের তেজে বাংলার সাধারণ মানুষ নির্দিধায়, বিনা প্রশিক্ষণে যুদ্ধকরতে রাস্তায় নেমে আসে। তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের ডকুমেন্টারি ভিত্তিক ছবি দেখলেই বোঝা যায়, গান মানুষকে কতোটা শ্রেণী জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

তবে স্বাধিকার আন্দোলনেও বেশ কিছু গানের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যেমন মুস্তাফিজুর রহমানের লেখা ও আবদুল আজিজ বাচ্চুর সুরারোপিত একটি গান স্বাধিকার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত–

'জনপথ প্রান্তরে সাগরে বন্দরে শুনি হুংকার
চাই স্বাধীকার স্বাধীকার স্বাধীকার
আজ চৌচির কর যত ভীরুতার জঞ্জাল
বজ্র শপথে পথ চলো
শত্রুর বুকে হানো তরবারী শতবার
তুচ্ছ বাধাকে পায়ে দলো
জীবনের মানে হোক নির্ভয় সংগ্রাম
করতেই হবে সব সংহার॥'

স্বাধিকারের গান বলতে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। যা স্বাধীনতা ও পরবর্তিকালীন সময়ের অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। বাঙালির জীবনের এত ত্যাগ ও অধিকার হরণের এত যাতনা দেখে বোঝা যায় তাদের কলম ও কণ্ঠ থেকে এমন তেজস্বী কথা কেন বেরিয়ে এসেছিল। এই গানগুলোর মূল্যায়নে সংগীতের পরিভাষাগত অবস্থান থেকে নান্দনিক বিশ্লেষণ করা দুরুহ, অবান্তরও। গণসংগীত সময়ে কতটা প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এটাই, ফলে রাজনৈতিক গান বললেও অত্যুক্তি হয় না, অর্থাৎ মুক্তির জন্যই এই গান, যার বিকল্পও ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বিষয়

উপর্যুক্ত আলোচনায় গণসংগীতের বিষয়গত বৈচিত্র্য নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে উঠে এসেছে সংগীতের একটি ঐশ্বর্যময় বাস্তবতা। অবশ্য গবেষণার উপাত্ত, তথ্য, সংগ্রহ ও বিষয়বোধকে নির্বাচন করতে গিয়ে এমন আরো অসংখ্য বিষয়ের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা বিশ্লেষণ করে শেষ করা সময়সাপেক্ষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরালোচনার কারণ হ'তে পারে। তাই প্রধান কিছু ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক প্রবণতার উপর ভিত্তি করে বিষয় বিভাজন করা হয়েছে। এর বাইরে আরো যে যে বিষয় বিশ্লেষণ করা সম্ভব হতো তা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় মনোনিবেশ করার মত এমনকি সম্মিলিত গবেষণার প্রয়োজন রাখে। বিষয়ের ব্যাপকতাকে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরে বিশ্লেষণ করা দুরুহ। তবে অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে পরিচিতিমূলক আলোচনা করে এই অধ্যায়ের ইতি টানা হলো। অবশ্য এও বলে রাখা প্রয়োজন, অনেক গানই আছে যা বিভিন্ন বিষয় বা শাখায় বিশ্লেষণ হওয়ার যোগ্য, অনেক গান পুনর্বিশ্লেষণও করা হয়েছে। আরো যে যে বিষয় গানের বক্তব্য, রচনার প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক তাৎপর্য, সময়ের প্রতিনিধিত্বের বিচারে বিশ্লেষণযোগ্য তেমন কিছু বিষয় নিম্নরূপ তুলে ধরা হলো। যেমন– দেশ-বিভাগের গান, সাম্যবাদের গান, জনযুদ্ধের গান, ম্যালেরিয়া মহামারী নিয়ে গান, বন্যা-দুর্যোগ নিয়ে গান, ভাঙা গান, প্যরোডি গান, জারি গান, জমিদার বিরোধী গান, দেশ মাটি ও মাতৃভূমির গান, অনুবাদ গান, নাটকের গান, ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক গান, আঞ্চলিক গণসংগীত, কবিতা সুরারোপিত গণসংগীত প্রভৃতি। নিম্নরূপ সংক্ষিপ্তাকারে বিশ্লেষণ করা হলো–

দেশ-বিভাগ নিয়ে গান

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার চলে যাওয়ার সময় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়ে যায়। ভারতে যেহেতু অসংখ্য জাতি-উপজাতি এবং ভাষা গোষ্ঠীর বাস। ফলে দেশ খণ্ডিতকরণ হলো জাতি বা ভাষা গোষ্ঠীর বুকের উপর কুঠারাঘাত করে। পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি এমন অনেক জাতির ন্যায় বাঙালি জাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, দর্শন-শিক্ষা সংগীত ও সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সহস্র বছরের ভূমি, মাটি ও মানুষের হৃদয়ের উপর উঠে গেল প্রাচীর। এ বড়ো মর্মান্তিক–বড়ো হাহাকারময়, তাই উভয় বাংলা থেকেই ভাই হারানোর বেদনার মতো রচিত হয়েছে সাহিত্য-কবিতা ও গান। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই ভাইয়ের উপমা দিয়েছেন দুটি চোখের তারার ন্যায়। লিখেছেন–

'আমরা যেন
বাংলাদেশের চোখের দু'টি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা
এপারে যে বাংলাদেশ
ওপারেও সেই বাংলা॥'

Dhaka University Institutional Repository

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও ভূপেন হাজারিকার সুরে যে গানটি বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের কাছে অতি জনপ্রিয় । সেখানে আছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রবাহিত নদী-মাতার উপর এদেশের সকলের অধিকার । সাময়িক দুর্বৃত্তকারীদের কবলে পড়ে আজ তা বিভক্ত । গানটি হলো–

'গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
তার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা ।

একই আকাশ একই বাতাস
এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস
দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে
একই মূর্ছনা ।

এপার ওপার কোন পারে জানি না
ও আমি সব খানেতে আছি
গাঙের জলে ভাসিয়ে ডিঙা
আমি পদ্মাতে হই মাঝি,
শঙ্খচিলের ভাসিয়ে ডানা
আমি দুই নদীতে নাচি ।

একই আশা ভালবাসা
কান্নাহাসির একই ভাষা
দুঃখ-সুখের বুকের মাঝে
একই যন্ত্রণা ॥'

একই লেখক ও সুরকারের আরেকটি গান হলো–

'তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা
মেকং ভল্গা ঘুরে গঙ্গার স্রোত ধরে
পেয়েছি চলার নিশানা ।'

দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে অসংখ্য গান স্বদেশী আমলেই লেখা হয়েছে সেইগানগুলো গণসংগীতের আসরে অসংখ্যবার গীত হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে প্রতিরোধ আন্দোলন করা হয়েছে, উপরোক্ত গান তারই উত্তর ফসল ।

সাম্যবাদের গান

গণসংগীতের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য গান । তবে তারমধ্যে বেশ কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায় যা সরাসরি 'সাম্যবাদ' নিয়ে কথা বলা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যেই রয়েছে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা। গণসংগীতের মধ্যে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে গাওয়া একটি গান উভয় বাংলায় বেশ জনপ্রিয়। মানুষের মুখোশকে উন্মোচিত করে দেয়া গান এই গানটি উভয় বাংলায় সমান ভাবে জনপ্রিয়–

'মানুষ মানুষের জন্য
জীবন জীবনের জন্য
একটু সহানুভূতি কি
মানুষ পেতে পারে না.. ও বন্ধু?

মানুষ মানুষকে পণ্য করে
মানুষ মানুষকে জীবিকা করে
পুরোনো ইতিহাস ফিরে এলে
লজ্জা কি তুমি পাবে না...ও বন্ধু।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও অনুপ মুখোপাধ্যায়ের সুরে–

'ভাই আমাকে বকুক ঝকুক
দিক গে যতই খোঁটা
জমের দুয়োরে দিচ্ছি কাঁটা,
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা॥'

ইসলামউদ্দীনের কথা ও সুরে–

'হিন্দু এসো মন্দিরে যাই
জুড়ি দুই হাত
মুসলিম চলো মসজিদে যাই
করি এই মোনাজাত।'

এছাড়াও বাংলার বাউলগান, মরমীগানসহ নানা লোকসংগীতের উপাদানে রয়েছে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অজস্র উদাহরণ।

ম্যালেরিয়া মহামারী নিয়ে গান

গণসংগীতের সাধারণ সংজ্ঞা যেভাবেই দেয়া হোক। সমাজের নানা সংকট নিয়েই লেখা হয়েছে, এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। ম্যালেরিয়া, মহামারী, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস জাতীয় বিভিন্ন প্রসঙ্গ গণসংগীতে উপর্যুক্ত উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। বানিয়াচঙে একবার ভয়াবহ ম্যালেরিয়া এবং মহামারি দেখা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে দশহাজার লোক মৃত্যু বরণ করে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তখন ভাটের সুরে লিখলেন–

'বানিয়াচুঙের প্রাণবিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী
হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের সেরা গ্রাম হাজার লোকের ধাম
তাহার আজ কি পরিণাম দুঃখে মরি হায় ।'

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'-এর একটি অংশে ম্যালেরিয়ার বর্ণনা রয়েছে– সাতাশতম পর্বে তৃতীয় দল এসে ম্যালেরিয়ার ঘটনা বর্ণনা করে এক নাটকীয় চরিত্রের মতো । গানটি হলো–

'দেখ্‌ছ কি সবই উজাড় হোলো ।
(আহা) ম্যালেরিয়ায় দেশ ছাইল
(আহা) মহারোগে দেশ ছাইল
দেখছ কি সব উজাড় হোলো ।
এককালে সব ঘরে ঘরে
ছিল প্রাণের হাসি
এখন ঘরের লোককে চিতায় তুলে
হলেম শ্মশানবাসী ।
ভেঙে গেল সোনার হাটে প্রাণের মেলা দেখছ কি
দেখছ কি সবই উজাড় হোলো॥'

ভাঙাগান

ভাঙাগান বলতে মূলগানের সুর কিংবা ভাবকে অনুসরণ করে লেখা নতুন গান । এক অর্থে গণসংগীতে ভাঙাগানের পরিমাণ মূলগান থেকেও বেশি । কারণ গণসংগীত কোনো নিজস্ব আঙ্গিক বা রূপ-কাঠামোয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় বরং বিভিন্ন গানের প্রভাবেই এর সমৃদ্ধি । তবে কিছু গান আছে যা সরাসরি ভাবকে বা সুরকে অথবা ভাব-সুর উভয়কে অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছে । হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অধিকাংশ গানই ভাঙাগানের পর্যায়ে পড়ে । নিম্নরূপ কয়েকটি উদাহরণ প্রয়োগ করা হলো–

মুলগান : কুইনা নামে এক দোতারা বাদক সিলেটে পরিবেশন করেছিলেন–

'দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গে
দুঃখহরা নাম তোমার,
কি দুর্গতি ঘটালে এবার ।'

ভাঙাগান লিখলেন– : ভাটিয়ালি সুর এবং কবিগানের প্রভাবাশ্রিত গানটি অনুকরণে হেমাঙ্গ বিশ্বাস

'ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে গো
মাগো পুড়ে পুড়ে হলেম ছাই,
আমি কূল ছাড়িলাম, মান বেচিলাম
তবু দুঃখের অন্ত নাই॥'

মুলগান : হোলির প্রচলিত গান–

'আজ হোলি খেলব রে শ্যাম
তোমারি সনে শ্যাম রে
একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম

Dhaka University Institutional Repository

এই নিধু বনে'

ভাঙাগান : 'বাঁচব বাঁচবরে আমরা বাঁচব রে বাঁচব
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়বো ।'

মুলগান : পল রোবসনের লেখা গাওয়া বিখ্যাত গান–
'An old man River..' গানটির অবলম্বনে

ভাঙাগান : 'বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের
হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন ।'

মূলগান : কবিয়াল রমেশ শীলের লেখা–
'আমি বাংলা ভালবাসি
আমি বাংলার বাংলা আমার
ওতপ্রোত মেশামেশি ।'

ভাঙাগান : প্রতুল মুখোপাধ্যায় লিখলেন–
'আমি বাংলায় গান গাই
আমি আমার আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই ।'

এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আর সুরের ক্ষেত্রে গণসংগীতের প্রধান সুরকারগণ হয় দেশী লোকসুর না হয় বিদেশীসুরের আশ্রয়েই গ'ড়ে তুলেছেন একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ।

প্যারোডি গান

প্যারোডি গান হলো কোনো বিখ্যাত গানের ছন্দ-তাল অনুসরণ করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে শ্লেষাত্মক অঙ্গের পরিবেশনা। চারিত্রিক বিবেচনায় যাকে গণসংগীত বোঝায়, অর্থাৎ সময়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত হাতিয়ারের ন্যায় কাজ করে যে গান, তা সময়ের ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে নিভে যায়–এমন গণসংগীতের সংখ্যা অজস্র কিন্তু তা হারিয়ে গেছে কালের হাওয়ায়। সংরক্ষিত হয় নি, প্রয়োজনবোধও করে নি কেউ। বলা যায় গণসংগীতের অধিকাংশই প্যারোডি, তন্মধ্যে ভোটের গান অন্যতম। প্যারোডি গান ক্ষণস্থায়ী হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে; তারমধ্যেও দু'একটি গান দীর্ঘদিন চর্চিত হয়েছে, যেমন–

গ্রামীণ জনপ্রিয় লোকসংগীত 'আল্লা ম্যাগ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লা ম্যাগ দে' এই গানের প্যারোডি রচনা করেন আবদুল করিম। তাহলো–

'আল্লা ভাত দে কাপড় দে বাঁচতে দেরে তুই আল্লা ভাত দে
এই আকাশের নিচে যে জমিন জমির মালিক কারা,
ওরে সেই জামিতে ফসল ফলাই আমরা সর্বহারা
আল্লা ভাত দে....'

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট গণশিল্পী শেখ লুতফর রহমান পাকিস্তানের চণ্ডনীতির সময় বিভিন্ন মহলে এই গানটি পরিবেশন করে ভীষণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

জারিগান

গণসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু জারিগান এমন এক ধরণ, যা গণসংগীতের মতো ছোট নয়। জারি দীর্ঘ শ্রেণীর গান। যা ইসলামের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক চরিত্রের বর্ণনার এক লৌকিক ধারা। জারি নড়াইল, ফরিদপুর, যশোর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সমৃদ্ধধারা। বেশ কয়েকজন জারি গায়ক এবং গণসংগীত শিল্পীরাও জারির ন্যায় গণসংগীত রচনা করেছেন। আবদুল লতিফ, নিবারণ পণ্ডিত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাদের মধ্যে অন্যতম। (সুরবৈশিষ্ট্যে জারিগান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)

দেশ-মাটি ও মাতৃভূমির গান

গণসংগীতে দেশাত্মবোধক গান একটি ঐশ্বর্যের বস্তুতে পরিণত করেছে। দেশাত্মবোধক গানের ধারা শুরু হয় প্রায় দেড়শ' বছর আগে থেকে। প্রাথমিক কালে দেশাত্মবোধক গানে রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকলেও পার্টিলাইনের নির্দেশে কিংবা বিশেষ কোনো আদর্শে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয় নি। গণসংগীতের আমল থেকে একটি রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশাত্মবোধক গানকে প্রতিষ্ঠিত করেন বাংলা গানের অন্যতম ৫ পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম। যে গানগুলো দেশ-মাটি ও মাতৃভূমি বিষয়ক বলে বিভিন্ন সময়ে গীত হয়েছে তার অধিকাংশই পঞ্চগীতিকারেরই রচনা। গণসংগীত শিল্পীদের মধ্যে যে গানগুলো উল্লেখযোগ্য তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো–

ক্রম	গানের শিরোনাম	লেখক	সুরকার	মন্তব্য
১	আমি বাংলা ভালবাসি	রমেশ শীল	রমেশ শীল	
২	মোরা মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই	রমেশ শীল	রমেশ শীল	
৩	মরি হায় বাংলাদেশে বসতি আমার বাস	রমেশ শীল	রমেশ শীল	
৪	পদ্মা কও কও আমারে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	
৫	এই মাটির এই ধূলি কণায়	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	
৬	ও মোদের দেশবাসী রে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
৭	ধন্য আমি জন্মেছি মা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
৮	কোন এক গাঁয়ের বধূর	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
৯	মুক্তির মন্দির সোপান তলে	মোহিনী চৌধুরী	কৃষ্ণচন্দ্র দে	
১০	আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের দুটি তারা	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	কল্যাণ ঘোষ	
১১	গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ভূপেন হাজারিকা	
১২	এই দেশ ছিল দেশের সেরা	নিবারণ পণ্ডিত	নিবারণ পণ্ডিত	
১৩	আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	

Dhaka University Institutional Repository

১৪	সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আবদুল লতিফ	আবদুল লতিফ	
১৫	আমার দেশের মাটির গন্ধে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	
১৬	হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে	শ্যামল গুপ্ত	অপরেশ লাহিড়ী	
১৭	ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে	জসীম উদ্‌দীন	জসীম উদ্‌দীন	

অনুবাদী গান

অধিকাংশ অনুবাদী গানই বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বলে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত বিভাগ করা হয় নি। তবে বাংলাগানের জগতে অনুবাদী গানের ভূমিকা যতটা রয়েছে, আর কোনো শাখায় এতটা উল্লেখযোগ্য হারে দেখা যায় না। অনুবাদ করা গানের সেতুবন্ধনে বাংলা গান একদিকে যেমন বিশ্বের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাথে একই মিছিলের অংশিদার হ'তে পেরেছে অন্যদিকে বাংলাগান নিজেও অনেকটা সমৃদ্ধ হয়েছে। গণসংগীতের উত্তাল সময়ে মৌলিক গান বেশি হলেও পঞ্চাশের পর থেকে সত্তর পর্যন্ত কিছুটা স্থিমিত হয়ে যায়। ক্রান্তিকালের এই সময়কে অনেকে অবক্ষয় বলে মনে করেছেন। গণশিল্পীরাও এই সময়ে খুব হতাশ হয়ে পড়েন, কেউ কেউ অন্য পথে পা বাড়ান, কেউ দেশান্তরী হন। তখন কয়েকজন নিবেদিত শিল্পী বিদেশী বিখ্যাত গানগুলোকে বাংলা অনুবাদে হাত দেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এছাড়াও যারা গানের অনুবাদে বেশ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় নন্দী, কনক মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেশ সেন, গীতা মুখোপাধ্যায়, অমর মুখোপাধ্যায়, সুনীত সেন, রাজা মিত্র, কমল সরকার, বোম্মানা বিশ্বনাথন, বিপুল চক্রবর্তী[১০০] প্রমুখ। নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য কিছু গানের উল্লেখ করা হলো–

ক্রম	গানের প্রথম কলি	মূল রচয়িতা	অনুবাদক	মন্তব্য
১	Where have all the flowers gone, Long time passing? অবলম্বনে 'ফুল গুলি কোথায় গেল'	পীট সিগার	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	ভিয়েতনাম যুদ্ধের গান
২	জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন বন্দী ক্রীতদাস	ইউজিন পোতিয়ের সুর: পিয়ের দেগতার	মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রথম আন্তর্জাতিক গান
৩	'Comrade Lenin of Russia' গানটি অবলম্বনে–'রুশ দেশের কমরেড লেনিন'	ল্যাংস্টন হিউজেস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	লেনিন স্মরণে রচিত
৪	জেনারেল জেনারেল, তোমার ঐ ট্যাঙ্কটা জব্বর গাড়ী বটে	বের্টোল্ড ব্রেখট	বিষ্ণু দে সুর: সুনীল মুখোপাধ্যায়	যুদ্ধে পরাজিত ফ্যাসিবাদী সৈনিকের উদ্দেশ্যে
৫	ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান	কর্ণেল আলেকজান্দ্রীভ	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	অক্টোবর বিপ্লবের গান
৬	নাম তার ছিল জন হেনরি	পীট সীগারের গাওয়া আমেরিকান প্রচলিত লোকসংগীত	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	গত শতাব্দীর আমেরিকান মহত্তম গীতিকা

Dhaka University Institutional Repository

৭	ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজি চারিদিকে	পোল্যান্ডে প্রচলিত লোকসংগীত	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ থেকে সৃষ্ট
৮	কি করে আদর জানাই কি সুরা যে পান করাই	তিব্বতী লোকসংগীত	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	মুক্তির গান
৯	আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের কবিতা 'I will over come-অবলম্বনে আমরা করবো জয় আমরা করবো জয় নিশ্চয়	কবিতাটি সংশোধন করে পীট সীগার গেয়েছেন 'We shall over come'	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	বিশ্বের সর্বাধিক ভাষায় অনুদিত গান
১০	আমরা চূর্ণ করেছি পাহাড়, টুকরো করেছি বোলডার	চেরাবান্দারাজু	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	
১১	সোনামণিরা বড় যখন হবে	এখেন রোজেনবার্গ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	
১২	দক্ষিণে নদীর ধারেই যত ধানের ক্ষেত	বের্টোল্ড ব্রেখট	উৎপল দত্ত সুর: শিবশঙ্কর ঘোষ	সমাধান নাটকের গান। চেতনা গোষ্ঠী
১৩	নদীর ধারের সহরে যাবে মাল	বের্টোল্ড ব্রেখট	উৎপল দত্ত সুর: শঙ্কর ঘটক	সমাধান নাটকের গান। চেতনা গোষ্ঠী
১৪	তোমার আছে বন্দুক আর আমার আছে ক্ষুধা	অতো রেনে কাস্তিইয়ো	মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	সুর: প্রতুল মুখোপাধ্যায়
১৫	কমরেড এসো, দলে এসো	বের্টোল্ড ব্রেখট	সমরেশ বন্দোপাধ্যায়	সুর: হানস আইসলার
১৬	আমাদের কণ্ঠে বিজয়ের মাল্য	ড. নক্রুমা	গীতা মুখোপাধ্যায়	সুর: দিলীপ সেনগুপ্ত
১৭	আমাদের যেতে হবে দূরে বহুদূরে	চেরাবাণ্ডরাজু	প্রদীপ গোস্বামী	সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়
১৮	ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন	নাজিম হিকমত	কমল সরকার	রোবসনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত
১৯	কমিউনিস্ট আমরা, আমরা কমিউনিস্ট	সুব্বারাও পানিগ্রাহী	বোম্মানা বিশ্বনাথন	
২০	কামারশালায় লেগেছে আগুন	চেরাবান্দারাজু	বিপুল চক্রবর্তী	সুর : প্রতুল মুখোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ গণসংগীতের মধ্যে প্রধানত দুইটি ধারা লক্ষ করা যায়: ১. নাগরিক শিল্পীদের গণমুখী শিল্পতৎপরতা; ২. গ্রামীণ গায়ক, শিল্পী, লোকসঙ্গীতের রচয়িতা, যারা সাম্রাজ্যবাদী অপসংস্কৃতি বিরোধী নতুন লোকশিল্পরীতির স্রষ্টা । এদের মধ্যে ধরা যায় রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, শেখ গুমানী প্রমুখ । আর প্রথম ধারার মধ্যে বিচার্য বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র, যুবক, কবি-গীতিকার, যেমন–জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হরিপদ কুশারী, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, পরেশ ধর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখ ।

২ 'বাংলার কৃষক বিদ্রোহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও সনের উল্লেখ করছি সুপ্রকাশ রায় লিখিত তথ্য থেকে । 'অষ্টাদশ শতাব্দী–সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), সন্দ্বীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক তন্তুবায়গণের সংগ্রাম (১৭০০-১৮০০), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৯-'৮৭), নীলচাষীদের সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০০), মালঙ্গীদের সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০৪), রেশম চাষীদের সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), যশোর খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-১৭৯৬), বীরভূমের গণবিদ্রোহ (১৭৮৫-৮৬), বীরভূম-বাঁকুড়ার পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-'৯১), বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া বিদ্রোহ (১৭৮২), দ্বিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-'৯৯) । উনবিংশ শতাব্দী – ময়মনসিংহের গারো জাগরণ, মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-'১৬), ময়মনসিংহ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), সন্দ্বীপের তৃতীয় বিদ্রোহ (১৮১৯), ময়মনসিংহের হাতিখেদা বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের প্রথম পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-'২৭) নীলচাষীদের সংগ্রাম (১৮৩০-'৪৮), বাংলার ওহাবী বিদ্রোহ, দ্বিতীয় পাগলাপন্থী (গারো) বিদ্রোহ (১৮৩২-'৩৩), ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২), ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-'৪৭), ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-'৯০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-'৫৭), ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-'৬১), সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহ (১৮৬১), সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ (১৮৭০), সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ (১৮৭২-'৭৩), যশোরের নীল বিদ্রোহ (১৮৮৯)'

আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, পড়ুয়া, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৩০

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪ হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন–'কবি জয়নাথ নন্দী, সম্পর্কে আমার দাদু, কবিয়াল হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । তাঁর একটি কবিদলও ছিল । তিনি ছিলেন রীতিমত কৃষি বিশেষজ্ঞ । তাঁর ফলানো গোল আলু সারা সিলেটের কৃষি প্রদর্শনীতে প্রথম হয়েছিল । তদানীন্তন আসাম গভর্নর বিটসন বেল প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন, এবং জয়নাথ নন্দীকে এই কৃতিত্বের জন্য 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন ।'

হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, মৈনাক বিশ্বাস সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ১৫-১৬

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৭ খগেশ কিরণ তালুকদার, *নিবারণ পণ্ডিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৩১

৮ নিবারণ পণ্ডিত, *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা*, দিবজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৩, কলকাতা, মে ১৯৯৭, পৃ. ২৬

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০ ফকির আলমগীর, *গণসংগীতের অতীত ও বর্তমান*, অনন্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৬

১১ স্বপন দাসাধিকারী (সম্পাদিত) *জলার্ক, যুদ্ধজয়ের গান*, কলকাতা, ২রা জুন ১৯৯৭ পৃ. ৭৪৭

১২ এই গ্রন্থের কবিগানের বিষয় আলোচনায় বিংশ শতাব্দীর পূর্বকালের অবস্থা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নষ্টপরমায়ূ' বিষয়ক সমালোচনার বিতর্ক তুলে ধরেছেন । ঠিকতার পরেই যে কবিগানের আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে কৃষক ও কৃষি সম্পর্কেও দেখিয়েছেন উদাহরণ ।

দীপক বিশ্বাস, *কবিগান*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৩

১৩ কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৩৯

১৪ কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকছড়া । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চট্টগ্রামে বোমা ফেলার জন্য রাজনৈতিক আদর্শের লোকেরা জাপান বিরোধী শ্লোগানে মত্ত ছিল । কারণ জাপান ছিল ফ্যাসিবাদের দোসর । ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক দলের আদর্শ ছিল ফ্যাসিস্ট বিরোধী অভিযান । কিন্তু গ্রামীণ জনপদের উপলব্ধি ছিল আরো তাৎপর্য বহুল । ফ্যাসিস্ট জাপান বাংলাদেশ আক্রমণ করলেও তা ছিল মূলত ব্রিটিশ উপরাষ্ট্রকেই আক্রমণ । আর ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে তাদের আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল । অতি জনশ্রুত এই প্রবাদটি সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থানকে তাৎপর্যবহুল করে তোলে ।

১৫ Victor Lidio Jara Martinez (1932-1973) was a Chilean teacher, theatre director, poet, singer-songwriter, and political activist. Simultaneously he developed in the field of music and played a pivotal role among neo-folkloric artists who established the *Nueva Canción Chilena* (New Chilean Song) movement which led to a revolution in the popular music of his country under the Salvador Allende government. Shortly after the U.S. backed, September 11, 1973 Chilean coup he was arrested, tortured and ultimately machine gunned to death- his body was later thrown out into the street of a shanty town in Santiago.
Wikimedia Foundation. inc. en.wikipedia.org/wiki/Victor_Jara.

১৬ Ralph Fox was born in Halifax in 1900. In 1920, he went to the most hard-hit famine area of the Soviet Union. Instead he joined the Communist Party. Instead of mellowing gradually into a Literary Editor he died at 36 fighting the forces of Fascism in Spain. Harold Laski has written, his death was, "a fulfilment. It was, for him, simply a necessary service to his ideal."
www.marxists.org/archive/pollitt/articles.

১৭ বঙ্গীয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' কলকাতায় স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই । এর ঢাকা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তিন বছর পর ১৯৩৯ সালে । পুরোনো ঢাকার দক্ষিণ মৈত্তিতে জোড়পুল লেনের 'প্রগতি পাঠাগার' ছিল সদস্যদের মিলন কেন্দ্র । সেখানে নিয়মিত জমায়েত হতেন সতীশ পাকড়াশী (১৮৯৩-১৯৭৩), সোমেন চন্দ (১৯২০-৪২), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-৯৭), কিরণশংকর সেনগুপ্ত (১৮৯১-১৯৪৯) প্রমুখ; কিছুদিন পর যোগদান করেন মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) ও সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-) ।
সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, প্রথম অনন্যা সংস্করণ : বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৫

১৮ কামাল লোহানী, *আমাদের সংস্কৃতি ও সংগ্রাম*, পৃ. ৩৬-৩৭

১৯ শামসুজ্জমান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ২২-২৩

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২১ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, পৃ. ৭৯-৮০

২২ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ১৭৪

২৩ মাহবুব হাসান (সম্পাদিত) *চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, শওকত ওসমানের লেখা প্রবন্ধ স্মৃতিখণ্ড : চট্টগ্রাম, স্মরণিক, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪৩

২৪ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, পৃ. ১৪১

২৫ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৮২

২৬ কো আন্তোনভা, গ্রি বোনগার্দ লেভিন, গ্রি কতোভ্স্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২, পৃ. ৬১১

২৭ শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২

২৮ সিরাজুল আবেদ খানের নেয়া সাক্ষাৎকার–'গণসংগীত থেকে রবীন্দ্র সংগীতে কলিম শরাফী', *ছুটির দিনে*, প্রথম আলো, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩,পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

২৯ ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহের অভীপ্সায় বাংলার গণনাট্য শিল্পীরা পাঞ্জাব ও পরে চুয়াল্লিশে 'ভয়েস অব বেঙ্গল' স্কোয়াড বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করে। ৪৩-এ রচিত এই গানটি পাঞ্জাব স্কোয়াড উপলক্ষ্যে রচিত।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়, *গণনাট্য সংঘের গান*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা ২০০২, পৃ. ২৬

৩০ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, পৃ. ৮০

৩১ আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখ রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ১৮২

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-৮৩

৩৩ অধ্যাপক মুহম্মদ মহসীন, *জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ*, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৯, পৃ. ৩২

৩৪ শরীফ আতিক উজ্-জামান, *নিবারণ পণ্ডিত*, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১২

৩৫ এই গান সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে যে গানটি ১৯২৬ সালের দাঙ্গায় রচিত। সূত্র শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ রচিত গণসংগীত গ্রন্থের অভিমত। ১৯২৬ সালে দাঙ্গা হয়েছিল একথা সত্য কিন্তু গানটি কত সালে রচিত এনিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকেই যায়, লেখার সনের তথ্য উল্লেখ না থাকার কারণে।

৩৬ শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়, *দাঙ্গার ইতিহাস*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ৫৩

৩৭ সনজীদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রায়*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪১ হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৫

৪২ মুস্তাফা কামাল, *ভাষা আন্দোলনের ডায়েরী*, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১২

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৪ আবু মোহাম্মদ মোতাহার, *বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রথম প্রস্তাবক–নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী*, ইত্তেফাক, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

৪৫ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড)*, ঢাকা, পৃ. ২০-২১

৪৬ রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সেড, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৩

৪৭ শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২

৪৮ রফিকুল ইসলাম তার 'বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন' গ্রন্থে জিন্নাহর ভাষণ সম্পর্কে এভাবে তথ্য দিয়েছেন– '...এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হচ্ছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়। যদি আপনাদের কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সে হবে পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ছাড়া, কোনো জাতিই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও টিকে থাকতে পারে না। ...সুতরাং রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ১১

৪৯ শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, পৃ. ৩২

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫২ ২২শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদে প্রকাশিত সংবাদে মোট ১৭ জন আহত হওয়ার তালিকা প্রকাশিত হয়। 'তাঁরা হলেন ১। আনোয়ার এছলাম (২৪); ২। এ আর ফৈয়াজ (১৯); ৩। সিরাজুদ্দিন খান (২২); ৪। আবদুস সালাম (২৭); ৫। এম এ মোতালেব (১৪); ৬। এলাহী বকশ (৪০); ৭। মুনসুর আলী (১৬); ৮। বছির উদ্দিন আহমেদ (১৬); ৯। আহজুল এছলাম (১৯); ১০। মাসুদুর রহমান (১৬); ১১। আবদুস সালাম (২২); ১২। আখতারুজ্জামান; ১৩। এ রাজ্জাক (১৭); ১৪। মোজাম্মেল হক (২৩); ১৫। সুলতান আহমদ (১৮); ১৬। এ রশিদ (১৪); ও ১৭। মোহাম্মদ।'

৫৩ নূরুল ইসলাম, *সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯০, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৪ রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, পৃ. ১২৮

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৫৬ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষার ও দেশের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১৯৮

৫৭ গানগুলো আবদুল লতিফের 'ভাষার গান দেশের গান' গ্রন্থ থেকে নেয়া। রচয়িতা এই গানছাড়াও আরো অনেকগান আছে। তিনি ২৫টির অধিক ভাষার গান রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আরো অনেক গান পাণ্ডুলিপি সহ হারিয়ে যায় বলে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন।

৫৮ শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৪-৬৫
সম্প্রতি '*রূপান্তরের গান*' নামে একটি অডিও এ্যালবাম বেরিয়েছে। এনামুল হকের পরিবেশনায় এই গানটির প্রথম লাইনে 'প্রলয় দোলার' পরিবর্তে 'লেগেছে দোলা' গীত হয়েছে।

৫৯ ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান*, পৃ. ১৯২

৬০ ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর (প্রযোজনা) '*সময়ের স্মৃতি*', কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ৮০তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।

৬১ শাহ আবদুল করিম, *ভাটির চিঠি*, সিলেট স্টেশন ক্লাব, সিলেট, ১৯৯৮, পৃ. ৬৩

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৬৩ শফিকুর রহমান চৌধুরী, *আবদুল হালিম রয়াতী জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮০২

৬৪ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, পৃ. ১০২

৬৫ International Mother Language Day was proclaimed by UNESCO's General Conference in November 1999. The International Day has been observed every year since February 2000 to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism.
http://www.un.org/Depts/dhl/language.

৬৬ 'যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন মোট ২৮৮ জন। এঁরা সকলেই মুসলমান। যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলিম আসনই কনটেস্ট করিয়াছিল। ২৩৭টি মুসলিম সীটের মধ্যে ২২৮টি দখল করিয়াছিল। এই ২২৮টির মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক (হক) ৪৮টি, নেযামে ইসলাম (কার্যত হক সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত) ২২, গণতন্ত্রী ১৩ ও খিলাফতে রব্বানী ২ জন পাইয়াছিল।'
আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ২৫৯

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-৫৮

৬৮ হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, *ভোটের গান*, সাপ্তাহিক ২০০০, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩০

৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৭১ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলার সাধারণ ইলেকশন সম্পর্কে কামাল লোহানীর ভাষ্য–'নির্বাচনের প্রস্তুতি-পর্বে লীগ শাহীর বেপরোয়া নিপীড়ন, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি,সম্পদ হরণ ইত্যাদি সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষকে অবহিত করবার জন্য নিজামুল হক, মোমিনুল হক, সুখেন্দু চক্রবর্তী, চিরঞ্জীব দাশ শর্মা, নূরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ গণশিল্পী সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন গণ-সংগীত। সেদিন যে গানগুলি জনমনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষকে দিয়েছিল উদ্দীপনা মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, সেগুলির মধ্যে–

* স্বর্গে যাবো গো, মোরা উজিরে নাজিরে
বাঁচায়ে রাখিতে চির উপবাসী রবো..
কি দুখে বাঁচিয়া রবো।

* মরি হায়রে হায় দুঃখ বলি কারে
মুসলিম লীগের কাণ্ড দেইখ্যা পরাণ উঠে জ্বলি রে।

* হুনছনি ভাই দেখছনি, দেখছনি ভাই হুনছনি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার নামে আজব কাণ্ড দেখছনি।

* লীগের মন্ত্রীরা আজি কাঁদে ঘরে ঘরে
ভোট দিমু ভাই হক ভাসানীর নায়ে।

এধরণের নির্বাচনী প্রচারণামূলক গান রচিত হয় এবং কাওয়ালী, কীর্তন, ঝুমুর ঢং-এ গেয়ে মানুষকে তৎকালীন গণবিরোধী মুসলীমলীগ সরকারকে পরাজিত করার এবং সাধারণ মানুষের মনোবাঞ্ছা পুরণ করার আহবান জানানো হয়।'

কামাল লোহানী, *প্রবন্ধ–জনগণের সংগ্রামই আমাদের সংস্কৃতি*, সংস্কৃতি ঃ সংগ্রাম, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৪৪

৭২ জনাব নিজামুল হক-এর কাছ থেকে এই গানটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গানসহ চুয়ান্ন সালের আরও কিছু গান তিনি নিজে গেয়ে ক্যাসেটে শ্রুতিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, *ভোটের গান*, পৃ. ৩২

৭৩ এ বিষয়ে মোতাহার হোসেন সুফী জানাচ্ছেন– "রাজনীতির ধারে কাছে তিনি (আবদুল লতিফ) কোনদিন ছিলেন না। তবে শেরে বাংলাকে তিনি গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন। মাওলানা ভাষানীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। যুক্তফ্রন্টের সাধারণ নির্বাচনের উপর তিনি একটি গান লিখেছেন 'হকের নায়ে চড়বি কেরে আয়...' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের নানা অনুষ্ঠানে তিনি এই গান পরিবেশন করেছেন।"

মোতাহার হোসেন সুফী'র *প্রবন্ধ সংগীত ভুবনের অনিন্দ্য শিল্পী আবদুল লতিফ*, মোতাহার হোসেন সুফী সাম্পাদিত, সংস্কৃতি ঃ সংগ্রাম, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৭৭

৭৪ 'পঞ্চাশ তিপ্পান্ন সালে যুবলীগের শিল্পী সংসদের শিল্পী হিসেবে আলতাফ মাহমুদ যে গানগুলো গাইতেন সেই গানগুলোই চুয়ান্নর সভা সমূহে গাইতেন আলতাফ মাহমুদ। নির্বাচন উপলক্ষে আলতাফ মাহমুদ কয়েকটি নতুন গানে সুরারোপ করেন।...পূর্ববাংলার বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় এই গানগুলো তখন গাওয়া হয়েছিল, অর্জন করেছিল প্রচুর জনপ্রিয়তা'

হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, *ভোটের গান*, পৃ. ২৮

৭৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য শ্রমসংগীতকে গান বলতে নারাজ। তিনি এগুলোকে শ্রমিকের চিৎকার-ধ্বনি (Labour cry) বলেছেন।

শক্তিনাথ ঝা, *শ্রমসংগীত*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ২০০৩, পৃ. ২

৭৬ সিলেটের চা-শ্রমিকদের জীবনাচারকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, তাদের জীবন অত্যন্ত নিম্নমানের এবং শোষণ সর্বস্ব হয়ে থাকলেও, তারা কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এমনকি কোনো প্রতিবাদী সংগীতের সন্ধানও পাওয়া যায় না। কারাম, ঝুমুরসহ তাদের নিজস্ব আনুমানিক অর্ধশত পরিবেশনা পদ্ধতি আছে। কিন্তু গানের মধ্যে বেশির ভাগ দেবতা ও পূজা শ্রেণীর এবং জীবনের গ্লানিকে দূর করার প্রধান উপাদান মদ-বিড়ি জাতীয় নেশাকর দ্রব্য।

৭৭ On the morning of September 12, 1973 Jara was taken, along with thousands of others, as a prisoner to the Chile Stadium. In the hours and days that followed, many of those detained in the stadium were tortured and killed there by the military forces. Jara was repeatedly beaten and tortured; the bones in his hands were broken as were his ribs. Reports that one of Jara's hands or both of his hands, had been cut off, are, however, erroneous. Fellow political prisoners have testified that his captors mockingly suggested that he play guitar for them as he lay on the ground. Defiantly, he sang part of a song supporting the Popular Unity coalition. After further beatings, he was machine-gunned on September 15 and his body dumped on a road on the outskirts of Santiago, and then taken to a city morgue.

Wikipedia, *Victor_Jara*, free encyclopedia

Dhaka University Institutional Repository

৭৮ সন্দীপন ১৯৬৮ সালে ১৪ টি গণসংগীতের একটি অনুষ্ঠান 'অপরাজেয় ভিয়েতনাম' নিয়ে ঢাকায় আসে। আফ্রো এশিয় লেখক সংঘের ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তিনদিন ব্যাপি সেই চমৎকার অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিচালনা করেছিলেন সাধন সরকার।

৭৯ ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *কবি আবদুল গফফার দত্ত চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, বইপত্র সিলেট, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৭৯

৮০ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, পৃ. ৪৮-৪৯

৮১ The 'Cripps mission' was an attempt in late March of 1942 by the British government to secure Indian cooperation and support for their efforts in World War II. The mission was headed by Sir Stafford Cripps, a senior left-wing politician and government minister in the War Cabinet of Prime Minister Winston Churchill.
http://en.wikipedia.org/wiki/*Cripps'_mission*

৮২ আজাদ-এর (সম্পাদকীয়), *'রবীন্দ্রনাথ ও মাওলানা আজাদ*, ১ বৈশাখ ১৩৬৮

৮৩ আহমদ পারভেজ, *রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রসঙ্গ*, আজাদ, ১৩ বৈশাখ ১৩৬৮

৮৪ আজাদ-এর (সম্পাদকীয়), মে ৮, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত সংবাদ।
সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৪৮

৮৫ অন্যমতে ছায়ানট প্রতিষ্ঠার কালে বেগম সুফিয়া কামাল সভাপতি এবং ফরিদা হাসান ছিলেন সাধারণ সম্পাদিকা।
সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, পৃ. ৪৯

৮৬ পাকিস্তান আবজারভার, ২৩ জুন, ১৯৬৭
গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৮৬

৮৭ সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, পৃ. ৫৫-৫৬

৮৮ স্বাক্ষর দাতাগণ হলেন– মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, এম.এ. বারী, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকান্দার আবু জাফর, মোফজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং শহীদুল্লাহ কায়সার।
গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, পৃ. ১৮৭-৮৮

৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৯০ সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, পৃ. ৫৬

৯১ গুনার মিরডাল, *এশিয়ার রঙ্গমঞ্চ (৩য় খণ্ড)*, অনুবাদ রায়হান শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৭

৯২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, সংঘ প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ৬

৯৩ অনুরাধা রায়, *সেকালের মার্কসীয় রাজনীতি*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ২০০০, পৃ. ৮৫

৯৪ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শানু ব্যানার্জী বলেন–এই গানটি আদর্শ গণসংগীতের সর্বোচ্চ উদাহরণ। সাক্ষাৎকার সেপ্টেম্বর ২০০৭, কলকাতা থেকে।

৯৫ মোসলেম বয়াতী , *সংগীত লহরী*, পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত, পৃ. ১২৪

৯৬ মোহাম্মদ ফরহাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২-৩

৯৭ ফকির আলমগীর, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪-১৫

৯৮ আবুবকর সিদ্দিক, সাজ্জাদুর রহমান পান্থ (সম্পাদিত) *সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ*, প্রতিনিধি, খুলনা, পৃ. ৯

৯৯ কামাল লোহানীর সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয় ২০০৭ সালে জুলাই মাসের দিকে।

১০০ সুব্রত রুদ্র, গণসংগীত সংগ্রহের তৃতীয় পর্ব থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য

বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা পূর্বকাল)

ভূমিকা

বাংলা গানের সুর ভৌগলিক কারণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ভিনদেশী শাসক ও ধর্ম-প্রচারকদের পরস্পর মিলন এবং সাংস্কৃতিক সু-সমন্বয়ের ফলে আধুনিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য যৌগিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণসংগীতকে আদর্শগত কারণে আধুনিক গানের কাতারে ফেলা যায় না– কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একই সময়ের চিন্তাদর্শে। বিভিন্ন আসরে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করে ও রেকর্ডকৃত গান শুনে সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে যে, কোনো মৌলিক সুরের দিকে অভিযাত্রা নয় বরং একটি যৌগিক রীতির সাংগীতিক প্রকাশ হিসেবে গণসংগীতকে মূল্যায়ন করা যথোপযুক্ত। সেই আলোকে বর্তমান আলোচনার বিস্তারণ।

সুরবৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্থান পেয়েছে যথাক্রমে লোকসংগীত, শাস্ত্রীয়সংগীত, আধুনিক ও বিদেশী সুরের প্রভাব। উদ্দেশ্যগত, পরিস্থিতিগত, ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন ঘটনা এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। কিভাবে, কখন, কোন সুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, সময়ের বিবর্তনে সুর সংযোজন-বিয়োজনের এই যে ধারাবাহিক পরিব্যাপ্তি– তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি উঠে এসেছে গণসংগীতের সুরকাঠামো ও একটি সাংগীতিক মূল্যায়নধর্মী প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার

বৈশ্বিক আদর্শের ভাবধারায় গণসংগীত বাংলা গানের ভুবনে প্রবেশ করার পর এখন তা একটি সু-সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে বিচার্য। প্রথমত–তার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার মানসম্পন্ন অবদানই এই সমৃদ্ধির কারণ। দ্বিতীয়ত–ক্রমবিবর্তনে একটি স্বতন্ত্র রূপ বা কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়ে ওঠা। রূপান্তরণের জন্য বাংলা ও বিশ্বসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সুররীতিকে অবলম্বন করে এবং গণচেতনামুখী উপাদানকে প্রধান আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। সময়ের দাবী ও আন্দোলনের পরিস্থিতি অনুযায়ী সুর সংগ্রহ, সচেতনভাবে তা প্রয়োগের সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষাও লক্ষ করা গেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিষয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সুর প্রসঙ্গে নানাদিক উন্মোচন করা হবে। সুরের বৈচিত্র্য নির্ণয় করতে গিয়ে উন্মোচন করা হয়েছে গণসংগীতের আঙ্গিক-সৌষ্ঠব, ব্যবহার উপযোগিতা, সাফল্য, প্রভাব, উদ্দেশ্য এবং অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক। যেহেতু গণসংগীত কোনো মৌলিক সুরবৈশিষ্ট্যের আদলে এখনো দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত হ'তে পারেনি বরং বাংলা গান ও বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের সুর ধার করে নানা প্রতিকূলতা এবং সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে সংগ্রাম ও প্রতিবাদই যেহেতু গণসংগীত সৃষ্টির মূল কারণ, সেজন্যে অন্যান্য শিল্পসংস্কৃতির মতো বিশেষ কোনো Form-এর মধ্যে স্থির করে হয় নি। যেখান থেকে যতটুকু সম্ভব স্বপ্রণোদিত সংগ্রহ করে তার কর্ম সচল রেখেছে। ফলে গণসংগীতের সুররীতির ভিতরে অনুপ্রবেশের আগে বাংলা গানের সুর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা আবশ্যক মনে করি।

বাংলা গান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা সমৃদ্ধ জাতির ন্যায় প্রধান দুইটি ধারায় প্রতিষ্ঠিত। তা হলো মার্গীয় ও দেশী।[১] দেশীগানকে গবেষকদের মতপার্থক্যে কখনো পল্লীগীতি, লোকসংগীত আবার কখনো আঞ্চলিক গান বলা হয়। মার্গীয় সংগীতকে শাস্ত্রীয় সংগীত বা ক্লাসিক্যাল মিউজিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংগীত বিভক্তির প্রধান দু'টি ধারা আবার অসংখ্য শ্রেণীবিভাজিত হয়েছে যা প্রয়োজন সাপেক্ষে গণসংগীতের সুরবৈচিত্র্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে বিভক্তির কারণে এখানে বিষয়-ভাব, প্রকরণশৈলীর ভূমিকা থাকলেও প্রধানত সুরবৈশিষ্ট্যের কারণেই ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়েছে, একথা জনমত স্বীকৃত। আর তা সমাজে শ্রেণীগত অবস্থার উপর ভিত্তি করেই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে–অঞ্চল বিশেষে লোকসংগীতের গায়কী দেখলেই তা অনুধাবন করা যায়। লোকসংগীতের সুরের চলনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর নমুনা বা শাস্ত্রীয় সংগীতে লোকসুর বৈশিষ্ট্যের প্রভাব চিহ্নিত করা যদিও সহজ সাপেক্ষ, কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীত যেমন কখনোই লোকসংগীত হ'তে পারে না, লোকসংগীতও শাস্ত্রীয় সংগীতের শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত হতে পারে নি। শাস্ত্রীয় সংগীত সর্বাবস্থায় সমাজের বিশেষ সমঝদার শ্রেণী কর্তৃক চর্চিত, অন্যদিকে লোকসংগীত সমাজের সাধারণ গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ঐতিহ্য ও ভাবের সৌকর্যে প্রবাহিত। প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যে সুরের আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে জাতি-গোত্রে, সাধারণে-বিশেষে। লোকসংগীতের প্রধান বিভাজনে যেমন ভাটিয়ালি, সারি, ভাওয়াইয়া, তরজা, গম্ভীরা, বাউল, জারি, ধামাইল, চটকা, কীর্তন, ভজন, শাক্ত, ঝুমুর, হোলি ইত্যাদি; অন্যদিকে শাস্ত্রীয় সংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, তারানা, ধামার, ঠুংরী ও যন্ত্রসংগীতের প্রসারতা। অবশেষে আধুনিক গানে এসে দুই ধারার সম্মিলন ঘটেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার কারণে। গণসংগীতও আধুনিক সংগীতের ন্যায় স্বাধীন স্বত্ত্বার প্রেরণায় বিকশিত, অন্তত সুরের আঙ্গিক নির্বাচনে তা উদার। তাহলে কি ধরে নেয়া যাবে আধুনিক গান আর গণসংগীত বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একই চরিত্রের? অবশ্যই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে এর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়। উদ্দেশ্য এবং প্রক্ষেপণের দিক বিবেচনা করলে তো আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে একটি জায়গায় মিল হলো গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা।

গণসংগীতে শাস্ত্রীয় প্রভাব থেকে শুরু করে লোকসংগীতসহ বিদেশী সংগীতের বিভিন্ন ধারা উদার অনুপ্রবেশের আরেকটি প্রধান কারণ গণসংগীতের বৈশ্বিক মনোভঙ্গি। আগেই উল্লিখিত আছে 'স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো, সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম'। ফলে স্বদেশী সুর, জাতীয় সুর, দেশী সুর ও বিদেশী সুরের কোনো কিছুই গ্রহণে বাধা থাকলো না (অবশ্য সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী যদি তা নিবেদিত চিত্তে গ্রহণ করে)। ফলে শিল্পী তার অভিজ্ঞতায় যে শিল্পাঞ্চলের রুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সেই বিষয়ের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে গণসুর। এখানে দু'একটি প্রশ্ন সামনে আসে যে, গণসংগীত বললে গণগীতির ন্যায় 'গণসুর'-এর প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়ে সাধারণ অর্থে বলা যায় যে সুর গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের অধিকার আদায় ও সংগ্রামে সহজেই উদ্দীপ্ত করে তাই গণসুর। সংগীত বিশেষজ্ঞরা সর্বোপরি গণসংগীতের সুর কী হবে এ নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা, মতদ্বৈততা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, বাকবিতন্ডাও কম ঘটেনি! কিন্তু গণসংগীতের সুর বলতে আভিধানিক অর্থেই গণসুরের একটি মৌলিক মানদণ্ড নির্বাচনে এখনো কোনো যথার্থ সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। যা দ্বারা প্রমাণিত হ'তে পারে গণসংগীতের নিজস্ব সুরশৈলী। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া গাইলে যেমন বোঝা যায় তার প্রকৃতি; গণসংগীতকে সেই বিচারে চিনতে গেলে কথা বা বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে সুর প্রয়োগে প্রত্যেকেই গণমানুষের কাছাকাছি পৌছানোর চেষ্টা করেছে। নানাবিধ কৌশল, মতাদর্শ প্রয়োগ করে গণসংগীতের মৌলিকত্ব ফুটিয়ে তোলায় ব্যাকুলতা ছিল সর্বদা, দেখা গেছে সেই গানগুলিই তুলনামূলক বিচারে জনপ্রিয় হয়েছে যা প্রচলিত কোনো জনপ্রিয় সুর-ঢং কিংবা আঙ্গিক দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত। উদাহরণ স্বরূপ গণসংগীত প্রবক্তা হেমাঙ্গ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের চির-পরিচিত সুরের মধ্যে থেকেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এরজন্য বক্তব্যকে ছন্দবদ্ধ করতে হয়েছে লোকসংগীতের আদলে। তিনি সার্থকও হয়েছেন অনেকের থেকে। এক্ষেত্রে তিনি স্তালিনপন্থী মতাদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। স্তালিন কথিত তত্ত্ব– 'International in contents, National in form' -এই বিশ্বাসে তিনি নিজের গানে লোকসুর ব্যবহার করেছেন সারাজীবন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল– গণসংগীত সংগ্রামী মানুষদের কাছে পৌছাতে হ'লে তাতে Folk Timbre-এর যোগ থাকাটাই শ্রেয় হবে। ফলে তিনি হোলি, ঝুমুর, ভাট, ভাটিয়ালি, ধামাইল, অসমীয়, বিহুসহ সিলেট অঞ্চলের নানা বৈচিত্র্যের সুর প্রয়োগ করেছেন তাঁর গানে। কবিয়াল রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিতসহ বিশিষ্ট সংগীতকার আব্দুল লতিফও এই ধারারই অনুসারী ছিলেন। তবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রতিটি সুরের ব্যবহারে যেমন একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই বিচারে বাকিরা জীবনের সরল-মার্জিত জীবনের অভিরুচি ও সুর প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠাকেই প্রধান বিবেচনা করেছিলেন।

লোকসুরের বাইরে যারা পাশ্চাত্য সুরের ব্যবহার করেছেন সফল ভাবে– তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংগীত যেহেতু ইউনিভার্সাল, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষই যে কোনো সুরকে অনুধাবন করতে পারে। তাছাড়া সংগীতের ইতিহাসে নানা অঞ্চলে পাশ্চাত্য মিশ্রণ ঘটেছে সর্বকালেই। এমনকি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতও তা থেকে মুক্ত নয়। অতএব গণসংগীত যেহেতু আন্তর্জাতিকতাবাদী আদর্শের রূপশৈলী,

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ কেন থাকবে না। দ্বিতীয়ত গণসংগীতের ধারনাটাও বিদেশী, বিশেষ করে ফ্রান্স-রাশিয়ার থেকে আগত, সুতরাং পরিব্যাপ্তিতে বিদেশী সুরের মিশ্রণ কোনোভাবেই ধৃষ্টতামূলক হবার কথা নয়। সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান এই বিশ্বাসে ছিলেন অটল। সলিল চৌধুরীর মত স্বীকৃত যে- 'Form তাকে ভাঙা দরকার-কারণ নতুন Content আসছে। "ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে" আমাদের আগের কোনো ভারতীয় গানের ফর্মের মধ্যে পড়ে না। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ-এই বাধাধরা চারতুকে বিভক্ত গানের ফর্মকে আমার ভাঙতে হয়েছে।[২] তিনি আরো বলেছেন 'আমার অপরাধ আমিই প্রথম গণনাট্যে পাশ্চাত্য মিউজিকের আধুনিক টেকনিক এনেছি। আমার যুক্তি হলো : জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে, নাটকে, চিত্রকলায় যদি বিদেশী ফর্ম নেওয়া যায়, তবে গানে কেন নয়? এ-কাজ তো প্রথম শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'[৩]

এখানে বলে রাখা ভালো যে ভারতীয় সংগীতের সাথে পাশ্চাত্য সংগীতের মৌলিক কিছু পার্থক্য আছে, প্রথমেই তা পরিষ্কার করা যাক। পাশ্চাত্য সংগীত প্রধানত যে কোনো মেলোডির উপর ভিত্তি করে সু-গঠিত, যার আরোহণ-অবরোহণের মধ্যদিয়ে আরো প্রতিবিম্বের মতো একাধিক মেলোডি পরিচালিত হয়-কখনো সম্পর্ক করতে করতে আবার কখনো বিরোধিতা করতে করতে। অর্থাৎ একটি মেলোডি লাইনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মেলোডি ঐকতান সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংগীত রীতিতে এই প্রয়োগই অজানা। ভারতীয় সংগীত মূলত এক সুরের ধারাক্রমিক বিকাশ। সংগীতের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের মধ্যে একক সুরের মাধূর্যকেই প্রকাশ করে নানা কৌশল পরিমাপে।[৪] গণসংগীতের আগে বাংলা আধুনিক গানে যখন কম্পোজিশন-এর প্রভাব পড়লো বিশেষ করে গ্রামোফোন রেকর্ড আসার পর, তখন থেকেই পাশ্চাত্য পদ্ধতি এসে যায়। বৃটিশ উপনিবেশও অনেকটা প্রভাব রেখে গেছে অপেরা বা ক্লাসিক্যাল অর্কেস্ট্রার প্রচার দিয়ে। গণসংগীতের আগেই যেহেতু ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরী ছিলো, পরে তা পূর্ণতা পেল। পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রনের আরেকটি প্রধান কারণ হলো-অনুবাদিত গান। রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে গণআন্দোলনে শ্রমিক বিপ্লবের গান বিদেশী গানগুলো সরাসরি ইংরেজি ভাষায় আবার তা অনুবাদ করে হুবহু সুরে পরিবেশনের পরিমানও কম নয়। 'আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয় নিশ্চয়' গানটি যেমন 'We shall Overcome Some day, O deep in my heart, I do believe'-এর অনুবাদ। প্যারি কমিউনের আন্তর্জাতিক শ্রমসংগীত-এর অনুবাদ 'জাগো জাগো জাগো সর্বহারা, অনশন বন্দী ক্রীতদাস'-এর মতো অসংখ্য গান বাংলা গানে স্থায়ী আসন পেয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বিদেশী সুরের পক্ষে থেকেছেন অনেকেই। এমনকি লোকসংগীতাশ্রয়ী হেমাঙ্গ বিশ্বাস তার 'সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে, হিরোশিমা তুমি' গানটি বিদেশী সুরের ব্যবহার থাকলেও অমর সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

চল্লিশ দশকের শুরুতে যখন ফ্যাসিবাদকে রুখে দিতে ব্রিটিশ সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবেলায় গণসংগীত রচনার কালে সুরের প্রভাব প্রতিপত্তি অপেক্ষা জনগণকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টাই মুখ্য ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোপানল থেকে মুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, যুদ্ধ-বোমা-মাইনের নিপাত প্রত্যাশা করে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার আহ্বানই ছিল প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঢাকার রাজপথে ফ্যাসিবাদীদের দোসর কর্তৃক সোমেন চন্দকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' বাংলায় লেখা

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃত প্রথম গণসংগীতও পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব ছিল। *[সুরচিত্র-১]* অবশ্য এই সুর খুব একটা পরিণত নয়, তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত গানটিতে সচেতনতার সাথে সুর প্রয়োগের অপেক্ষা চেতনার বহিঃপ্রকাশই ছিল মুখ্য।[৫] সলিল কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রের পাশ্চাত্য সুরের গানও বাংলার মানুষের মুখে মুখে গীত হতো। পরবর্তী কালে প্রায়োগিকতার বাস্তবতা নিয়ে বাক-বিতর্ক ঘটেছে তখন দেখা গেছে সাধারণ মানুষের কাছে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক গানগুলো। এর কারণ কাঠামোবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। বোম্বাইতে কোনো এক অধিবেশনে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সলিল চৌধুরীর পাশ্চাত্য সুরের প্রতি আসক্তের বিরোধিতা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'সলিল সংগীতে Formalism-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাশ্চাত্য Orchestration-এর জ্ঞান ছিল তার, প্রথম থেকেই তার গানে এই ঝোঁক ছিল। কিন্তু সলিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমবাংলার নতুন গীতিকাররা তারই ব্যর্থ অনুকরণ করতে শুরু করে দিলেন। এই Formalism-কে তীব্র আক্রমণ করে আমি বলেছিলাম যে সলিল গণসংগীতের জাতীয় ঐতিহ্য হারিয়ে Cosmopolitanism-এর পানে ধাওয়া করেছে।
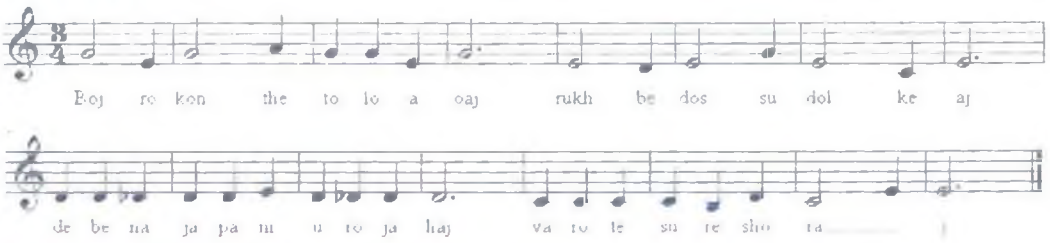
সুভাষ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট বজ্রকণ্ঠে গানের সুরের নমুনা। সুরচিত্র-১

জবাবে সলিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদের উদাহরণ দিয়ে বিদেশী সুর ও সংগীতের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। সে বলেছিলো, আমরা যদি গরুর গাড়ি ছেড়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান রেলগাড়িকে গ্রহণ করে থাকি, তবে পাশ্চাত্য সংগীত কী দোষ করলো?[৬]

পরবর্তীতে অবশ্য হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজেই বলেছেন–'বিষয়বস্তুর আলোচনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে এভাবে শুধু লোক আঙ্গিক নিয়ে বিতর্ক চালানো, ওটাও তো এক ধরনের Formalism। সলিলের Formalism-এর সমালোচনা করতে গিয়ে আমি নিজেও একধরণের Formalism-এর শিকার হয়েছিলাম।'[৭]

হেমাঙ্গ বিশ্বাস যদিও জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার জন্যেই সুরের Form-কেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে Content-সমৃদ্ধ করে নি কখনো কখনো। যাইহোক গণসংগীত মধ্যপথে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অতিক্রম করলেও অবশেষে সংকটের কালে বিপ্লবে-মিছিলে চেতনায় জাগরণে ঠিকই গীত হয়েছে শত-সহস্র কণ্ঠে।

বাংলাদেশের গণসংগীতে ১৯৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত ঘটনারই পর্যবেক্ষনমূলক প্রভাবের মুখোমুখি প্রবাহিত ছিল। কারণ গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ড কলকাতায় হলেও গণসংগীতের কার্যক্রম সারাবাংলা জুড়েই আবিষ্ট ছিল। সিলেটসহ প্রায় সব জেলাতেই গণসংগীতের স্কোয়াড পরিবেশন করেছে নাটক, নৃত্যনাট্য ও গণসংগীত। ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহের শেরপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, নেত্রকোণায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন (১৯৪৫), চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনই[৮]

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৫১) যার প্রমাণ তাছাড়া গণনাট্যের অধিকাংশ প্রধান শিল্পীরাই পূর্ববাংলার লোক, ফলে পূর্ববাংলার সুরই সর্বোপরি প্রতিনিধিত্ব করেছে গণসংগীত আন্দোলনকে। ভারত-পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে বিভক্তির পর সরাসরি যোগাযোগের কিছুটা ভাটা পড়ে। আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রহসন, সামাজিক দূর্নীতিমূলক ঘটনার কারণে ১৯৪৮ সাল থেকেই বাংলাদেশে (পূর্ব-পাকিস্তান) গণসংগীতের ধারা নতুন পথে পরিচালিত হ'তে লাগলো। ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ার সুবাদে মফস্বল শহর থেকে নিঃস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আগমন ঘটতে থাকে। ১৯৫০ সালে কিছু শিক্ষিত সংস্কৃতমনা মানুষের প্রচেষ্টায় 'ধুমকেতু শিল্পী সংঘ' নামক একটি সংস্কৃতি-সংঘের প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ব-বাংলার এই প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা গণচেতনামূলক, জীবনের দুঃখ-বেদনা ও সমস্যা নিয়ে রচিত গণসংগীত, নৃত্যনাট্য ও ছায়ানাট্য পরিবেশন করে। সংঘের প্রধান নিজামুল হক বগুড়া থেকে, বরিশাল থেকে আলতাফ মাহমুদ, মোসলেহ উদ্দীন, রাজনীতিবিদ এমাদুল্লা, গাজীউল হক ও রাজনীতিবিদ জনাব তোহা' সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন[৮]। প্রধান কারণ ছিল ভাষা অধিকার। ১৯৫২ সালের পর বাংলাদেশের গণআন্দোলনে পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এক সক্রিয় বিপ্লব-বিদ্রোহ শত-শহীদের ত্যাগে পূর্ণতা সাধন করে।

বাংলাদেশে গণসংগীতের সুরের বৈচিত্র্য নিয়ে কোনো বাক-বিতর্ক হয়ে ওঠেনি আদর্শগত কারণেই। রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কারণেই ব্যাপক পরীক্ষা-নীরিক্ষা ততটা জোরদার ছিল না, কোনো পার্টি প্রভাব কিংবা মনরক্ষার উপাদান হিসেবেও চালিত হয়নি বরং স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান অবলম্বন ছিল। ফলে গানের কাব্যছন্দ অথবা সুরকারের স্বাভাবিক দখলকে শাসন ও আদর্শমুক্ত হয়ে সজোরে গীত হয়েছে দেশি-বিদেশি-শাস্ত্রীয় সব সুরের প্রভাবই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে স্বাধীন শিল্পের দাবী নিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। এখানে বিশেষভাবে বলা দরকার গণসংগীত পরিবেশনের বাধা-বিপত্তি এলেও গণসংগীতের Form বা Content নিয়ে তেমন সংস্কারমূলক উচ্চবাচ্য হয় নি বলা যায়।

বাংলাদেশের গণসংগীত চর্চায় সুরের কাঠামো দাঁড়িয়েছে তিনভাবে।

প্রথমত–কলকাতার গণনাট্য সংঘের প্রভাব। দেশবিভাগের পর কলকাতা গণনাট্য ছেড়ে এদেশে চলে আসেন কয়েকজন প্রধান সারির সংগীতশিল্পী। তন্মধ্যে অন্যতম চট্টগ্রামের কলিম শরাফী এবং বরিশালের শেখ লুতফর রহমান, যাঁদের হাত ধরে গণসংগীতের বিকাশ হয়েছে বাংলাদেশে, এবং এদেশ ছেড়েও অনেকেই চলে যান। যাদের মধ্যে অন্যতম হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, নিবারণ পণ্ডিত, দেবব্রত বিশ্বাস, দিলীপ বাগচী প্রমুখ। ফলে বাংলা বিভক্তির মাধ্যমে স্বতন্ত্র দেশ বলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, নতুন গানের খোঁজ খবর সমান সুবিমল বাতাসের মতোই প্রবাহিত ছিল, এতে ভারতীয় সুরের প্রভাবও স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয়ত–এদেশের সংগ্রামী লোকসংগীত শিল্পী ও কবিয়ালগণ, যাঁদের অসংখ্য গান উভয় বাংলাকে প্লাবিত করেছে তাঁদের কথা ও প্রাণের থেকে উৎসারিত ব্যাকুল আরাধ্য সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট লোকসংগীতই গণসংগীতের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্লাবন শুরু হয়েছিল মুকুন্দ দাসের (১৮৭৮-১৯৩৪) স্বদেশী গান থেকেই। স্বদেশী যুগের কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) বাঙালির চেতনাকে শাণিত করেছিল বাংলার মাটির

Dhaka University Institutional Repository

সরল সাধারণ সুরে বাংলাগানকে শাক্তচেতনার মধ্যদিয়ে এক অভিনব ধারায় বিকশিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য স্বদেশীগানের পূর্বজ হিসেবে হিন্দুমেলা ও কংগ্রেস গঠনের কালে এবং পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য গণচেতনার গান স্বাক্ষর রেখেছে। অতঃপর দেখা গেল রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, ফণি বড়ুয়া, কিশোরগঞ্জের অখিল চক্রবর্তীসহ গ্রামগঞ্জের কবিয়ালদের গণআন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, যাদের লোকসুরের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে লিখেছেন অসংখ্য গান, এতে করে গণসংগীত পেয়েছে অঞ্চল বিশেষে লোকসুরের নানান ফর্ম। বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গের মানুষের রয়েছে লোকসুরের হাজারো বৈচিত্র্য। এদের সংগ্রাম নিত্যকালের প্রকৃতির সাথে বয়ে নিয়ে আসা বন্যা, দুর্যোগ খরার কবলে কখনো প্রতিবাদ বা প্রার্থনা, জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে শত শত বছর ধরে সংগ্রাম ও অধিকারের ভাষা হলো লোকসংগীত। ফলে চেতনা প্রকাশে সুরের চলনটাও কখনো কখনো বিরহে, কখনো প্রবল বীরত্বের ঢঙে উপস্থিত। বাউল গানে যেমন ভাটিয়ালির প্রভাব এসেছে ব্যঙ্গ বা প্রতিবাদের রূপরেখা নিয়ে। শ্রম সংগীত, কবিগান, বিচার গান, গাজীর গীত, গম্ভীরায় যে সুর তা শেষ পর্যন্ত গণসংগীতের ধারায় বন্ধুত্বের মিলন ঘটিয়েছে অবলীলায়। লালন সাঁই, সৈয়দ শাহনূর, জালাল উদ্দীন, পাঞ্জু শাহ্, মহিন শাহ্, বিজয় সরকার, মোসলেম উদ্দীনসহ শত শত লোকমনীষীর মুখে সামাজিক রাজনৈতিক সংস্কার এসেছে প্রচলিত লোকসুরের আদলেই।

তৃতীয়ত–ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে ঢাকাকেন্দ্রিক গণআন্দোলনই বাংলাদেশের গণসংগীত চর্চায় এক যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যার মুখ্য উপলক্ষ্য ছিল। বাঙালি জাতি তার নিজস্ব ভাষা-ঐতিহ্য অপহরণের সুপরিকল্পিত প্রতারণা টের পায়। সাম্প্রদায়িকতার জালে আটকে পড়া পূর্ববাংলার মানুষ-ছাত্র-জনতা উপায়ান্তর না পেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই সময় যাদের হাত ধরে গণসংগীতের ব্যাপক জোয়ার প্রবাহিত হয়–তাঁরা হলেন আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফ, শেখ লুতফর রহমান, গাজীউল হক, নিজামুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মোশাররফ উদ্দীন প্রমুখ; যাদের ভিতর কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই সংগীত বোদ্ধা ও দুরন্ত সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, এদের মধ্যদিয়েই সুরের নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে দেশী-বিদেশী সুরের সম্মিলন ঘটেছে উদার চিত্তে।

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অনেকগুলো আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছে গণশিল্পীদের। এসময়কালে অবশ্য আরো অসংখ্য শিল্পী ও গীতিকারের আবির্ভাব স্মরণযোগ্য, যাদের গানের মাধ্যমেই মূলত দেশী-মার্গীয়-বিদেশী নানা সুরের সম্মিলন ঘটেছে। গণসংগীতকে গবেষণাগারের উপাদান বা রাজনৈতিক শৃঙ্খলার থেকে মুক্ত থেকেই প্রাণের উদ্দামে-উচ্ছ্বাসে-স্বজন হারানোর বেদনায়-কাতরতায়-চেতনায় নব নব সুরের ঝংকার উদ্ভাসিত হয়েছে। লোকসংগীত শ্রেয় না বিদেশী সুর শ্রেয় এসব বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে সমাজতান্ত্রিকতার মুভমেন্ট দাঁড় করানোর শ্লোগানে বশ থাকার পরিবর্তে বরং মূল সংস্কৃতির স্রোতধারা একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে। এমনকি সিনেমা, নাটক, সামাজিক অধিকার, দেশপ্রেম, ভাষা, স্বৈরাচারের পতন আন্দোলনে মুলধারার গানে রূপ নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ৫২'র ভাষা আন্দোলনে প্রভাতফেরীর গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি প্রথম সুর করেন আবদুল লতিফ ১৯৫৩ সালে যা লোকসুরকেই প্রতিনিধিত্ব করেছিল, প্রভাতফেরীতে গাওয়ার জন্য একটি অপরূপ সংগীত উপহার পেয়েছিল বাঙালি জাতি আবদুল গাফফার চৌধুরীর এই অমর কবিতায় সুরারোপের মধ্যদিয়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে আলতাফ মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সুরের পূর্ণ প্রভাবে পুনরায় সুর করলেন *[সুরচিত্র-২]*। এই সুরই ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়।[১০] আজও অবধি বাংলা গানের শ্রেষ্টতম গানের তালিকায় শীর্ষস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এবং সুরই যে এতদূর নিয়ে যেতে পেরেছে, এ বিষয়ে কারুর দ্বিমত থাকার কথা নয়। অন্যদিকে আবদুল লতিফের 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়' একটি অসাধারণ লোকসুরের গান, এছাড়াও সলিল চৌধুরীর লেখা কৃষক বিদ্রোহের গান 'হেই সামালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো, জান কবুল আর মান কবুল, আর দেবো না রক্তে বোনা ধান হো।' কিংবা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান ও কিষাণ ভাই রে, কাস্তেটারে দিও জোরে শান।' লোকসুরে রচনা করা হয়। এই গানগুলোও সমান জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছে।
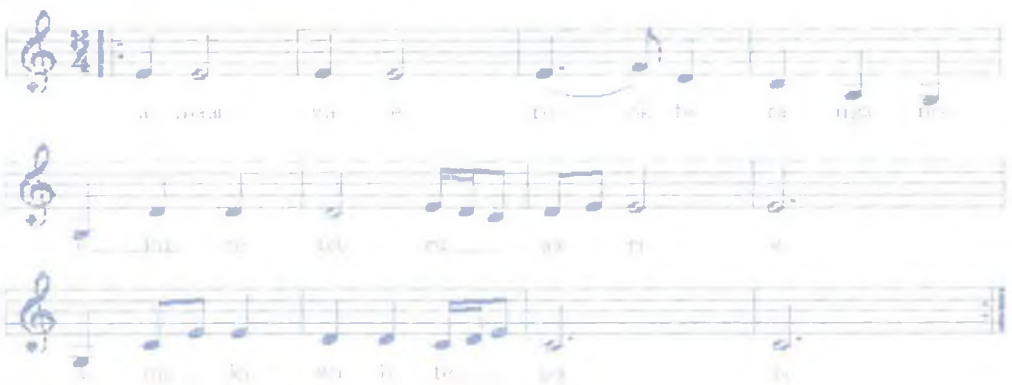
আলতাফ মাহমুদ সৃষ্ট প্রভাত ফেরির গানে পাশ্চাত্য সুরের নমুনা। সুরচিত্র-২

তবে গণসংগীতের ধারণা যেখান থেকেই আসুক, তাকে চির সমৃদ্ধ করেছেন লোক-কবিয়াল, গম্ভীরার নায়ক ও গণ-বাউলেরাই। কবিয়াল রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, ফণি বড়ুয়া, গুরুদাস পাল সুর করেছেন তাদের আঞ্চলিকতার প্রভাবে যা শহুরে রচয়িতাদের থেকেও অনেক বেশি জনমানুষের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে[১১]। এমনকি অনেক পুরোনো লোকগীতি আছে যা গণসংগীত আসরকে জমানোর জন্য হরহামেশা গীত হতো, এতে প্রমানিত হয় Content-এর শৈল্পিক মূল্য ঠিক থাকলে Formalism-এর প্রয়োজন হয় না। ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশে অন্তত কোনো Formalism-এর চর্চা করা হয় নি।

গণসংগীত যেহেতু কোনো সৃজনশীল রচনাকর্মের মতো একক মননশীল সৃষ্টির ধারা নয়, এর সাথে সংযুক্ত রাজনৈতিক আদর্শ ও চেতনা তাই কথার ভাবের উপর ভিত্তি করে সুর যতটা প্রয়োগ করা হয়েছে, তার থেকেও বেশি প্রভাব তাৎক্ষণিক যাপিত জীবনের সুর, অনেকটা শ্রমসংগীতের ন্যায় উদ্ভাবনীমূলক।[১২] তবে যে কোনো গানই কাব্যছন্দ বা ভাষাশৈলীর আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে সুর সংযোজিত হয়। কাব্যমাত্রা, ছন্দ, উপমা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির পাশাপাশি কথার আঙ্গিকতায়ও মোটামুটি চার রকম রূপ পাওয়া যায়। তা যথাক্রমে–

কাহিনী মূলক ঃ যেমন–নিবারণ পণ্ডিতের লেখা 'ও হারে, নীলকরে করলো...'

আবেগ ও বিদ্রোহমূলক ঃ শামসুদ্দীন আহমদের 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙ্গালি..' বা সিকান্দার আবু জাফরের 'জনতার সংগ্রাম চলবেই..'

ব্যাঙ্গধর্মী ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য'

শিক্ষামূলক ঃ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'উদয়পথের যাত্রী, ওরে ছাত্র-ছাত্রী'

Dhaka University Institutional Repository

গানের বর্ণনার চরিত্র অনুযায়ী সুরের প্রভাব থাকলেও তা নির্দিষ্ট কোনো ছকে ফেলা দুঃসাধ্য। উদ্দেশ্যগত বিচারেই যেহেতু গণসংগীতের সুরকে বিভাজন করার প্রয়াস পাওয়া যায়, সেই বিচারে গণসংগীতকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নরূপ অংকিত ছকে তার বিভাজন দেখানো হলো–

উপর্যুক্ত চিত্র অনুযায়ী সুরবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নানামুখী বাস্তবতা ও পর্যবেক্ষণ যথাসম্ভব উপস্থাপন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে গবেষণা, শিল্পীদের জীবনী, ঐতিহাসিক বাস্তবতা, বইপুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য এবং তত্ত্বাবধায়কের উপদেশের উপর ভিত্তি করেই এই বিশ্লেষণ এগিয়েছে।

গণসংগীতে নানাজাতির সুর অনুপ্রবেশ করেছে এটা যেমন সত্য– কেন এবং কিভাবে তার যথাযথ উদঘাটন করাটাও জরুরি। সুর প্রয়োগ বা অনুপ্রবেশের কারণ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কারের ভিতরেই বৈচিত্র্যের যথাযথ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। নিম্নরূপ সুর অনুপ্রবেশের বিভিন্ন কারণ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

সুর অনুপ্রবেশের কারণ ও উদ্দেশ্য

সাংগীতিক পরিমণ্ডলের যে বিভিন্ন আঙ্গিকের সুর এসে গণসংগীতে সমন্বিত হয়েছে তার নানা কারণ ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা হলো–

লোকসুর

১. লোকমানসকে জাগ্রত করাই গণসংগীতের উদ্দেশ্য। তাই লোকমানসে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠার সম্ভাবনা বিবেচনা করে লোকসুরের ব্যবহার।

২. লোককবিদের কাছেই সবচেয়ে বেশি গণসচেতনামূলক গানের রচনা ও নিয়মিত প্রচার দেখা যায়।

৩. কতিপয় শিল্পীর আদর্শ অনুযায়ী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্ট্যালিনের বক্তব্য 'International in Content, National in Form' ফলে Form হিসাবে জাতীয় বা আঞ্চলিক সুর লোকসুরকেই গ্রহণ করে।

৪. অঞ্চলভেদে শিল্পীর আঞ্চলিক সুরের অভিজ্ঞতা ও প্রভাব কাজ করে।

৫. বিদেশী বা আধুনিক সুর গ্রামীণ সমাজ বা নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিল না বলে।

৬. গণসংগীত পরিবেশনের আসর সাধারণত সভামঞ্চ, রাজনৈতিক মঞ্চ বা খোলা ময়দানই প্রধান। অন্যান্য সংগীতের ন্যায় সুপরিকল্পিত আয়োজন এক্ষেত্রে প্রায় অনুপস্থিত। ফলে সংগীতের জন্য দর্শক শ্রোতা পূর্ণ মনোযোগ রাখতে পারে না। লোকসুর যেহেতু সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সভায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনা এবং বক্তব্যকে সহজেই পৌঁছে দেবার আকাঙ্খায় লোকসুর নির্বাচন করা হয়েছে।

৭. বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও সুক্ষ্মতর শাস্ত্রীয় সুর বা তালের লহরা শোনার জন্য দর্শক নিস্তব্ধ অপেক্ষমান থাকে না। ফলে শাস্ত্রীয় আলংকারিক সুর বর্জনের প্রয়াসেই সরল লোকসুরের নিমন্ত্রণ।

৮. গণসংগীতের শ্রোতগণ নিম্নবিত্ত, অবহেলিত শ্রমিক কৃষক-শ্রেণী। তাদের সংগীত প্রেম বা বুঝ থাকলেও শাস্ত্রীয় জ্ঞান সু-সম্পন্ন নয়।

৯. বেশিরভাগ গণশিল্পী বা গীতিকার মূলত রাজনৈতিক আদর্শের প্রচারক। শিল্পচর্চা অপেক্ষা আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রচারই যার প্রধান লক্ষ। সংগীতের নিরলস সাধনাও গৌণ। ফলে সহজ সরল লোকসুরের প্রকাশই উপযোগী মনে করে।

বিদেশী সুর

১. গণসংগীতে ধারা ও ধারণা এসেছে বহির্বিশ্ব থেকে। যেহেতু আন্তর্জাতিকতাই গণসংগীতের মূল লক্ষ, ফলে সাধারণ অর্থেই বিদেশী সুরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

২. বাংলা গণসংগীতের মধ্যে সরাসরি অনুবাদিত গান বা পারিভাষিক অনুবাদ গানও কম নয়। ফলে মূল গানকে অক্ষত রাখার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

৩. গণসংগীত যেহেতু কোনো লোকসংগীতের মতো আঞ্চলিক সীমারেখায় বা আঙ্গিক কাঠামোর অথবা দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা প্রচলিত ধারা নয়। এমনকি শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যেও পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

না । ফলে সুরের স্বাধীনতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারেনি । বিদেশীসুর ব্যবহারের এটাও অন্যতম কারণ ।

৪. কথার চরিত্র অনুযায়ী সুরের চলন । সবগানের কথাই লোকসুরের ফ্রেমে বাঁধার উপযোগী নয় বলে বিদেশী সুর স্বাধীন ভাবে ঢুকে পড়েছে ।

৫. গণসংগীতের প্রধান প্রবণতাই হলো Chorus বা Unison পদ্ধতিতে গাওয়া । ফলে সমবেত গানে Improvisational attitude প্রয়োগ করা বেশ দুরূহ । Composed Music -ই বারবার শিখে সঠিক প্রয়োগ করতে পারে । ফলে পাশ্চাত্য ধারার ব্যকরণসম্মত কাঠামোর দিকেই মনোনিবেশ করেছে অনেক গান ।

৬. গণসংগীতের সুরের প্রবণতাই যেহেতু সহজ । দেখা গেছে পাশ্চাত্য সুর ব্যবহার করা হলেও তা কিন্তু শাস্ত্রীয় ধারা নয় । বরং সেই দেশেরই সহজ সরল লোকসংগীত । এখানে উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য সংগীত নয়, মূলকথা সহজ সুরের যে পাশ্চাত্য গান আকর্ষণ করে তা-ই ব্যবহার করা হয়েছে ।

৭. বাংলাগানে সমবেত সংগীত বিরল নয় । কিন্তু তা পরিচালিত হয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পরিবেশনের মধ্যদিয়ে, যেমন জারি-যাত্রা, ঝুমুরগানের উল্লেখ করা যায় । গণসংগীত শিল্পীর লক্ষ যেহেতু আঙ্গিক প্রচার নয় । ফলে মীড়-গমক বা ধারার পরিচর্যা না করে বক্তব্য প্রচারের নিমিত্তে বিদেশী সহজ সরল সুর গ্রহণ করা হয়েছে ।

৮. গণসংগীতের যখন আবির্ভাব হয়ে তখন ছিল ব্রিটিশদের বিদায়ের পালা । দীর্ঘ ২০০ বছরের উপনিবেশিক শাসনে বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় প্রভাব পড়েছিল । ভারতীয় বাঙালিরা আয়ত্বে এনেছিলো ইউরোপীয় শিল্প-সাংস্কৃতিক চর্চা । যার প্রভাব গণসংগীতেও পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই ।

৯. রাজনৈতিক আদর্শ প্রকাশে ভাষার নতুনত্ব যেমন আনা হয়, সুরের নতুনত্বের মডেল হিসেবে বিদেশী সুরকে ধারণ করা হয় ।

আধুনিক সুর

১. যেহেতু আধুনিক গানের সুর কাঠামোয় কোনো বাধ্যবাধকতা নেই । সুরকার তাঁর রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী স্বাধীন মতামত রাখেন । গণসংগীতও একই ধারায় প্রবাহিত ।

২. গণসংগীতে বক্তব্যই প্রধান, সুর মাত্র সহযোগী । আধুনিক সুর প্রয়োগে তাই ইচ্ছে বা সময়ের প্রয়োজনে অনেক সুরই এসেছে ।

৩. শ্রমিক শ্রেণী কৃষক শ্রেণীসহ সকল মেহনতী মানুষই এর মূলশ্রোতা । তাদের শ্রমগীতির কথা মাথায় রেখেও বেশ কিছু গান আধুনিকীকরণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

শাস্ত্রীয় সুর

১. লোকসংগীতের প্রায় গানই বিশ্লেষণ করলে কোনো না কোনো রাগ-রাগিণীর প্রভাব দেখা যায় । সে বিচারে মৌলিক হোক বা মিশ্র হোক কোনো সুরই শাস্ত্রীয় সংগীতের উর্ধ্বে নয় । কিছু রাগসংগীতের আঙ্গিক বা চরিত্রের বাইরের গান ছাড়া । দেখা যায় ভাটিয়ালি সুরে খাম্বাজ, পিলু, ভীমপলাশ্রী, পটদীপের সাদৃশ্য । সারি ও বাউল গানে ভৈরবী, বেহাগ, ভৈরব, জয়জয়ন্তী, বিলাবলের প্রভাব সুস্পষ্ট[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

২. খুব বেশী না হলেও কেউ কেউ সচেতন ভাবেই রাগসংগীতের ব্যবহার করেছেন। দিলীপ বাগচী, সাধন ঘোষ, আলতাফ মাহমুদ, দিলীপ সেনগুপ্ত, সাধন সরকার তন্মধ্যে অন্যতম।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় গণসংগীতে সুর প্রয়োগের কোনো বিশেষত্ব নেই, সীমাবদ্ধতাও নেই। যদিও ১৯৬০ সালের পর গণসংগীত অনেকটা অবক্ষয়ের মুখোমুখি, তখন প্রথমসারির গণশিল্পীরা গবেষণা-বিশ্লেষণে রত হন। তারপর দেখা যায় স্বাধিকার আন্দোলনের জোয়ার, রচিত হয় নতুন ভাববৈচিত্র্য নিয়ে নতুন নতুন গান। যার ধারাবাহিকতা মুক্তির যুদ্ধ পর্যন্ত প্রেরণা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসুর বিশ্লেষণ

সামগ্রিক ভাবে গণসংগীতের যে ভাণ্ডার, এর মধ্যে শ্রবণ–গবেষণা ও জরিপ শেষে উদঘাটিত সত্য হলো বাংলাদেশের গণসংগীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসুরাশ্রিত। লোকসুর যে কখনো কখনো চূড়ান্ত গণবাদী হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ রাশিয়া, আফ্রিকার মতো বাংলাদেশেও প্রমাণিত। উজবেকিস্তান, আর্মেনিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, চীনের অনেক গান অনুবাদ করা হয়েছে তার প্রায় সবই লোকসুরাশ্রয়ী। কলকাতা গণনাট্য সংঘের ছায়াতলে যারা পার্টি লাইনের শৃঙ্খলে মুক্তির দিশা খুঁজছিল, তাদের অনেক অভিযোগ প্রকাশিত রয়ে গেছে, তবে সংঘের বাইরে থেকে যারা চেতনায় নিষ্ঠ থেকে রচনা করেছেন অসংখ্য গান। তাদের মধ্যে রমেশ শীল, নিবারণ পন্ডিত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস অন্যতম। তাছাড়া গণসংগীতের আদর্শই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য, সেখানে উচ্চাঙ্গের প্রভাব থাকাটাই পরস্পর বিপরীতমুখী। তাই স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় যে গান পাওয়া গেছে প্রধানত লোকসংগীতের আদলেই সুকুমার্য। যেসব লোকসুরের বৈচিত্র্য গণসংগীতের সুরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ও মিশ্ররূপে পাওয়া যায় তার প্রধান প্রধান আঙ্গিক হলো–কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, তরজা, পুঁথি, বাউল, জারি, সাঁওতালি, ভাট, ধামাইল, গাজী, গম্ভীরা, মারফতি, হোলি, ছাদ পেটানো গানের সুর, ঝুমুর, পট, আঞ্চলিক-পল্লী ও মিশ্রসুর ইত্যাদি। তন্মধ্যে কিছু গানে সরাসরি লোকসুরকে ব্যবহার করা হয়েছে আর বেশির গান লোকআঙ্গিকতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ছাপ পাওয়া যায়। নিম্নরূপ প্রধান কয়েকটি লোকসুর-বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করা হলো–

সারি

সারিগান সিলেট ময়মনসিংহ নেত্রকোণা অঞ্চলে প্রধানত গীত হয়। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চল ভাটিয়ালি অঞ্চল। সারিগান নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার কালে সমবেত গীত হয়। সাধারণত সারিগানের চলন 'গা' এবং 'নি' কোমল-এর প্রভাব থাকে অর্থাৎ কাফি বা খাম্বাজ রাগের প্রভাব দেখা যায়। প্রচলিত একটি সারির নমুনা দেয়া যায় যেমন–

' । র্সা ণা । ধা পা মা । জ্ঞা – জ্ঞা । মা মা – । পা ণা ণা । র্সা – ণা । ধা পণা ধ । পা মা – ।'

সারিগানের সুর মূলত শ্রম বা কর্ম সংগীতের পর্যায়ে পড়ে বলে দ্রুত তালে দাদরা/খেমটার চলনে চলে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি অতিপ্রচলিত গানের উদাহরণ দেয়া যায়, তিনি লোকসংগীত ব্যবহার করেছেন সচেতন অবস্থান থেকে। ফলে স্বতঃফূর্ততা নিয়ে শিল্পীর নিজেরই অনেক গানে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যক্ত করে থাকলেও বৈচিত্র্য ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা মেলা ভার। একবার লুলা নদীর এক মাঝির কণ্ঠে তিনি শুনেছিলেন সিলেটের জনপ্রিয় সারিগান–

'সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধু ভাই
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।'

গানটির অনুকরণে রচিত হলো জাপ-বিরোধী একটি অবিস্মরণীয় গান–

'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে
কাস্তেটারে দিও জোরে শান॥

Dhaka University Institutional Repository

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।'

মূলগানটির মধ্যে বৈঠা বাওয়া তালের জীবনের সাথে জীবন-ধর্ম ও শ্রমের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা গেছে। মাঝিদের দৃঢ় অভিজ্ঞতাকে টেনে এনেছেন তাঁর গানে। এ বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বক্তব্য 'বেহেলী কৃষক সম্মেলনে গানটি নিয়ে গিয়েছিলো সুরথ পালচৌধুরী, গেয়েছিলো নির্মলেন্দু চৌধুরী।... সম্মেলনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল এই গান। কৃষকদের কণ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অতিদ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওই বিরাট সাফল্য আমাকে একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত করেছিল যে জনগণের চেনাজানা পরিচিত আঙ্গিকে বিপ্লবী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়াই হলো সঠিক রাস্তা।'[১৪] উপরোক্ত গানটিতে 'নি' কোমল শুদ্ধ মিলে খাম্বাজ রাগের প্রভাব সুস্পষ্ট। নমুনা-

স । সা	গা গা -া	গা গা মা	পা ধা ণা	ধা পা পা	-া -া পা	পা পা ণা	ধা পা মা	পা মা গা	-া -া।
কা স্ তে	টা রে -	দি য়ো -	জো রে -	শা - -	- ন্ কি	ষা - ণ	ভা - ই	রে - -	- - -

স । সা	গা গা -া	গা গা মা	পা ধা ণা	ধা পা পা	-া -া -া	-া -া -া	-া -া -া	-া -া -া
কা স্ তে	টা রে -	দি য়ো -	জো রে -	শা - -	- - -	- - -	- - ণ্

সুরচিত্র॥ কাস্তেটারে দিও জোরে শান

শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস আরো একটি গান সারির সুরে রচনা করেছিলেন। মুলগান-

'জাইলায় পাগল কইল তোরে
বাভনের মাইয়া গো,
জাইলায় পাগল কইল তোরে'

এই গানের সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলেন-

'লঙ্গর ছাড়িয়া নাওয়ের দে দুখি নাইয়ারে
বাদাম উড়াইয়া নাওয়ের দে।
ঢেউয়ের তালে তালে করতালি দে।'

বাংলাদেশে স্বাধিকার আন্দোলনের কালে রচিত একটি গান বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। শহীদ সাবেরের লেখা এবং শেখ লুতফর রহমানের সুরে গানটি আজো সভা-সমিতি মিছিলে সমান জনপ্রিয়-

'ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে দে
হেই আকাশে ডাকে যদি দেয়া ঘন ঘন
হেই ঝড়ো হাওয়া বয় যদি বয় অনুক্ষণ
বজ্রের গর্জন দশদিক কম্পিত ছিন্ন
তবু তোর পথ নেই বেয়ে চলা ভিন্ন
তুই পাড়ি দিবি আজ তোর বুকে বুক বেঁধে॥'

Dhaka University Institutional Repository

একই লেখক ও সুরকারের আরেকটি গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য–

'ওরে বিষম দইরার ঢেউ
উথাল পাথাল করে রে
নাও মাঝি তার সাথে নাচেরে
ও মাঝি এই কালে
বাদাম উড়াইয়া দাও তার সাথে ।'[১৫]

সারিগানের সুর যেমন প্রচলিত ভাটিয়ালির রঙ, তৎসঙ্গে রয়েছে শ্রমের চাঞ্চল্য, ফলে গণজাগরণে এই সুর মানুষকে সহজেই আমোদিত করে ।

কীর্তন

গণসংগীতে কীর্তনের প্রভাব স্বদেশীগানের উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত । ১৯৫০ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছবিতে প্রখ্যাত শিল্পী লতা মুঙ্গেশকরের কণ্ঠে একটি গান ধারণ করা হয়–

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি
দেখবে ভারত বাসী ।'

পরবর্তীতে অবশ্য ভারতবাসীর পরিবর্তে জগৎবাসী প্রচলিত হয়েছে । পীতাম্বর দাস বাউলের লেখা গানটি[১৬] অবশ্য অনেক আগের লেখা যা কোটি কোটি কণ্ঠে গীত হয়েছে । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে তৎকালীন লর্ড কিংসফোর্ড কে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে ক্ষুদিরামের (১৮৮৯-১৯০৮) ফাঁসি কার্যকর হয় । এতে ভারতবাসীর পরাধীনতার গ্লানি কতটুকু দগ্ধ করে রেখেছিল এই গানের মধ্যেই তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে । ক্ষুদিরামের দুঃসাহসী প্রতিরোধ পরায়ণতা বাঙালির বীরত্ব ও মহানত্বেও প্রতীক । স্বাধীন বাঙালি তথা ভারতবাসীর মায়েদের সন্তান বিসর্জনের আকুল বেদনা এবং অর্জনের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পায় ।

অবশ্য বাংলা গণসংগীত আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই স্বদেশীগানে দেশাত্ববোধ নিয়ে রচনা হয়ে গেছে বাংলার সমৃদ্ধতর সাংগীতিক পরিমণ্ডল । মুকুন্দ দাস তন্মধ্যে অন্যতম । যার গান বাংলাদেশের পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলন এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কালেও গীত হয়েছে সহস্র কণ্ঠে । কালী পূজারি প্রগতিশীল এই মহান শিল্পী দেশ মাতৃকার রক্ষায় যে অস্ত্র হাতে তুলেছিলেন তা শ্যামা-কীর্তন প্রভাবিত গানকে বুকে ধরেই । তাঁর গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল দুইভাবে । প্রথমত- লোকসংগীতে ভাষার আধুনিক ব্যবহার, যাত্রা-কীর্তন মিশ্রিত গণবাদীধারার সূচনা । অর্থাৎ কীর্তনকে বৈষ্ণবীয় কাঠামো থেকে সরে এসে যুগোপযোগী অধিকার ও বিপ্লবের শাক্তরূপ গ্রহণ । যা মুকুন্দ দাসীয় ঘরানা রূপান্তর করে । উদাত্ত কণ্ঠে যাত্রার মঞ্চে গেয়ে বেড়ানো তেমন দু'একটি গানের নমুনা–

'আয়রে বাঙালী আয় সেজে আয়
আয় লেগে যাই দেশের কাজে,
দেখাই জগতে এ ভেতো বাঙালী
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে ।'

Dhaka University Institutional Repository

অথবা–

'আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম॥'

অথবা দ্রুত দাদরা তালে গীত–

'বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনো ঘুমাও ।'

তৎকালের আরো অনেক গানই আছে সরল কীর্তনের প্রভাবে রচিত যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দাদরা তালে–

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার ফুল বাংলার ফল
পূণ্য হোক পূণ্য হোক
পূণ্য হোক হে ভগবান॥'

কাজী নজরুল ইসলামের দাদরা তালে রচিত–

'শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয়রে আয়
গিরি-দরী, বনে-মাঠে, প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥'

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫–১৯১০) লেখা দাদরা তালে–

'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই॥'

এই গানগুলো গণআন্দোলনের রাজপথে সমভাবেই গীত হয়ে আসছে চির আবেদন রেখে । উপরোক্ত গানগুলো স্বদেশীগান বলে পরিচিতি পেলেও গণসংগীত আন্দোলনেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সর্বমহলে ।

১৯৬৮ সালে উত্তরবঙ্গে সংঘটিত হয় ভয়াবহ বন্যা । এই দূর্যোগের উপরে রচিত নিবারণ পণ্ডিতের লেখা একটি গান 'বর্বরী কীর্তন' নামে উল্লিখিত । গানটি হলো–

'দেখে এলাম কলকাতায় কার্জন পার্কের অনশন মেলায়
সেথায় মাথা প্রতি দশটাকা নাম লিখলেই পাওয়া যায়
ধনীদের পা চাটা কুকুর সেথা জমেছে প্রচুর
নাম অনশন কীর্তন গাইছে সুমধুর
ঐ মার্কসবাদীদের কুৎসা কীর্তন কী সুমধুর শোনা যায় ।'

গণসংগীতের ধারায় মুকুন্দ দাসের সুরের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, রামপ্রসাদী কীর্তন বা নিধু বাবুর টপ্পার মতো মুকুন্দ দাসীয় কীর্তন নামে সুরের প্রচলন পরবর্তীতে লক্ষ করা যায় । কবিয়াল ফণি বড়ুয়া

Dhaka University Institutional Repository

তার গানে সুরের নির্দেশ করতে গিয়ে 'মুকুন্দ দাসের সুর'[১৭] বলে উল্লেখ করেছেন। এমন কয়েকটি গান নিচে তুলে ধরা হলো–

যুবসমাজ ও ছাত্রদের জাগরণের উদ্দামতায় রচনা করেছেন–

'চলরে জোয়ান এক সাথে
(দেশের) বর্তমান ভবিষ্যত কাঁদে পড়িয়ে বিভেদের ফাঁদে
প্রগতির স্রোত বালির বাঁধে পারিবে কি ঠেকাতে?'

নিম্নবিত্ত কৃষক-শ্রমিকদের স্বপক্ষে জয়গান গেয়ে সারাজীবন নিজেকে সপে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বর্ণনা করেন–

'দেশের দুঃখীর দুঃখ দেখি
নিম্নস্তরের কবি আমি নীচের তলার ছবি আঁকি
কাব্যরসে মধুর ছড়া, প্রাণবন্ত রসে ভরা
বড়কবি লেখকেরা রাখিয়াছে লিখি–'

ভোটের গান-

'এলো নির্বাচন হুঁশিয়ার ভাই দেশের বন্ধুগণ
নীতি ছাড়া পকেট মার সে তা পাইবা অনেক জন।' ইত্যাদি

ভাটিয়ালি

ভাটিয়ালি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সুরবৈশিষ্ট্য। বিশেষজ্ঞদের মতে সিলেট এবং পূর্ব-ময়মনসিংহের হাওড় অঞ্চলকেই প্রধানত ভাটিয়ালি অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে দেখা যায় এই সুরের প্রভাব খুলনা, কুষ্টিয়া, ঢাকাসহ অনেক এলাকা বিভিন্ন ধারার গানের সাথে মিশে গেছে। নদীর ভাটিতে থাকে শ্রমহীন স্বাচ্ছন্দ। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)এর সংগৃহীত মৈমনসিংহ গীতিকায় ভাটিয়ালির বর্ণনা পাওয়া যায়।

'ভাটিয়াল মুলুকে আছিল্ এক সদাগর
কুঠিয়াল আছিল্ সাধু নাম ধনেশ্বর।'

কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত এই সুরে লিখেছেন–

'আরে ও দেশবাসী আরে ও গরীব চাষী,
জীবন ভরা হাল বাইলাম,
কাল কাটাইলাম নিত্য উপবাসী॥'

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আরেকটি গান–

'ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে গো
মাগো পুড়ে হলেম ছাই
আমি কুল ছাড়িলাম, মান বেচিলাম
তবু দুঃখের অন্ত নাই।'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা এই গানটি ভাটিয়ালি সুরে হলেও কবিগানের চলনের প্রভাব লক্ষ করা যায় । গানটিতে প্রচুর পরিমাণে তানের কাজ । হবিগঞ্জের 'কুইনা' নামে এক লোক শিল্পী শ্রীহট্ট প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি বিনোদ চক্রবর্তীর বাড়িতে গাওয়া গান–

'দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গে
দুঃখ হরা নাম তোমার,
কী দুর্গতি ঘটালে এবার ।'

এই গানটির সুরেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস উপরোক্ত গানটি রচনা করেন । ১৯৪৪ সালে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে খালেদ চৌধুরী ও নির্মলেন্দু চৌধুরী গানটি প্রথম পরিবেশন করেন ।[১৮]

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এমনি আরো কিছু গানের নমুনা পেশ করা যায় । ১৯৪০ সালে ফ্যাসিবাদ ও জাপবিরোধী গান লিখেন–

'ও চাষী ভাই–
তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখরে চাহিয়া
তোর লুটে নেয় ফসল
দেশ-বিদেশী ধনিক বণিক ফ্যাসি দস্যুদল ।
পঙ্গপালে দলে দলে ছাইলো দুনিয়া ।

শিলচর জেলের মধ্যে কৃষক মাধবনাথের শহীদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত–

'আমরা তো ভুলিনাই শহীদ, সে কথা ভুলবো না
তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো যে আন্ধার জেলখানা ।'

দেশবিভাগের পর সিলেট থেকে চলে যাওয়ার পর কলকাতায় বসবাসকালে দেশের প্রতিটি নিসর্গের মায়ায় যে আকুতি তার বর্ণনা বারমাস্যা রীতিতে লেখা–

'আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা দরদী রে
আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে দরদী
কে দিল ভাঙিয়া ।...'

নিবারণ পণ্ডিতের লেখা বাস্তুহারার মরণকান্না সিরিজের লেখা গানে জীবন ও শিল্পের ভাগ্য ও দূর্দশার গভীর মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে । যে সুখ ও দেশপ্রেমের উপর ভর করে ভারত স্বধীন হলো, সেই স্বাধীনতাই হলো সংখ্যালঘু কিংবা ধর্মের পোশাক পরে ভিন দেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের । গানটি হলো–

'কই তোরা আজ দেশ হিতৈষী– ও দেশ দরদী ভাই ভগিনী,
(আজও) মাঝে মাঝে চমকে উঠিরে ভাই যেন নারায়ে তকবীর শুনি ।
মোদের মায়ায় ঘেরা ঘর ছিলরে বুক ভরা খুব আশা
স্বাধীনতার দমকা হাওয়ায় ভাঙলো সুখের বাসা
হয়ে বাস্তুহারা কপাল পোড়া রে ভাই দেশে দেশে আজ আমি গুণি ॥

Dhaka University Institutional Repository

কবিয়াল ফণিবড়ুয়ার অসংখ্য গণমুখীগান ভাটিয়ালি ও লোকসুরে রচিত তন্মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ–

নৌকার মাঝিকে সাবধান করে দিয়ে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে রচিত–

'উজান গাঙ্গের ও মাঝি ভাই জাইল ধর হুঁশিয়ারে
কোন কূলে দিয়াছি পাড়ি বল আমারে ।'

শ্রমিকের উদ্দেশ্যে লিখেছেন–

'ওরে ও শ্রমিক ভাই
তুমি আমি এক বেদনায় এই জীবন কাটাই ।'

দেশরক্ষার উপর ভিত্তি করে রচিত–

'শোন আমার দেশবাসীরে
শোন দেশের গান
দেশদরদী বন্দী করি দেশ রক্ষার বিধান–রে ।'

দুঃখীর দুঃখ ঘোচার বাসনায় রচিত–

'দুঃখীর দুঃখ ঘুচিবে কোন পথে– দুঃখীরে কইত ।'

অন্নবস্ত্র-শিক্ষাহীন জীবনের দুর্দশা নিয়ে রচিত–

'দুঃখের আগুন বুকে নিয়ে নীরবে আর কাঁদিস নারে ।'

ভাষা আন্দোলনে শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অসংখ্য এবং সবচেয়ে বেশি গান রচিত হয়েছে বাংলার গণসংগীত আন্দোলনে। তন্মধ্যে যে গানটি ৫২'র শহীদের মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি করে, শামসুদ্দিন আহমেদ-এর রচিত ও আলতাফ মাহমুদের ভাটিয়ালি সুরারোপিত। গানটির সুরের নমুনা নিম্নরূপ–(কাহারবা)

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি
তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি॥ ও বাঙালি..
মাও কান্দে বাপ কান্দে কান্দে জোড়ের ভাই
বন্ধু-বান্ধব কাইন্দ্যা কয় হায়রে খেলার সাথী নাই॥ রে বাঙালি..'

নিম্নরূপ গানটির ভাটিয়ালি সুরের নমুনা দেয়া হলো–

-া -া গরগা গরা	গা -া গা -মা	পা -ধা ধণধা -পা	ধপধাঃ -পঃ মা -গা	রগরা -সা সা -গা
০ ০ তো০০রা০	ঢা ০ কা র	শ ০ হ০০ র	র০০ ক্ তে ০	ভা০০ ০ সা ই
গরা -রা -সা -া	-া -া নধনা -ধা	না নধর্সা সা -া	-া -া -া -া	র্সর্রা -র্গা -া -া
লি০ ০০ ০ ০	০ ০ ও০০ ০	বা ঙা০০ লি ০	০ ০ ০ ০	ও০ ০ ০ ০
-া -া -া -া	র্রর্মা -র্গমা -র্রা -র্সা	-না -া র্রর্সর্রা -া	র্সা -া -া -া	-া -া -না -া
০ ০ ০ ০	ও০ ০০ ০ ০	০ ০ ও০০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০

Dhaka University Institutional Repository

ভাওয়াইয়া

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁওসহ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আসাম অঞ্চলের গীতরীতিতে ভাওয়াইয়া প্রধান। ভাব থেকে ভাওয়াইয়ার উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রেম, বিরহ, প্রকৃতি, স্বভাব, আবেগ, ধরণ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। তবে গানের গভীরতর অর্থ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় জীবনের গভীর বঞ্চনা, টানাপোড়েন থেকে ভেসে আসা আর্তি কিংবা মৌন প্রতিবাদেরই প্রকাশ।

‘ধীরে বোলাও গাড়ী রে গাড়ীয়াল
আস্তে বোলাও গাড়ী,
আর এক নজর দেখিয়া ন্যাও মুঁই
দয়াল বাপের বাড়ীরে গাড়ীয়াল
দয়াল বাপের বাড়ী॥’

এখানে একদিকে যেমন বাপের বাড়িকে দয়া-মায়ার স্থান মনে করে গৃহবধূ, অন্যদিকে শ্বশুর বাড়ীর নীরব নির্যাতন-অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে ওঠে গোপন দুঃখের মতোই, সেই সাথে ইঙ্গিত রেখে যায় প্রতিবাদের মৌন প্রকাশ। বাংলা নারীবধূদের জীবন যেন এভাবে সবকিছুই সয়ে যাওয়ার প্রতীক।

ভাওয়াইয়া অনেকটা ঢেউয়ের মতন দীর্ঘ সুরের গান এবং মীড় প্রাধান্য। বিশেষ একটি স্বরের দিকে অবারিত ঝোঁক লক্ষ করার মতো। ভাওয়াইয়া গান আকুতিময় বঞ্চনাময় (প্রেমিক বা সোয়ামি কর্তৃক) করুণ সুরের গান নারীর চিত্তদাহ ও হৃদয়ার্তির প্রকাশ। গণসংগীতে ভাওয়াইয়ার প্রভাব অনেকের গানেই উপস্থিত; তন্মধ্যে বিনয় রায়, নিবারণ পণ্ডিত, আবদুল করিম, হরলাল রায় অন্যতম।
নিবারণ পণ্ডিতের ভাওয়াইয়া সুরে লেখা গান–

‘মূর্খু গীদাল হামরা গুলা ভাওয়াইয়া গান গাই
হাল বাড়ির কানাই সারি দুতারা বাজাই’[১৯]

ভাওয়াইয়া সুরে আরেকটি গান বলা হয় এইটা বাঙালি অধিকারের প্রথম গান। আবদুল করিম ১৯৫১ সালে এই গানটি রচনা করেন–

‘ও ভাই মোর বাঙালী রে
চতুর্দিকে জ্বলে সুরুজ বাতি
তোমার ক্যানে বল আঁধার রাতি রে
হায়রে হায় পরের বোঝা
তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই।’

লেখকের বড়ভাই বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া শিল্পী আব্বাসউদ্দিন এই গানের সুর দিয়েছিলেন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক হরলাল রায় (১৯২৩-১৯৯৪) ভাটিয়ালির ঢংয়ে রচনা করেন স্বাধিকার আন্দোলনের বিখ্যাত গান, সুর করেন রথীন্দ্রনাথ রায়। শ্লেষ-দুঃখ-ইতিহাসের চরিত্রগুলো অসাধারণ ভাবে উঠে এসেছে এই গানে–

‘ও বগিলারে
কেনবা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

শিয়াল কান্দে কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া
দুপুর রাইতে ডুপুর কান্দে ভুট্টা বড় মিয়া কান্দে
ও বগিলারে–'

চটকা

ভাওয়াইয়া এবং চট্‌কা একই অঞ্চলের হলেও উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো, ভাওয়াইয়া টানাসুর যুক্ত করুণ বিচ্ছেদাত্মক কার্ফা তালে ধীর লয়ের একক সংগীত আর চটকা হলো ভাঁজহীন দাদরা ও ঝুমুর তালের লঘুসুরে আনন্দ-প্রেম প্রকাশ নির্ভর একক বা দ্বৈতভাবে গীত। নিবারণ পণ্ডিত প্রচলিত চটকার সুরে রচিত পয়ারের ঢংয়ে গান লিখেন–

'ও কি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক ঘরের বাহিরা।
মেলা পুলিশ আসিল বাড়ি, মোর ঝড়ুক নিলে ধরি
সেদিন হতে মুই চাড়িনুরে ঘর বাড়ি।'

পণ্ডিতের আরেকটি গান তোর্ষা নদী ভাঙার গান। যার সুরারোপ করেন ঢোড়া গীদাল–

'ও বাহে দেওয়ানীর বেটা গুরুপ লইয়া হইল ভীষণ লেঠা
সরকার নোটিশ দিয়াছে এখন
মন্দ আর কইবেন কারে চাষীর দুঃখ পেল নারে
(আবার) তোর্ষা নদী ধইর‍্যাছে ভাঙন।'

বিনয় রায় রংপুরের চটকার সুরের প্রণয়ন করেন–

'গরীব দেশবাসী, গরীব কিষাণ চাষী
খেতত করলিরে ফসল
সেই ফসল কাইড়া নিল মজুতদার বাটপাড়ে॥'

গানটি লেখক 'ডাঙুয়ার বধূয়া তুই' গানের সুর অবলম্বনে লিখেছিলেন।

তরজা

কবিয়াল রমেশশীল গণমানুষের সংগ্রামী চেতনাকে বহন করে বেরিয়েছেন আঞ্চলিক সুরধারায়। তাই তার গানে মাইজভাণ্ডারি, ভাটিয়ালি উপজাতি ও তরজা প্রধান হয়েছিল সর্বক্ষণ। ফলশ্রুতিতে তার শিষ্যকূলের মধ্যে ফণিবড়ুয়ার গানেও একই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ–পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভাবান গীতিকার গুরুদাস পাল রমেশ শীলের ভাবদর্শী হয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের তরজার লৌকিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে স্বকীয় পথ খুঁজে নেন। ফলে তার গানে তরজার রূপ প্রতিফলিত হয় শ্লেষ, বিদ্রুপ ও শ্রেণী ঘৃণা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠার মধ্যদিয়ে। ১৯৬৭ সালে পাঞ্জাবি-অপাঞ্জাবিদের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত একটি গান বাংলার ঘরে ঘরে লোকসংগীত হিসেবে গীত হয়ে চলেছে–

Dhaka University Institutional Repository

'স্বভাব তো কখনো যাবে না, ও হো মরি
থাকিলে ডোবাখানা হবে কচুরি পানা
বাঘে হরিণে খানা একসাথে খাবে না।'

এই আঙ্গিকের সুরের আরো একটি গান 'কত্তা ভজার গান' বলে স্বীকৃত। ভোট প্রার্থী উপরের লেবাস আর ভিতরের বাসনার ছদ্মবেশী মনোভাব তীক্ষ্ণরূপে বের হয়ে এসেছে–

'আমি কত্তা ভজার দলে
বাইরেতে বোষ্টুমি আমি, (আমার) ভেতরে দুর্নীতি চলে॥..
বাস্তুহারার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোখের জলে
যদি কচে বারো করতে পারি ইলেকসন্‌টার তলে তলে॥'

গম্ভীরা

বাংলাদেশের গণমুখী সংগীতে গম্ভীরার অবস্থান আদিকাল থেকেই পরিচর্যাময়। গণসংগীতে রাজনৈতিক আদর্শ, শ্রমিক কৃষক ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অস্থিতিশীলতা ও জাগরণের প্রত্যয় প্রকাশ করে থাকে। লোকসংগীত গম্ভীরায় একই ভূমিকা আবিষ্কার করা সম্ভব। সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, অধিকার ও সংকট নানা ও নাতি চরিত্রের মধ্যে গল্পচ্ছলে-নাট্যভঙ্গিতে-গানে উঠে আসে সরাসরি। 'গম্ভীরা গানের শিল্পী তাই গণশিল্পী, তার কবি গণকবি।'[২০]

গম্ভীরা গানের শিল্পীরা হয়তো শহুরে শিক্ষিতের মতো নয়। এ কবিরা গভীর জ্ঞান বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো গভীর ব্যাখ্যায় বা তত্ত্বকথায় মুখর নয় কিন্তু জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান দেখিয়ে সঠিক শিক্ষায় অভিষিক্ত। ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে মীর জাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায় যখন বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত। তারপর দু'শো বছর ব্রিটিশ শাসন ও চক্রান্তে এদেশ পর্যুদস্ত, সে সময় নানা ভাবে বাঙালিরা প্রতিবাদ করেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণেও যে গানগুলো এসেছে গম্ভীরায় এদেখে বোঝা যায় গণসংগীত ধারণাটি ১৯৪০'র দিকে আবিষ্কার করা হলেও বাংলা লোকনাট্য নির্ভর গম্ভীরায় শত শত বছর ধরেই তার প্রয়োগ ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

'বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁচা।
সিপাহী সব মিল্যা অদের করলে বলির পাঁঠা।'

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষই যখন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রতিবাদের সিদ্ধান্তে অটল, তখন গম্ভীরার কথক বলছে–

'জাগ বাঙালি ছাড় বাঙালি উঠা কাচ্চি পাকি
ও বঙ্গভঙ্গ এক হোয়ে যাক, রেখে ধর্মসাক্ষী
নইলে বাঙালির স্থান নাই, ভারতে হলি ছন্নছাড়া॥'

আধুনিক গম্ভীরা গানের স্রষ্টা সুফী মাস্টারের লেখা খেলাফত আন্দোলনের পক্ষে ও জালিয়ানবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের উপরে রচিত–

Dhaka University Institutional Repository

আর কতকাল, হে মহাকাল — থাকবা বসে যোগে
গা তোল–উঠেছে সব জেগে — হিন্দু-মুসলমান মেথর ডোম
খেলাফৎ কমিটির চর্চা — উঠেছিল পাঞ্জাবে।
শুনতে পেয়ে ইউরোপবাসী — কামান গোলা এনে রাশি রাশি
তোপেতে লাগিয়ে দিয়ে আগুন — সকলকে করলে বাগুন
ইংরেজ সরকার অ-কারণে, — মারল প্রাণে
ঘেরে জালিয়ানবাগে — গা তোল উঠেছে সব জেগে॥'[২১]

তবু ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ধর্মভিত্তিক চিন্তার উপর খণ্ডিত হয়ে গেল। গম্ভীরা তার সে বিষয়ে বাঁধা হলো–

'নিজের ঘরে হো'নু পরবাসী
থাকতে বাপের ভিটা মাটি
এ কুন দ্যাশ একি হ'লো
থাকতে ভারত মা।
হে নানা, ওহে ভোলা নানা॥'

স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি ও বেদনাভার বয়ে যাওয়া আরেকটি গান।

'বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি
হাজার ত্যাগের ফল
কত লোকের রক্ত গেল
তারপরে স্বাধীন হলো
এ সব কথা বলতে গিয়্যা প্রাণে লাগে ব্যথা॥

হে নানা, বলব ক্যামনে হে
হাঁরঘে (আমাদের) দুঃখের কথা॥'[২২]

গম্ভীরা নানা সময়েই প্রশাসনের দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতির জন্য কাল হয়েছে। সেইসব নায়ক নানা ও নাতির বেশ ধরে সাহস যুগিয়েছে, কাঁপন ধরিয়েছে শোষকের বুকে। ফলে যুগে যুগে সরকার প্রশাসন তাদেরকে কখনোই সুনজরে দেখে নি[২৩] তবু গণসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আঙ্গিককে উৎকর্ষমণ্ডিত করেছে শত-সহস্র তরুণ-প্রবীণ। সুফী মাস্টারের সময় গোপাল দাস, ড. সতীশচন্দ্র প্রমুখ এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের উদ্যোগে গম্ভীরা এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ফলে পরবর্তীতে আরো অনেক লোকশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। তন্মধ্যে 'ধরণী ডাক্তার, বিশু পণ্ডিত, গোবিন্দ শেঠ, আবদুল মজিদ, সুলেমান ডাক্তার, সতীশ মণ্ডল, ফজলুর রহমান এমন অনেকে। এরা দেশের চোরা কারবারী, দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অনাচার ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ গাথা রচনা করেছেন এবং পরিবেশনার বিশিষ্টতায় তা আরো বেশি আকর্ষনীয় হয়েছে।[২৪]

পরিবেশনারীতি ও সুরবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, লোকনাট্যের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও সংগীতের আবেদন সমান্তরাল, অর্থাৎ Musical Drama বলাটাই শ্রেয়। মূল চরিত্র নানা ও নাতি ছাড়াও মঞ্চের একপাশে ৪/৫ জন দোহার ও বাদক দল থাকে। সাধারণত ঢোলক, হারমোনিয়াম,

Dhaka University Institutional Repository

বাঁয়া-তবলা সহযোগি বসে। অবশ্য সনাতন গম্ভীরা গানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল ঢোল, খোল, জুড়ি, সানাই, হারমোনিয়াম। কিন্তু ইদানিং ইউরোপিয় ক্লারিওনেট, কীবোর্ড-এর সংযোগ লক্ষ করা যায়। গম্ভীরার চলন ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া[২৫] এবং চট্‌কার সুরাশ্রয়ী। ক্ষীরোল-এর বৈশিষ্ট্য বিশেষজ্ঞদের মতে 'দীর্ঘ সুর সম্পন্ন ভাওয়াইয়া গান ও চটকা সুর সম্পন্ন ভাওয়াইয়া গানের মধ্যবর্তী একপ্রকার সুর পরিলক্ষিত হয়। এই সুরের গানকে ক্ষীরোল গান বলে।... ভাওয়াইয়া গানের মতো এর সুর কিছুটা টানা– তবে ভাওয়াইয়া গানের সুরের প্রধান আকর্ষনীয় যে দিক, মাঝে মাঝে গলা ভেঙ্গে যায়, ক্ষীরোল গানে তা নেই।[২৬] গম্ভীরা ভাওয়াইয়া অঞ্চলের ধারা বলেই হয়তো ভাওয়াইয়ার প্রভাব এমন প্রবল তবে কখনো কখনো ঝুমুরের প্রাধান্য উল্লেখ করার মতো। এতদা মিশ্রণের মধ্যদিয়েই গম্ভীরার নিজস্ব একটা রূপ দাঁড়িয়েছে, সেই ঢং বা রূপ দিয়ে গম্ভীরা কে খুব সহজেই চেনা যায়। নিম্নরূপ গম্ভীরা সুরের একটি সুরের নমুনা দেয়া হলো। খেমটার চলনে[২৭]–

স স ম	ম ম প	জ্ঞ ম জ্ঞ	র স –	স স র	ণ্ ণ্ স	স – –	– – –
ম – প	প প ণ	ণ ণ –	ধ প –	প ধ প	ম গ –	গ গ প	ম – –
ম – প	ন ন –	ন ন র্স	ন র্স –	র্র র্র র্জ্ঞ	র্র র্স –	ণ র্স ণ	ধ প ধ
প প র্স	র্স র্স র্র	ণ স ণ	ধ প –	প – ধ	ম ম প	প প –	– – –

জারি

জারিগান প্রধানত পরিবেশন করা হয়ে থাকে খুলনা, বরিশাল, যশোর, কুষ্টিয়া অঞ্চলে। ময়মনসিংহ অঞ্চলেও এর জনপ্রিয়তা আছে, তবে উভয় এলাকার পরিবেশনারীতি ভিন্ন। সেইসব গীতিপদ্ধতির আদলে রচিত গণসংগীতে বেশকিছু গণজারির সন্ধান পাওয়া গেছে। সুরবৈশিষ্ট্যেও কবির আঞ্চলিক সুর-প্রভাব লক্ষ্যনীয়। জারির সুরে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য তার আঙ্গিকগত কারণে। ধুয়াতে যেমন নিচের দিকে সুরের চলন। ধীরে ধীরে বিষয়ের গভীরে ঢোকার সাথে সাথে সুরে তীব্রতা বাড়তে থাকে এবং তালের লয়ও দ্রুত হ'তে থাকে। কখনো অতি তারায় (সোপ্রানো) গিয়ে গান চলতো থাকে নিম্নরূপ ধুয়ার সুরের চলনের নমুনা প্রদর্শন করা হলো।

ম	–	–	ম	ম	–	প	ম	গ	ম	প	দ	প	–	–	–
ণ	–	ণ	–	ধ	ণ	র্স	র্র	র্জ্ঞ	র্র	র্স	ণ	ণ	ধ	প	দ

একটি জারি বন্দনার নমুনা দেয়া যেতে পারে সাধারণত পুথিপাঠের ঢং-এর মতো মনে হলেও পুথিতে বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করা হয় না। এখানে তাল লয় মানা হয়। সুরও অনেকটা তীব্র হয়। যেমন–

ম	ম	ম	ম	ম	প	প	ধ	ম	প	প	ধ	প	–	–	–
পর	থ	মে	বন	দ	না	ক	রি	প্র	ভূ	নি	রন্	জ	०	०	ন
র্স	র্স	র্স	র্স	ন	ন	ধ	ধ	প	ধ	ম	ধ	প	–	–	–
যা	হা	যা	কুদ	র	তে	পয়	দা	এ	তি	ন	ভু	ব	–	–	ন

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের পার্থক্য থাকলেও মূলত জারিগানগুলো ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করেছে। কয়েকজন গণসংগীত শিল্পীর জারিগানের তালিকা দেয়া হলো–

ক্রমিক	বিষয়	রচয়িতা	রচনাকাল
১	নীল বিদ্রোহ	নিবারণ পণ্ডিত	১৯৬০
২	ভাষা আন্দোলন	আবদুল লতিফ	১৯৫৫/৫৬
৩	শেরে বাংলা	আবদুল লতিফ	১৯৫৫/৫৬
৪	ভাষা আন্দোলনের জারী	আবদুল হালিম বয়াতি	
৫	মম্বন্তর ১৯৪৩	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	
৬	মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৯৪৮ (উন্মেষ)
৭	ভোট বৈতরণীর কাব্য	নিবারণ পণ্ডিত	১৯৫১
৮	স্বরাজ মাহাত্ম্য	নিবারণ পণ্ডিত	

১৯৬০ সালে নীল-বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত জারিগান (নাচসহ) রচনা করেন। বিখ্যাত এই রচনা কর্মে নীল-বিদ্রোহের বাস্তবতা ও তৎকালীন ব্রিটিশদের কু-শাসনের বর্ণনা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গানটি হলো–

ধুয়া (সকলে) ও হারে ও নীলকরে করলো সর্বনাশ
ধনে প্রাণে চাষীকুল হইল বিনাশ, ও হারে নীলকরে...

মূল গায়েন (নৃত্যসহ)
শোন কথা বলছি ভাইরে শোন দিয়া মন
বহুদিনের কথা এটা অতি পুরাতন
প্রাচীন কাল হইতে বাংলায় চলত নীলের চাষ
নীল চাষ করিয়া চাষীর চলত বারোমাস।'

রচয়িতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্ম 'ভোট বৈতরণীর কাব্য'। "১৯৫২ সালের এপ্রিলে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-বামপন্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়ে দুইবন্ধুতে (নিবারণ পণ্ডিত ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস) যৌথভাবে রচনা করলেন "ভোট বৈতরণীর কাব্য ও মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য"।...ভোট বৈতরণীর কাব্য একটি দীর্ঘ জারিগান–প্রতি পাঁচ ছত্রের এক একটি অধ্যায়ে মোট ১২টি অধ্যায়ের সমষ্টি এ গান।"[২৮] গানটির বন্দনার কিছু অংশ দেখানো হলো–

'মাণিকরে
কংগ্রেসের ভাঙ্গা নাও দে ডুবাইয়া দে
পঁচিশ বছরের পাপের সওদায় বোঝাই হইয়াছে,
দে ডুবাইয়া দে
পরথমে বন্দনা করি কংগ্রেসী স্বরাজ (হো হো হো)
যার দৌলতে আঙ্গুল ফুল্যা হইল কলাগাছ...'

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালের কৃষক সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রচিত একটি জারিগান মঞ্চে উপস্থিত বহুসংখ্যক কৃষক গায়ক-বাদক দলের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়। গানটি হলো–

'কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে
হায় দুঃখ সয় না প্রাণে রে।
হায় হায়রে–
বুঝলাম না বুঝলাম না বাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শেষে সঙ্কটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে কত মা বোন শিশু হাজারে হাজারে॥'

এই সম্মেলন সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন–"পয়তাল্লিশ ইংরেজীতে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে নিবারণ বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হলো। পদ্মকে যেমন দেখতে দীঘির জলে, লোককবিকে তেমনি চিনতে হয় জনতার মাঝখানে।...নেত্রকোণায় পেশী বহুল চাদর গায়ে, কোমরে গামছা বাঁধা লুঙ্গি পরা মুসলমান জারীনাচের দলের মাঝখানে যখন তাদের কবিকে দেখলাম, সেদিন চিনলাম জনগণের জাদুকরকে"[২৬] সিলেটের করিমগঞ্জ অঞ্চলের পাথরকান্দিতে এক কিষাণ সম্মেলন হয়েছিলো, শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস বাংলা দুর্ভিক্ষ নিয়ে একটি গান জারি আঙ্গিকে লিখেন। গানটি হলো–

'ও হারে কৃষক মরিলায়
ডুবিল ডুবিল তরি অকূল দরিয়ায়।'

তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য' অতি জনপ্রিয় হলেও জারির পাশাপশি অন্যান্য ধারারও মিশ্রণ রয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক আবদুল লতিফ ১৯৫৫/৫৬ সালে রচনা করেন একটি পূর্ণাঙ্গ জারি। স্বাধীন পাকিস্তান হওয়ার পর পশ্চিমা শাসক বাংলা ভাষার উপর শুরু থেকেই কিভাবে অবদমন প্রক্রিয়া চালু করেছিল সেই প্রহসনের ইতিহাস থেকে ৫২'র আত্মাহুতি পর্যন্ত বলা যায় একটি ভাষা আন্দোলনের দলিলের মতো দীর্ঘ জারিগান বিভিন্ন মঞ্চে সারা জীবনই গেয়ে বেড়িয়েছেন।
গানটির অংশবিশেষ–

'কি বলিতে কি বলিব ভাবিয়া না পাই
খুনে রাঙা কয়টি কথা সভাতে জানাই॥...

ভাবলাম কেহ হব হাকিম, জজ ও ব্যারিস্টার
ন্যায্য দাবি মিটবে এবার পাব হক বিচার॥

আশার মুখে ছাই পড়িল না মিটিল আশা,
খোয়াইতে বসিলাম ভাইরে বাপ দাদারই ভাষা॥...

উনিশ শ' বাহান্ন সালে ভাই ফেব্রুয়ারি মাস
একুশ তারিখ সেদিন ছিল হইল সর্বনাশ॥...

Dhaka University Institutional Repository

তোরা দেখবি কেরে আয়রে আয়
কচি বুকের তাজা খুনে দইরা বইয়া যায়॥...'

শিল্পী শেরে বাংলা ফজলুল হককে নির্বাচনে বিজয়ী করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রত্যয় গ্রহণ করা আরেকটি জারির সন্ধান পাওয়া যায় ।

'ভাষা আন্দোলনের জারী' রচনা করেন আরেক স্বনামধন্য বিচারগানের শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি । তার অসংখ্য গণমুখী গানের মধ্যে এই জারিগানটি ভাষা ইতিহাসের অন্যতম দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায় ।

হোলি

হোলি সিলেট অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় আনন্দ সুরাশ্রয়ী গীত । বসন্ত-উৎসব আনন্দের যে সুর হোলির মধ্যে প্রবাহিত এমন উদাহরণ বাংলার অন্য কোনো ধারার সাথে মেলা ভার জারি বা ধামাইল ব্যতীত । হাসন রাজা, সৈয়দ শাহ্নূর এজাতীয় সুরের দিকপাল । শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসও এই সুরে গান লিখে সারাবাংলা জয় করেছিলেন । পাবনায় জন্ম বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী দিলীপ বাগচীর বর্ণনায় "গোলমোহরের একটি জলসায় একদিন দু'টি গান শুনলাম । একটি হেমাঙ্গদার 'বাঁচবো বাঁচবো রে আমরা, বাঁচবো রে বাঁচবো/ ভাঙ্গাবুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়বো' গান আর অন্যটি সলিলদার 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' । দু'টি গানই আমাকে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভবের জগতে পৌঁছে দিল । বিশেষ করে, 'বাঁচবো বাঁচবো রে' গানটি শুনে বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করে উঠেছিল । দেশত্যাগের বেদনা তখনো বাজছে বুকে । ঐ গানটি আমাকে গণসংগীতের জগতে প্রবেশ করার তথা সাম্যবাদী আন্দোলনের শরিক হতে প্রেরণা জাগায় ।"[৩০] যাইহোক এইগানটি তিনি লিখেন একটি প্রচলিত গানের সুরাবলম্বনে । তা হলো–

'আজ হোলি খেলবো রে শ্যাম তোমারি সনে
একেলা পাইয়াছি রে শ্যাম এই নিধুবনে॥'

গানটির শুরু ৩+২+২ মাত্রায় ঝাঁপ তালে, অন্তরাতে গিয়ে ঝুমুর এবং খেমটার ফেরতা দিয়ে শেষ হয়েছে । নিম্নরূপ সুরের নমুনা দেয়া হলো

মা	।	।	মা	।	মা	।	পদা	দা	পা	ম	পমা	গা	।
বাঁ	০	চ	বো	০	বাঁ	চ	বো	রে	০	আ	ম	রা	০
মা	।	ধা	ধা	।	ধা	ণা	র্সা	।	।	ণর্রা	র্সর্রর্সা	ণা	ধা
বাঁ	চ	বো	রে	০	বাঁ	চ	বো	০	০	০	০	০	০
র্সা	র্সা	।	র্সা	।	র্ঝা	র্সা	ণা	ধা	।	প	।	মা	পমগা
ভা	ঙা	০	বু	০	কে	র	পাঁ	জ	র	দি	০	য়া	০
।	গগা	।	মা	।	মা	পমা	গা	।	রা	সা	।	।	মা
০	নয়া	০	বা	ঙ	লা	০	গ	০	ড়	বো	০	০	০

Dhaka University Institutional Repository

ছাদ পেটানোর সুর

চুন-সুরকির ছাদ পেটানোর সময় গান করা ছিল এক আবশ্যিক ঐতিহ্য। বর্তমানে ছাদ পেটাতে হয় না, সিমেন্টের ঢালাই-এর প্রচলন এলে ছাদ পেটানোর শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রমিকের আর প্রয়োজন হয় না, ফলে এই ধারা বিলুপ্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। স্তালিনগ্রাদে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাধন দাশগুপ্তের একটি গান ঢাকার আঞ্চলিক ছাদ পেটানোর গান–'আর দে দে কানাইয়া লাল বসন আমার হাতে দে, কুল নারী মরি লাজে তে'-এর সুরাবলম্বনে লেখা–

> 'আরে দে দে স্টালিন ভাই পায়ে পড়ি ছাইড়া দে
> আমি আর্য হিটলার মরি লাজেতে।'

এই গানের মধ্যে একটি বর্ণনা অনুযায়ী হিটলার অনেক নাকে খত্ বা কানমলা খেলেও স্তালিনের রাগ যেন দমে না। তার কাছে হিটলার এতই জঘন্য যে, সে আরো তীরস্কার করে বলে– 'লজ্জা নাইরে হেটলর, লজ্জা নাইরে তোর/ গোয়েরিং-এ গলায় বাইন্দা জলে ডুইব্যা মর।' এমন শ্লেষাত্মক গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তৎকালে ঢাকার বিভিন্ন মঞ্চে শিল্পী এই গান গেয়ে বেড়িয়েছেন।

এভাবে প্রতিগানেরই বিশ্লেষণ করা যায় সুরের ঢঙ দেখে। নিম্নরূপ আরো বেশকিছু গানের উল্লেখ করা হলো যা লোকসংগীতের আশ্রয়ে বিকশিত হয়েছে। পুথির সুরে রচিত রমেশ শীলের গান– 'হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ/ বারে বারে দেশে কেন ঘটে অঘটন।' নিবারণ পণ্ডিতের বিখ্যাত টসার গান– 'শুনেন সবে ভাইসব শুনেন দিয়া মন/ টসার কাহিনী একখান করিব বর্ণন/ টসায় বুঝে যাহা...'। বাউল সুরে লেখা তার আরেকটি গান– 'হরি তোমার অপার লীলা বোঝা হল ভার'। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি গান– 'হায় হায়, ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায়' গানটি ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউল সুরের একটি গান 'আইলরে চৈতন্যের গাড়ী, সোনার নদীয়ায়'-এর অবলম্বনে । সত্যেন সেনের লেখা ৪৩-এর মন্বন্তর নিয়ে– 'কি করি উপায় রে কি করি উপায়, পঞ্চাশে বাঁচন হইল দায়।' কবিয়াল ফণি বড়ুয়া বৈষ্ণবীয় সুরে লেখেন– 'দেশের কী উন্নতি হলে স্বাধীনতা পাই/ লোভীর লোভে মূল্য দিয়ে কাঁদে গরীব ভাই।' কিংবা 'জানে কয়জনে, জানে কয়জনে/ স্বাধীনতার সুখ-সুবিধা পাবো কেমনে।' গানগুলো সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যাসহ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল। সাঁওতালী সুরে রচিত টগর অধিকারীর একটি গান–'দিনের শুভা সুরুজরে, রাতের শুভা চাঁদ' এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের– 'লাঙল চালাই আমরা কোদাল চালাই/ নাচের তালে তালে আমরা ফসল বাড়াই।' এবং একধরণের গাথামূলক (Ballad) গান ভাটের সুরে তিনি রচনা করেন– বানিয়াচঙে ম্যালেরিয়া মহামারীতে দশহাজার মানুষের মৃত্যুর শোকে– 'বানিয়চঙে প্রাণ বিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী/ হাজার হাজার নর-নারী মরছে অসহায়।' এছাড়া রাজেন্দ্র নন্দীর লেখা– 'আজি দেখ না চেয়ে, আসছে ধেয়ে ফ্যাসিস্ট দস্যুদল/ জাপ-জার্মান মিলে তুলছে মরণ কোলাহল' উল্লেখযোগ্য।

সিলেট অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বিয়ের গীত ধামাইল সুরে বেশকিছু গান পাওয়া যায়। গণসংগীতের জগতে সবচেয়ে শ্লেষাত্মক গান বলে উল্লেখযোগ্য আবদুল গফ্ফার দত্ত চৌধুরীর লেখা ও সুর করা 'ও এগো সজনী, গুয়া গাছে টেক্সো লাগিলনি/ বাটার উপর পইল ঠাটা গাল ভরি পান খাইতায়নি' হেমাঙ্গ বিশ্বাসের– 'বল সখি বল বল আমারে/ ওকি ঘরের বার কুলের বার করলো নারীরে।' শরিষার তেলের

Dhaka University Institutional Repository

আকাল নিয়ে রচিত ব্যঙ্গাত্মক গান– 'আজব দেশের আজব খেলা/ কোনো যুগে শুনছনি সজনি/ হইরর তেল কোন দেশ গেল খবর জাননি ।'

চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে খেলা প্রচলিত ঝুমুরের সুরে রচিত শুধাংশু ঘোষের– 'হামরা কোদাল চালাই পয়দা বাড়াই, ধন দৌলত গড়ি/ দেশ বাঁচাবার ডাক এলো আজ চুপে রইতে নারি ।' ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঘোষাপটের সুরে রচিত নিবারণ পন্ডিতের লেখা– 'ভাইরে কিলের ডরে আইলাম দৌড়ে বড় দাদার ধর/ দাদা-বৌদি মিল্যা কিলায় বেইলের আড়াই পর ।'

লোকসংগীতের নানা আঙ্গিকের সংমিশ্রণও গণসংগীতে দেখা গেছে ব্যাপক ভাবে। সর্বোপরি গণসংগীতের অধিকাংশ লোকসুরের অধীন বলে অনেকেই গণসংগীতকে লোকসংগীত বলে ধারণা পোষণ করে তা যেমন সংজ্ঞার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্রুটিপূর্ণ আবার প্রচলিত অনেক গানই লোকসুরে প্রচলনের ফলে লোকসংগীতকে গণসংগীত মনে করে। গণসংগীত স্বকীয় কাঠামো ধারণ করার ক্ষেত্রে যে যুগোপযোগী রাজনৈতিক ও আঙ্গিক আদর্শকে বহন করেছে, তা কিছু কিছু লোকশিল্পীদের প্রভাবিত করেছে. অতএব শ্রেণীসচেতনতার অবস্থান থেকে অনেক লোক সংগীত গণসংগীতের মর্যাদা পেয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রীয় সুর

গণসংগীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহার বহুভাবেই এসেছে। লোকসংগীতে যেভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়। বাংলা গানের যে কোনো শৃঙ্খলাপূর্ণ সুরকেই ভারতীয় রাগ-রাগিণীতে ফেলা সম্ভব তবে কখনো কখনো সচেতন ভাবেই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া অনেকে সরাসরি রাগ-রাগিণীর চলন অনুযায়ী গণসংগীত রচনা করেছেন। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণে তিন ভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার আলোকপাত করা হলো–

প্রথমত– পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে যে লোকসংগীতে কীভাবে রাগসংগীতের প্রভাব কাজ করে। বিশেষ করে এক এক অঞ্চলের লোকসংগীতে এক এক ধরণের রাগ-রাগিণীর প্রভাব লক্ষ করা গেছে[৩১]। ভাটিয়ালি গানে যেমন খাম্বাজ, কাফি, ঝিঁঝিট ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত– সচেতন ভাবে ভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্যও গানের ভিতর রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আসামের স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়ে যখন মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছিল। তখন একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে নিঃপ্রদীপ শিক্ষাহীনতা। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে ছাত্র-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিদেশী মার্চের সুরে রচনা করেন–

'উদয় পথের যাত্রী
ওরে ও ছাত্রছাত্রী,
মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো, মশাল জ্বালো।
প্রেতপুরীর এই অন্ধকারায় আনো আলো॥'

এই গানটির সঞ্চারী–

'শিক্ষাবিহীন গৃহহারা যারা কাঁদিছে আঁধারে
হে প্রগতির সৈনিক তোরা ভুলিবি কি তাদেরে।'

এখানে তিনি ভারতীয় রাগের আবহ ব্যবহার করেন। যেখানে কাফি ও ইমনের মিশ্রণে এক অসাধারণ ভাব ফুটে ওঠে *[সুরচিত্র-৪]*
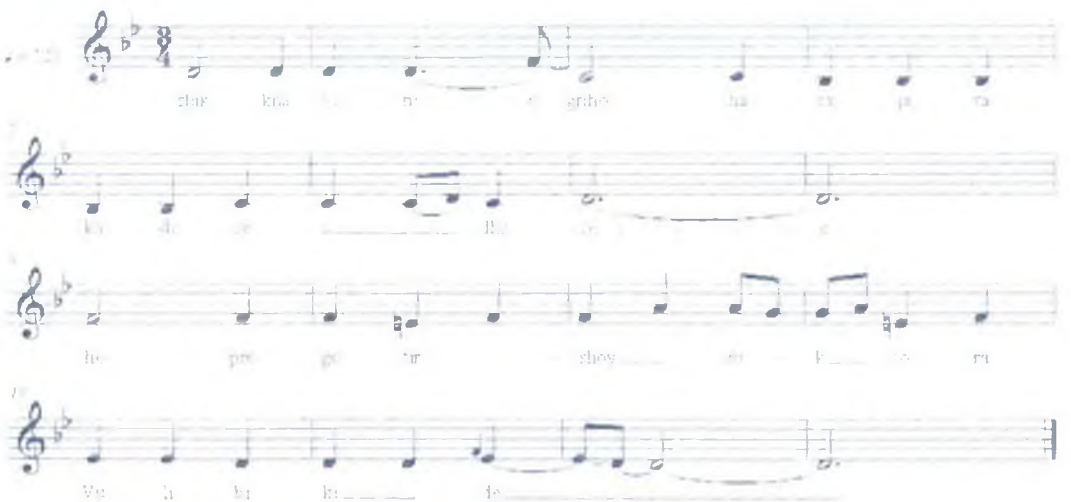
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'উদয় পথের যাত্রী' গানে রাগ ভিত্তিক সুর ব্যবহারের নমুনা। সুরচিত্র-৪

Dhaka University Institutional Repository

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আরেকটি গানের কথা বলা যায় যে গান ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও যে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি, এ সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য– "৪৬ ধর্মতলায় থাকাকালীন আগন্তুক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি গান রচনার জন্য সুভাষ মুখার্জী ও চিন্মোহন সেহানবীশ আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তখনই আমি লিখলাম 'দুঃখের রাতের ঘোর তমসাভেদী স্বাধীনতা দিবস এলো যে ফিরে–শহীদের মৃতপ্রাণ শোন করে আহবান করাঘাত হানে তব দ্বারে'। তখনে মন্বন্তরের কালোছায়া সরে যায় নি। ইমন রাগকে ভেঙে নির্মলের (নির্মলেন্দু চৌধুরী) সঙ্গে মধ্যরাতে সুর দিলাম।"[৩২]

তৃতীয়ত– রাগপ্রধান বাংলা গানের ন্যায় চলনে গণসংগীতের সুরারোপ। বিশিষ্ট গণশিল্পী দিলীপ বাগচী, সুরেশ বিশ্বাস, সাধন সরকার, আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ এধরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু জনপ্রিয়তার বিবেচনা খুব একটা সফল হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক সুর

আধুনিক গান আর গণসংগীত কখনোই এক নয়, যেমন লোকসংগীত। তবে সৃষ্টির অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যে আধুনিক শিল্পকলার ন্যায় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও, গণসংগীতে আধুনিক সুরের প্রভাব প্রকট। আধুনিক গানের সাথে মিল ও অমিল প্রথমেই চিহ্নিত করা যাক। তারপর বিশ্লেষণ করা যাবে প্রভাব সম্পর্কে। এই দুইটি ধারার মধ্যে সাদৃশ্য বলতে গেলে উভয়ের ক্ষেত্রেই গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক এই তিন স্বতন্ত্র সত্তার মিলন রয়েছে। সুর প্রয়োগের বেলায় নির্বাচনের ভিন্নতা থাকলেও নির্বাচনের স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান। ভক্তিমূলক, ধর্মীয় কিংবা লোকসুর বা শাস্ত্রীয় সংগীতের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে এক প্রকার লঘু সংগীতের সৃষ্টি যা সমাজ জীবনের অধিকার সচেতনতা, দেশপ্রেমের স্পর্শ নিয়ে রচিত। কিছুটা ফরমায়েসিও বলা যায়। ভাষার চলন, চলিত রীতি, সুরের সারল্য, যন্ত্র ব্যবহারে দেশ- বিদেশী সুরের উদার সংযোজন। এরপরও বৈসাদৃশ্য রয়েছে ঢের। প্রথমত আধুনিক গান একটি ফর্ম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৭ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচারের মধ্যদিয়ে আর গণসংগীত ১৯৪০ সালের দিকে অঙ্কুরোদগম। আধুনিক গানের সুরের গঠন রোমান্টিক গণসংগীতের সুর বিপ্লবী। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে আধুনিক গান ব্যক্তিজীবনের প্রেম-বিরহ, বিনোদন, সুখ-দুঃখ সাধারণ সাহিত্য প্রবণতার দিকে উপস্থাপিত, অপরপক্ষে গণসংগীত সংগ্রাম-প্রতিবাদ, শোষণ-রাজনৈতিক অধিকার ও চেতনার কথা বলে। সম্প্রচারের দিক থেকে আধুনিক গান রেডিও, চলচ্চিত্র কিংবা গ্রামোফোনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থলোভী ধনপতিদের দ্বারা পরিচালিত। গণসংগীত নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল অথবা বিশেষভাবে আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠীর মতপ্রকাশের বা দাবী আদায়ের ভাষা।

এতদা সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থাকার পরও গবেষণায় দেখা যায় বিংশ শতকের আগেই যে বাংলা গানে নতুন ধারার সূচনা ঘটে, তারই উত্তরাধিকার বলতে স্বদেশী গান থেকে উভয় ধারা বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে। স্বদেশী গানের লেখকেরাই যেহেতু আধুনিক গানের প্রবক্তা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই গণসংগীতের ধারনা পান নি। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। ১৯৪০ সালে গণসংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে তার শিকড় হাজার বছরের সাংগীতিক ধারাবাহিকতা। কিন্তু আধুনিক গান কোনো আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেনি ফলে ঐতিহাসিক যোগসূত্র এর সাথে নেই বললেই চলে। গণসংগীতের আগেই আধুনিক গান তার সুরের কাঠামো চরিত্র আঙ্গিক উপযোগিতা ও বিন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে গণসংগীতে পুরোটা প্রভাবই কাজ করেছে, অনুসরণের প্রধান কারণ কিছু সংগীতবোদ্ধা ও রক্ত-মাংশে সংগীতবেত্তা ছাড়া বেশিরভাগ রচয়িতা গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে সংগীত শিক্ষার্থী নয় এদের প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও বিপ্লবী আদর্শে উজ্জীবিত মানসিকতায় উদ্দীপ্ত। ফলে গান রচনা কৌশলের সামনে রসদ বা প্রভাব হিসেবে বেছে নিয়েছে আধুনিক গানের ধারা। এবং বেশকিছু আধুনিক গানের শিল্পীরাও গণসংগীত রচনায় এগিয়ে আসেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সলিল চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদ, পরেশ ধর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সাধন দাশগুপ্ত, আবদুল লতিফ, সাধন সরকার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, আবদুল জব্বার, আজম খান প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক গানের সুরের স্বাধীনতায় প্রথমেই দেখা যায় প্রচলিত টানা টানা দীর্ঘপদী প্রচলিত সুর থেকে বেরিয়ে এসে কাটা কাটা হ্রস্বপদী নতুন সুররীতি, যা সবধরণের মানুষের গাইবার মতো সহজবোধ্যতা তৈরী করে। সামন্ততান্ত্রিক সুরের জটিলতা ও অলংকার প্রধান গান সারাজীবনই একক ঐশ্বর্য নিয়ে উচ্চবিত্তের শোকেসে সাজিয়ে রাখার মতো দৈন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক গান গণতান্ত্রিক পথে পা বাড়ায়। আধুনিক গানের এই বিপ্লব গণসংগীতকে তাই প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। অর্থাৎ সুরের অন্তর্মুখী প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বহির্মুখী প্রকাশই উভয় ধারা সাদৃশ্য ও প্রভাবের মূল কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী সুর

মানুষের বিনোদনের ভাষা এবং চেতনার ভাষার মধ্যে অভিব্যক্তির যে ভিন্নতা থাকে, সুরেও তার প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য। যে কোনো সংগীতেই দেখা যায় শাস্ত্রীয় সুর অপেক্ষা লোকসুর অনেকটা উচ্ছ্বাসময় এবং তীব্র। বাংলা আধুনিক গান এবং গণসংগীতকে পাশাপাশি বিচার করলেও এমন ভিন্নতা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সাধারণ বাংলা গানে ভিনদেশী সুর এলেও তা রোমান্টিক এবং মনে রঙ লাগাবার বাসনা থেকে ব্যবহৃত হয়। গণসংগীতে রঙ লাগাবার সেই বাসনাটুকুও অধিকার আদায়ের চেতনা দ্বারা প্রবাহিত, নিরত রক্তক্ষরণের ভাষা ও সুরে আশ্রিত। তখন দেশী-বিদেশী ভেদাভেদ ভুলে বেশ কিছু সুর অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেখা যায় বিদ্রোহ বিপ্লব অধিকার আদায়ের ভাষা প্রকাশের জন্য ওয়ালুজ, মার্চ কিংবা ম্যাস-এর মতো বিপ্লবী সুর বা বিদেশী লোকসুরের অনুকরণ করা হয়। সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা প্রযোজ্য মনে হয় তাই আসে সাবলিল প্রবাহে, অবশ্য কথা ও শব্দের অর্থবোধকতা গণসংগীতের স্বতন্ত্রসত্তা। ফলে সুর ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন কেন্দ্রাতিগ। গণসংগীতের ভাব যেহেতু উদ্দীপনা, আন্দোলন, আদেশ, মিছিল, শ্লোগান, বিদ্রোহ, জাগরণ ও সমালোচনামূলক–তাই বিদেশী সুরের যেখানটা উপাদেয় মনে হয়, তা ব্যবহৃত হয় উপযোগিতা বিচার করে।

গণসংগীতে বিদেশী সুর অনুপ্রবেশের বেশকিছু তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। যা এই অধ্যায়ের প্রথমেই কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। সেখানে যে ৮টি কারণ দেখানো হয়েছে–যার মূল বক্তব্য হলো– গণসংগীতের ধারা ও ধারনা বহির্বিশ্ব থেকে এসেছে। আঞ্চলিক বা শাস্ত্রীয় কোনো অঙ্গেই একে বাঁধা যায় না। সাধারণ সর্বহারাশ্রেণীর মানুষ যারা একসাথে গেয়ে থাকে এছাড়া আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রাজনৈতিক চেতনা। স্বাদেশিকতার ধারা আন্তর্জাতিক শ্রোতে মিশে যাবার কালে দেশী সুরও বিদেশীসুরের মাধুর্য কিংবা সাহসে মিলিয়ে গিয়েছে। দুইশ' বছরের ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের কালে সংগীতের যে ধারা সামনে আদর্শ হিসেবে প্রবাহিত ছিল, তা স্বদেশী গান। ১৮৬৭ সাল থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত বাংলায় যত স্বদেশী গান লেখা হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গান ইউরোপীয় সুরে ও যন্ত্রীয় ভাবধারায় রচিত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম দিলীপকুমার রায়ের অনন্যসাধারণ গানগুলোই গণসংগীতের সুরের ঔদার্য রক্ষায় বিদেশী সুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহজ হয়ে পড়ে। অন্যটি হলো চলচ্চিত্রের গান । গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ লোকসংগীতের সুরের মধ্যেই বসবাস করে। কিন্তু অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্রের রেশ ধরে আসা বাংলা চলচ্চিত্রের গানেও Orchestra এবং বিদেশী যন্ত্রানুসঙ্গের ব্যবহার গ্রহণীয় হয়েছে সাবলিল ভাবেই। গণসংগীত চেতনার গান হলেও তা সাধারণ মানুষের মনোগ্রাহী তো হতেই হবে। তার জন্য কথার পরীক্ষা-নীরিক্ষার সাথে সুরের প্রভাব এসেছে অনেকটা চলচ্চিত্র থেকে। চলচ্চিত্রের অনেক জনপ্রিয় গানের সুর নকল করেও বেশকিছু গান রচিত হয়েছে। তবে চলচ্চিত্র বৈশিষ্ট্যগত ও বাণিজ্যিক সাফল্যের দিক লক্ষ্য রেখে রচিত বলে যার স্থূল কথা ও পচনশীল মানসিকতা, বিশেষ করে বিদেশী সুরের আঁচড় বুলিয়ে দেয়ার গান মানুষের মনকে কেড়ে নেয়। ফলে গণসংগীতের উপর ঐসব সুরও প্রয়োগ করা হয়েছে। সময়ের দাবী অনুযায়ী গণসংগীতে বিদেশী সুর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার প্রাবল্যে সলিল চৌধুরীর প্রচেষ্টা ছিল অন্যদের থেকে বেশি। বিদেশী সুর ব্যবহারের জন্য তিনি যে মত পোষণ করতেন সে সম্পর্কে বলেছেন–"শুধু শ্লোগান দিয়ে মানুষের মন জয় করা যাবে না। আপনাদের আজকের দিনের গীতিকার ও সুরকার তাদের শিখতে হবে আজকের বুর্জোয়ারা যে গান তৈরী করছে TV-তে বলুন, Record-এ বলুন, Cassatte-

Dhaka University Institutional Repository

এ বলুন, যে সব অসাধারণ Orchestration অসাধারণ Recording অসাধারণ Reflection যে সব পচা জিনিস ওরা প্রচার করছে তার জৌলুসে, তার আঙ্গিকের চমৎকারিত্বে তা যুব মানসকে আপ্লুত করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে গেলে শুধু একটা একতারা নিয়ে বা একটা হারমোনিয়াম নিয়ে চলবে না। নিশ্চয়ই সেটা আমরা গাই, মাঠে ময়দানে সে রকম দরকার হলে কিন্তু আমাদের ওই Technique আয়ত্ব করতে হবে, তা না হলে আমরা পারব না।"[৩৩]

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য অন্তর্মুখী। সুরের জাল বিস্তার করে কিংবা কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখা দাঁড় করানো অথবা নিবেদনের রূপক ভাষায় বাংলা গান বিকশিত। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের চারপাশে বস্তুজগতের নানাবিধ কাজ শ্রম ও শ্রমিকের কাজের মধ্যকার ধ্বনি। হাতুড়ি-কাস্তে, ঘাম-চিৎকারের ধ্বনির সাথে যার মিল পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু গণমানুষের গান ও ভাষা এই প্রাকৃতিক ধ্বনি প্রবাহই গণমুখী মানুষকে কাছে টেনে এনেছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'জনসংগীত' নামে যে গান রচনা করেন তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে বলেন। "আমাদের রাগ-রাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। ... সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উদ্ভাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। ...ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে। আমাদের রাগিনীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা হয়।"[৩৪] উল্লেখ্য গণসংগীতের যেহেতু প্রতিবাদ দেশপ্রেম, শ্লোগান, চেতনা ও তীব্র প্রতিরোধের ভাষা দরকার। সুরের মধ্যেও সেই ঢঙ পশ্চিমা সংগীতের প্রভাব বলা যায়।

গণসংগীত যেহেতু আঙ্গিক সচেতনতার উপর ভিত্তি করে সুর প্রয়োগ করা হয় নি। ফলে যার কাছে যা বৈচিত্র্যময় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যে দক্ষতা তার প্রয়োগ করেছেন নিষ্কণ্টক ভাবে। গণসংগীতের পরিমাণ সঠিকভাবে বের করা সম্ভব নয়, একইভাবে বিদেশী সুর কিংবা সুরের প্রভাব কোথায় এবং কতগুলো গানে আছে তাও বের করা অসম্ভব। তন্মধ্যে যে গানগুলো পাশ্চাত্য ও ভিন্ন দেশের সুর-প্রবাহে অতি জনপ্রিয় হয়েছে তেমন গান বেশি নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই গানসমূহের মধ্যে দেশী সুরের ছায়া থাকলেও তাল প্রয়োগে পাশ্চাত্যের নিদর্শন। অথবা মিউজিকের মধ্যে সুরের মিশ্রণ। বরাবরই বাংলাগান অনেকটা একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে চলছিল। তা দুরিভূত করেছে পাশ্চাত্য প্রভাব। বহুমাত্রার স্বরের ব্যবহার, স্বরের ওজন পরিবর্তন, এ্যাকসেন্ট-এর বিশেষত্ব, যা ইংরেজি ভাষার শব্দের ছন্দ গাণিতিক ভাবে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করে। হারমোনি-কয়্যারের সমবেত পরিবেশন জনমানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগায়। তাই দেখা যায় Rythm এবং গতি পাশ্চাত্য ঢংকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছে।

সিকান্দার আবু জাফরের লেখা একটি গান যেমন–

'জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই।'

মোহিনী চৌধুরীর–

'মুক্তির মন্দির সোপন তলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।'

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিদেশী সুর মূলত প্রভাব হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ লোক আঙ্গিকের গণসংগীতকে যেমন লোকসংগীত বলা হয় না। তেমনি বিদেশী গানকেও বিদেশী গান বলা হয় না। বিদেশী সুর গ্রহণ করা হয়েছে সহজ বোধ্যতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার দিকে ঝোঁক যাবার কারণে। প্রথমে যেমন কর্ড (Chord)-এর ব্যবহার দেখা যায় না। কয়্যার কিংবা কাউন্টার হারমোনি দিয়ে গান গাওয়ার নজির মেলে না। গণসংগীতে তা আসে জ্ঞান মনস্কতার প্রতিফলন হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সলিল চৌধুরীর রানার গানটি সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে সুরারোপ কালে ছয়টি ষড়জ-এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন শিল্পী। রানার যেহেতু একটি যাত্রা– ফলে সুরের ক্ষেত্রেও যাত্রাটাকে বজায় রাখার দরকার। অথচ ঢেউ উঠছে কারা টুটছে, আলো ফুটছে প্রাণ জাগছে গানটিতে Hermony ও Chording-এর অপূর্ব সমন্বয়। গানটির মধ্যে 'লাখে লাখে করতাল হরতাল হেঁকেছে' এখানে বৃন্দগীতের স্বর-সঙ্গতি অপূর্ব সুর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখে।

গণসংগীতের পাশ্চাত্য সুর আসার আরেকটি কারণ বিভিন্ন দেশের গণমুখী গান বঙ্গানুবাদ করা। ফলে স্বকীয়তা রাখতে হুবহু সুর অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে পল রোবসন, পিট সিগার, হ্যারি বেলাফন্টে, ইউজিন পোতিয়েসহ রাশিয়ান, ভিয়েতনাম, স্কটিশ, কিউবান, চীনাসহ বিভিন্ন দেশের জাগরণমূলক গানকে গণসংগীতের অন্যতম শ্রদ্ধার আসন নিয়ে আছে। এমন কয়েকটি গানের উদাহরণ দেয়া যায় ১৮৭৯ সালে ফ্রান্সে সৃষ্ট বিশ্বের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের রক্তাক্ত প্যারী কমিউনের গর্ভজাত গান। ইউজিন্ পোতিয়ের লেখা এবং পিয়ের্ দেগতার্-এর সুরে মোহিত বন্দোপাধ্যায়ের অনুবাদ–

'জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস!'

অক্টোবর বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে রচিত কর্নেল আলেকজান্দ্রভের গান- 'Trough the winters cold and famine. from the fields and from the town'-এর অনুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। রাশিয়ান প্রচলিত সুরে ১৯৪৯ সালে অনুবাদিত গানটি রেড গার্ড বাহিনীর গান হিসেবে পরিচিত–

'ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল
কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তি সেনাদল।'

মার্কিন লোকসংগীত শিল্পী পিট সীগারের মতে মহত্তম গীতিকা (Noble Ballad) গত শতাব্দীর সত্তর দশকের একটি সত্য ঘটনা। জন হেনরী যিনি শাবলের আঘাত দিয়ে পাহাড় কাটতেন। একসময় যখন উচ্চমানের পাহাড় কাটার মেশিন আবিষ্কৃত হলে শ্রমিক ছাটাই হতে থাকে। জন হেনরি তখন বেকারত্ব থেকে মুক্তির জন্য মেশিনের বিপরীতে শাবল দিয়েই সমান তালে পাহাড় কাটার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। অবশেষে নিজের হাতুড়ির আঘাতেই হেনরি নিহত হন। এই ঘটনা নিয়ে অসাধারণ কাব্যগীতি অনুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। গানটি হলো–

Dhaka University Institutional Repository

'নাম তাঁর ছিল জন হেনরী
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস্ দিয়ে
খুশি মনে কাজ করে রাতদিন ।'

পোল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণী জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল রুশ ভাষায় 'ভার্সাভিয়াঙ্কা' নামক গানটি অজ্ঞাত লেখক ও সুরকারের । হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই গানের অনুবাদ করেন ।

'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু চারিদিকে
অন্ধকারের চক্রান্ত কঠিন
তবু সংগ্রামে চলো উদ্দাম নির্ভিক
রক্ত পতাকা হাতে উড্ডীন ।'

পিট সিগারের আরেকটি গান অনুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস । ভিয়েতনাম যুদ্ধের সৈনিকদের নিয়ে রচিত আমেরিকান লোক সুরে–

'ফুলগুলি কোথায় গেল কতদিন কেটে গেল
ফুলগুলি কোথায় গেল কতদিন হলো
ফুলগুলি কোথায় গেল ফুলকুমারী ছিঁড়ে নিল
আর কবে বুঝিবে বলো তারা বুঝিবে বলো॥'

এছাড়া বের্টল্ড ব্রেখ্‌ট, চেরাবাণ্ডারাজু, বেঞ্জামিন মলয়েস, অতো রেনে কাস্তিইয়ো, মাওসেতুঙ, আলফ্রেইড হেইস, হ্যান্স আইসলার, এথেল রোজেনবার্গ, জিম বিভস, ল্যাংস্টন হিউজেস, জর্জ রেবেলো, নাজিম হিকমত, সলেউ আনসহ বিভিন্ন রচয়িতা ও সুরকারের গান অনুবাদ করেছেন এবং গেয়ে বেড়িয়েছেন এদেশের শিল্পী সমাজ । তন্মধ্যে অন্যতম কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, জ্যোতির্ময় নন্দী, দিলীপ সেনগুপ্ত, আলতাফ মাহমুদ, জলি বাগচী, কঙ্কন ভট্টাচার্য, বিপুল চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । নিম্নরূপ নির্বাচিত কয়েকটি বিদেশী সুরাশ্রিত গানের তালিকা প্রদান করা হলো–

ক্রম	গানের কলি	গীতিকার/ অনুবাদক	সুরকার
১	তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ওই নতুনের কেতন ওড়ে	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
২	কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
৩	এসো মুক্ত করো অন্ধকারের এই দ্বার	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
৪	সুদুর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস
৫	মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগল	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	হেমাঙ্গ বিশ্বাস
৬	বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	হেমেন
৭	ঢেউ উঠছে কারা টুটছে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
৮	ও আলোর পথের যাত্রী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
৯	গৌরী শৃঙ্গ তুলেছে শির	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
১০	আমার প্রতিবাদের ভাষা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

১১	রানার ছুটেছে তাই ঝুম ঝুম ঘন্টা বাজছে	সুকান্ত ভট্টাচার্য	সলিল চৌধুরী
১২	ঐ উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত
১৩	জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকানদার আবু জাফর	শেখ লুতফর রহমান
১৪	আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	আলতাফ মাহমুদ
১৫	এইা ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো	আলতাফ মাহমুদ	আলতাফ মাহমুদ
১৬	বাজে তূর্য তৈরি হও সেনাগণ	সত্যেন সেন	সত্যেন সেন
১৭	আমরা পূবে পশ্চিমে	আলতাফ মাহমুদ	আলতাফ মাহমুদ
১৮	আজ দিকে দিকে ফিস্ ফাস	অলোক দাশগুপ্ত	অলোক দাশগুপ্ত
১৯	বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের	ভূপেন হাজারিকা	ভূপেন হাজারিকা
২০	পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
২১	আমাদের যেতে হবে	প্রতুল মুখোপাধ্যায়	প্রতুল মুখোপাধ্যায়
২২	বিপ্লবেরই রক্ত রাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে	আবুবকর সিদ্দিক	শেখ লুতফর রহমান
২৩	রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা	আবদুল গাফফার চৌধুরী	শেখ লুতফর রহমান
২৫	পায়রার পাখনা, বারুদের অগ্নিতে	আবুবকর সিদ্দিক	শেখ লুতফর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্র

গণসংগীতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের নির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে গানে যে ধরণের যন্ত্র মানায় তা-ই যথেষ্ট। যে আঙ্গিকের গান বাদ্যযন্ত্রও বাজে সেই চরিত্রের। শাস্ত্রীয় চলনে বাদ্যযন্ত্র যতটা খুঁটিনাটি বিচার করে সংগীতের পারম্পর্য অনুযায়ী মেজাজ বুঝে নির্বাচন ও সঙ্গত করা হয়, গণসংগীতে এধরণের সুক্ষ্ম প্রয়োগ বা মনোযোগ সেভাবে লক্ষ করা যায় নি। কারণ গণসংগীত পরিবেশনের স্থান ও পরিস্থিতি কখনোই পরিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যদিয়ে হয় না। সভা-মঞ্চ কিংবা মিছিলের মধ্যে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাৎক্ষণিক আয়োজন। ফলে লোকজ যন্ত্র এবং সহজলভ্য যন্ত্রের ব্যবহার অধিকতর লক্ষ্যনীয়। শাস্ত্রীয় ধারার অনেকযন্ত্র এতে কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নি, যেমন সেতার, সরোদ কিংবা বীণা। পরিবেশনের জন্য প্রধানত ব্যবহার করা হয় বাঁশি, ঢোল, হারমোনিয়াম, তবলা, দোতরা, একতারা প্রভৃতি আর লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত লোকবাদ্য অঞ্চলবিশেষে কচিৎ ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। আধুনিক ধাচের বা বিদেশী সুরের গানে কঙ্গো, গীটার, কীবোর্ড, বেহালা, ড্রামসহ নানা ছোটখাটো তালযন্ত্র (Percussion) ব্যবহৃত হয়। তবে কিছু দৃষ্টান্তমূলক ঘটনার দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যেমন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য গণ-কবিয়াল রমেশশীল মঞ্চে উঠতেন ঢোল বাজাতে বাজাতে। নিবারণ পণ্ডিতের গান জারির আদলে গীত হতো বলে ঢোল এবং দোতরার ব্যবহার ছিল, তিনি খুব ভালো দোতরাবাদক ছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মঘাই ওঝার ঢোলের অসাধারণ বাদনের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। নির্মলেন্দু চৌধুরী, আবদুল লতিফ, শেখ লুতফর রহমান প্রমুখ ভালো হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতেন।

Dhaka University Institutional Repository

গায়কী বিধান

গণসংগীতকে বুঝতে হলে সরাসরি পরিবেশনার মেজাজ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। লোকসংগীতে সারি, জারি, ঝুমুর, কারামসহ বিভিন্ন ধারায় সমষ্টির গীত আছে। প্রতিটি ধারারই নিজস্ব স্টাইল আছে। গণসংগীতেরও তেমনই আছে গায়কীর এক নিজস্ব স্টাইল। শব্দের প্রক্ষেপণ, প্রজেকশন, কণ্ঠের দৃঢ়তার ভিন্নতা। এই দৃঢ়তা নিয়ে শাস্ত্রীয় ধারার পরিমণ্ডলে অনেক কথা প্রচলিত আছে যে, জোরে গলা ফাটিয়ে গান করা মানে গলা নষ্ট হয়ে যাওয়া। কিন্তু লোকসংগীতের প্রাচীন কালের ঐতিহ্য একথাকে ভুল প্রমাণ করে। বলা যায় বিশ্বের সবশ্রেণীর জনঘনিষ্ঠ শিল্পধারার মধ্যে থাকে উচ্চস্বরের প্রক্ষেপণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জাপানিজ বুনরাকু (এক ধরণের কাবুকি পাপেট থিয়েটার) মিউজিকে অতি তীক্ষ্ণ ও তীব্র আওয়াজের ব্যবহার। গায়ক এমন উচ্চতায় শব্দ করেন যে কোনো শব্দযন্ত্রও হার মানায়। বিশাল হল ভর্তি মানুষের মধ্যেও একেবারে উদারার স্বর পর্যন্ত সমান ভাবে প্রবেশ করছে। পাশ্চাত্য সংগীতে সোপ্রানোতে যিনি কণ্ঠ তোলেন তা আমাদের সংগীতে বিরল। গণসংগীতে উচ্চস্বর ও দৃঢ়স্বরের প্রয়োগ অনেকটা মুক্তির পথ দেখিয়েছে। এছাড়া গণসংগীতের উদ্দেশ্য শিল্পের জন্য শিল্প নয়। এমনকি জীবনের জন্য শিল্প এমন অভিধাকে অতিক্রম করে বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের প্রহসন-প্রতারণা-জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রগাঢ় জনসচেতনতার জন্য শিল্প। যা উঠে এসেছে লক্ষ মানুষের শ্লোগানের ভাষা থেকে। তাই এই গান গীত হয় শ্লোগানের মতোই উচ্চকিত হয়ে। গণসংগীতের রোমান্টিকতায়ও যেন এক রকম তেজস্বিয়তা থাকবে, দুঃখ-ক্লান্তিতেও থাকবে উজ্জীবন–হার না মানার গর্জন। সাধারণ সংগীতে যা অনুপস্থিত। সেকারণে গণসুরের ভাষা মার্চ ওয়ালজ মিউজিকের বিউগলের মতো ভরাট, আর প্রয়োগ হলো ছাদপেটানো পাইলিং কিংবা সারিগানের ন্যায় শ্রমসংগীতের গতিশীলতা। যে ভঙ্গি মানুষকে একত্রিত হ'তে সহয়তা করে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের মধ্যে সারাবাংলার সাংস্কৃতিক আবহ উঠে এসেছে সুরের ঐতিহ্য-ইতিহাস, আঙ্গিক-চরিত্র এবং আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে। গণসংগীত যে নিজের আদর্শ প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষের সরল জীবনের থেকে উঠে আসা নানারূপ মাধুর্যের সুরের আশ্রয়ে বাংলা গানের আদর্শকেই ধারণ করে বসে আছে। এর ফলে গণসংগীতের শারিরীক কাঠামোর মতো অনেক গান আছে যাকে এই বিশেষণে অভিহিত করা যাবে না। কিন্তু মননের চর্চায় গণসংগীত গ্রামবাংলার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছে কখনো কখনো লোকসংগীত পরিচিতি নিয়ে। এমনকি অনেক লোকসংগীতে গণসংগীতের আদর্শগত উপাদান প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে, গম্ভীরা গানই যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে বাংলাগান মুক্তির দুয়ারে এসেছে। যথার্থ বিচারে গণসংগীতের শিল্পশৈলীর হাত ধরেই এগিয়ে গেছে পরবর্তী কালের বাংলা গান। যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় প্রধান দু'টি ধারা– রাগসংগীত ও লোকসংগীত'। লোকসংগীত গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল আর্তি, বিনোদন ও প্রতিবাদ প্রকাশ পায়, যাকে দেশীগান বলা হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে আমাদের মৌল রাগ-রাগিণীর গঠনে লোকসংগীতের উপাদানই মুখ্য। কেউ কেউ বলেন–লোকসংগীত থেকেই রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি। বিষয়টি বিশ্বসংগীতের দৃষ্টিতে দেখলে পৃথিবীর সব লোকসংগীতেরই এক ধরণের মিল রয়েছে। তার মানে এই নয় যে, একে অপরের অনুসরণ করেই সৃষ্টি হয়েছে। স্বরের মিল দেখে এমন অনুমান করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। লোকসংগীত শিল্পীদের জীবনপ্রণালী আর উচ্চবিত্ত সংগীতানুরাগীর বাস্তবতা কখনোই এক ছিল না। তাছাড়া শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী একটি শৃঙ্খলিত গুরুমুখী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিক্ষাপদ্ধতি। লোকসংগীত সর্বদাই তার উল্টো। অতএব বৈষয়িক মিল দেখে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে লঘু করা অবমূল্যায়নের সামিল।

২ সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের চার দিগন্ত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ৭৬

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৪ 'পাশ্চাত্য রীতিতে 'পলিফনি' (বা একই গানের সমান্তরাল দ্বৈতস্বরের সাজানো সুর) এবং 'হারমোনি' (বা বহুস্বরের সমন্বয়ে সাজানো সুর) প্রয়োগ ভারতীয় সংগীতে অজ্ঞাত। কাজেই ভারতীয় সংগীতে একক সুরের বিকাশ, পরিবর্তন-বিবর্তনের উপর নির্ভর করে।'
সুকুমার রায়, *ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২

৫ এ বিষয়ে বিজন ভট্টাচার্যের বক্তব্য–'বেসুরো গলায় তাঁর (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) সেই আন্তরিক অনধিকার চর্চা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বদাই রসদ যুগিয়েছে।' (অবশ্য পরবর্তীতে এই গানটির ভিন্ন সুর করেন বিশিষ্ট লোকসংগীত গবেষক বুদ্ধদেব রায়। সেই সুরও কোনো কোনো মহলে সুবিদিত।)
অনুরাধা রায়, *চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন*, প্যাপিরাস, কলিকাতা ১৯৯২, পৃ. ১০

৬ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, মৈনাক বিশ্বাস সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯০, পৃ. ১০৪

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৮ ১৯৫১ সালের ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ মার্চ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে 'প্রান্তিক নবনাট্য সংঘ' এবং 'সাংস্কৃতিক বৈঠকের' আয়োজনে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়। এতে সলিল চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রধান দল অংশগ্রহণ করে। কবিয়াল রমেশ শীল ও ফণী বড়ুয়া উক্ত অনুষ্ঠানে কবির লড়াই করে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন।
মাহবুব হাসান সম্পাদিত, *চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, স্মরণিক, চট্টগ্রাম ১৯৯১, পৃ. ৮

৯ দীনু বিল্লাহ, প্রবন্ধ *'মিলিত প্রাণের কলরবে*, বাংলা জার্নাল, লন্ডন, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ৬১-৬২

১০ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস লিখেছেন– 'আবদুল লতিফের সুরটি মন্দ ছিলো না কিন্তু কিসের যেন অভাব ছিল তাতে। আলতাফ মাহমুদের নতুন সুরে জনতার কর্ণে যেন মধু ঢেলেছিলো। কী ভীষণ মাদকতা, কী ভয়ঙ্কর আকর্ষণ, সে গানে। গানের এক একটি কলি কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হলেই মন নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে না। সাপ্তাহিক চিত্রালী, ১৬ মার্চ ১৯৭৪ সংখ্যার উৎস অবলম্বনে।
দিনু বিল্লাহ, *মিলিত প্রাণের কলরবে*, বাংলা জার্নাল, লন্ডন, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ৬৪

১১ 'পূর্ববঙ্গে সর্বোপরি আমরা পেয়েছি কবিগানের সুরের সমৃদ্ধি যা পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতকে ঐশ্বর্যশালী করেছে। ... চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। এই কবিয়ালরা স্বাদেশিকতার সঙ্গে এনে মেলালেন শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা।
হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *গানের বাহিরানা*, সম্পাদনা : মৈনাক বিশ্বাস, প্যাপিরাস কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৪২

১২ A work song is typically a rhythmic a cappella song sung by people working on a physical and often repetitive task. The work song is probably intended to reduce

Dhaka University Institutional Repository

feelings of boredom. Rhythms of work songs also serve to synchronize physical movement in a gang. Frequently, the verses of work songs are improvised and sung differently each time. The improvisation provided the singers with a sometimes subversive form of expression: improvised verses sung by slaves had verses about escaping; improvised verses sung by sailors had verses complaining about the captain and the work conditions. Work songs also help to create a feeling of familiarity and connection between the workers.
Wikipedia, *work song pages*, the Free Encyclopedia.

১৩ 'বাংলার কোন কোন লোকসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঝিঁঝিট, দেশ, ভৈরবী, ভীমপলাশ্রী, ভূপালী, বিভাস প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাংলার লোকসঙ্গীতকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে।'
গুরুসদয় দত্তের তথ্যানুযায়ী ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *লোকসংগীত*, প্যাপিরাস, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ২৩

১৪ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯০, পৃ. ৮৫

১৫ গানটির লেখকের নাম অজ্ঞাত হিসেবে প্রচারিত হলেও সম্প্রতি '*রূপান্তরের গান*' নামের এ্যালবামে শহীদ সাবেরের গান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্পী শাহীন সামাদ, লেজার ভিশন, ঢাকা ২০০৭, গান নং. ৮

১৬ ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ২২

১৭ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ২৮

১৮ খালেদ চৌধুরী, *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ২০০৪, পৃ. ৯০

১৯ গানটি অবশ্য ১৯৭৬ সালে রচিত, যখন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান আকাশবাণী থেকে পরিবেশন নিষিদ্ধ করেছিল। তার প্রতিবাদে গানটি রচিত। চটকা সুরের মধ্যেই গানটির সুরের চরিত্র পাওয়া যায়।
নিবারণ পণ্ডিত, *জনযুদ্ধের গান*, গণনাট্য প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৮৭

২০ তাসাদ্দক আহমদ, *গম্ভীরা গান : বিষয়গত বিভাজন*, বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন-৬৭, ঢাকা পৃ. ১৯

২১ প্রদ্যোৎ ঘোষের তথ্যানুযায়ী তাসাদ্দক আহমদ, *গম্ভীরা গান : বিষয়গত বিভাজন*, পৃ. ৩৮- ৩৭

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২৩ প্রশাসনের কুনজরে পড়ে গম্ভীরা শিল্পীদের যে জেল-জুলুম হুলিয়ার শীকার হ'তে হয়েছে সে সম্পর্কে দেখা যায় 'আধুনিক গম্ভীরা গানের জনক সুফি মাস্টারের যুগোপযোগী গানের তীব্রতা জনমানসকে এত বিক্ষিপ্ত করে তোলে যে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে ১৯০৫ সালে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখেন। পাকিস্তান আমলেও তিনি সরকারী রোষানলে পড়েন। ১৯৪৪-৪৫ সালে মালদহের তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এ. বর্ণওয়েল কবি গোবিন্দলাল শেঠের সম্প্রদায়ের গান বাজেয়াপ্ত করেন এবং গোবিন্দলাল শেঠ, গোপীনাথ শেঠ ও মঠর বাবুকে গ্রেফতারও করেন।'
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৪ কামাল লোহানী, *প্রবন্ধ–জনগণের সংগ্রামই আমাদের সংস্কৃতি*, সংস্কৃতি সংগ্রাম পত্রিকা, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৩৮

২৫ হরিশচন্দ্র পাল তাঁর উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত গ্রন্থে ভাওয়াইয়াকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন, ভাব এবং সুরগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার নাম– ১. চিতান ভাওয়াইয়া ২. ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া ৩. দরিয়া ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া ৪. গড়ান ভাওয়াইয়া এবং ৫. মইষালী ভাওয়াইয়া। ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া শ্রেণীর গানে দোতরা বাজানোর একটি বিশেষ ধরণ আছে, এই ধরণকে ক্ষীরোল ডাং (Stroke) বলে। বিরহের প্রতীক এই গান সাধারণত কিছুটা নিম্নগ্রামে আরম্ভ হয়ে পরে উচ্চগ্রামে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা অবলম্বনে– ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত ভাওয়াইয়া*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃ. ২৮

২৬ সামীয়ুল ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী ড. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া*, পৃ. ২৯

২৭ দিনেন্দ্র চৌধুরী, *গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৩১৭

২৮ খগেশ কিরণ তালুকদার, *নিবারণ পণ্ডিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৪৯

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

৩০ দিলীপ বাগচী, *মিছিলে মিছিলে গান গাই, এবং জলার্ক (যুদ্ধজয়ের গান সংখ্যা)*, কলকাতা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ১২৯

৩১ 'হিন্দুস্থানী সংগীতের ভিত যে দেহাতী গান, লোকগীতি বা ফোক মিউজিক, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সিন্ধু, সুরাট, বিহারী, মুলতানী, পাহাড়ী, জৌনপুরী, গুর্জরী, রাজস্থানের মাণ্ড, বঙ্গাল ভৈরব মাত্র এই কটা নাম থেকে আন্দাজ করা যায় কীভাবে লোকগীতি হিন্দুস্তানী সংগীতের গতিশীলতা ও বৃদ্ধির (Dynamic growth) জন্য দায়ী। হালকা গানের ক্ষেত্রে এ বক্তব্য আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। যথা কাশী মির্জাপুরের চৈতী, বর্ষায় কাজরী ও ঝুলা, পঞ্জাবের উট সওয়ারীদের টপ্পা। শেষোক্ত অঙ্গ গোয়ালিয়র গায়কির মধ্যে ঢুকে খেয়ালকে সমৃদ্ধ করেছে। এই আদি ও অকৃত্রিম পাহাড়ি ধুন সা রে গা পা ধা র্সা যার থেকে মার্গীকরণের ফলে বের হয়েছে ভূপালী, দেশকার, শুদ্ধকল্যাণ, জৈৎ-কল্যাণ ইত্যাদি।' সংগীতকার কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য শারদীয় দেশ ১৪০৭ এর উৎস থেকে সংগৃহীত।

দিনেন্দ্র চৌধুরী, *ভাটিয়ালী গান*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ১০২

৩২ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, *উজান গাঙ বাইয়া*, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯০, পৃ. ১৩৯

৩৩ সলিল চৌধুরী, *সেই বাঁশিওয়ালা*, গণনাট্য প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১২৩

৩৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি অবলম্বনে শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৭২, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশের গণসংগীত

(স্বাধীনতা ও পরবর্তীকাল)

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য

ভূমিকা ১৭২

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৭৩

মুক্তি ও বিজয়ের গান ১৮০
(যুদ্ধকালীন প্রণোদনামুখী গান; বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক অনুষ্ঠান; শরণার্থী শিবিরের গান; মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান; স্বাধীনতা উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনা)

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আন্দোলন ও গান ১৯৮
(রাজনৈতিক সংকট: বিপর্যস্ত স্বাধীনতা লুণ্ঠিত নবরাষ্ট্র, ৯-এর গণ-অভ্যুত্থান; সামাজিক সংকট; প্রাকৃতিক সংকট)

গণসংগীতের একাল ২১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য

ভূমিকা ২৩৭

লোকসুরাশ্রিত নাগরিক সুর ২৪০

বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ও মিশ্রসুর ১৪৩

প্রতিবিপ্লবী ও নাটকীয় সুর ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিষয়বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা পরবর্তীকাল)

ভূমিকা

সংগীত মননশীলতার চর্চাই শুধু করে না, নিবেদনে-বিনোদনে সব ধরনের শিল্পশাখার থেকে অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী। এর মাঝে মানবিক বোধ জাগরণ কিংবা মতাদর্শ প্রচারের উপযোগিতাও একচ্ছত্র আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সংগীত যে কখনো কখনো সমরাস্ত্রের থেকেও বেশি শক্তিধর তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে যুদ্ধের দামামা বাদনে কিংবা রণসংগীতের অবদান দেখে। বাংলা গণসংগীত ব্রিটিশ বিতাড়ন ও ফ্যাসিবিদ্রোহ থেকে ৭০ দশকের স্বাধিকার আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের অস্ত্র হিসেবে বা কখনো প্রতিরোধের ঢাল হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতাকালীন সময়ে সংগীত যেভাবে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহসী সেনাপতির ন্যায় দুর্বার যুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে– এমন নজিরবিহীন ঘটনা ইতিহাসে বিরল। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারের গান, মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার গান, বিজয়ের পরে গৌরব ও শোকের গান ঐতিহাসিক প্রতিবেদনকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে মানুষের হৃদয়ে অনন্য আসন করে নিয়েছে। নিম্নরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে অবদানশীল গণচেতনার গানগুলো উপস্থাপন করা হলো। দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে স্বাধীনতা ও পরবর্তীকালের গানকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার শাখা উপশাখা নিম্নরূপ ছকে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হলো।

বাংলাদেশের গণসংগীত স্বাধীনতা ও পরবর্তীকালের বৈচিত্র্য বিভাজন

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' প্রধান দুইটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে বিভক্ত। ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বিজয় দিবস পর্যন্ত এর আয়ুষ্কাল ধার্য হলেও ২৪শে মে ১৯৭১ পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী)[১] বেতার' নামে মাত্র ১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এক প্রবল সাহসিকতার উদাহরণই পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীন করতে অন্যতম ভূমিকা রাখে। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখল করে এই দুঃসাহসিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তিতে অংশবিশেষ ট্রাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পটিয়া নামক স্থানে। সেখান থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২৫শে মে বাংলা ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ সাল মঙ্গলবার ৫০ কিলোওয়াট উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় কলকাতার বালীগঞ্জের সার্কুলার রোডে ৫৭/৮ নং দ্বিতল বাড়ীতে।

প্রথম পর্বের উদ্বোধন কালে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা কতিপয় বিদ্রোহীদের অসম সাহসিকতার ফসল। সেদিন অপরাহ্নে দখলদার বাহিনীকে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানান জনাব আবদুল হান্নান। ৫ মিনিট চলমান ঘোষণা ও যুদ্ধের আহবান হঠাৎ থেমে যাওয়ার পর আবার সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মিনিটে ঘোষিত হয় 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার থেকে বলছি'। এই কণ্ঠ ছিলো বেলাল মোহাম্মদের। "সদ্য গর্বিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের নাম ঘোষণা প্রচারের দুঃসাহসিক কাজটি সম্পাদন করেছিলেন চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব আবুল কাসেম সন্দ্বীপ।"[২] সুলতানুল আলম ও আব্দুল্লাহ আল ফারুক বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের নাম বার বার প্রচার করেন। হানাদার বাহিনীর ইয়াহিয়া চক্র এতে ভীষণ আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং ৩০শে মার্চ বেতার কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ করে। কিন্তু অকুতোভয় কিছু বীর সৈনিক ১০ কিলোওয়াটের থেকে ১ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটারকে ট্রাকে তুলে পটিয়া গমন করে। ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টাল করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন সৈয়দ আবদুস শুকুর, আমিনুর রহমান এবং আবু তাহের চৌধুরী। ২৪শে মে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের কাজ এভাবেই চলতে থাকে।

২৫শে মে ১৯৭১ সাল মঙ্গলবার সকাল ৭ টায় ৫০ কিলোওয়াট সমৃদ্ধ নতুন ইথারে ভেসে এলো 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানের যন্ত্রসংগীত। দ্বিতীয় পর্বের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার কলকাতার বালীগঞ্জ থেকে প্রচার শুরু হয়। উচ্চারিত হয়–

> "আস্-সালামু আলাইকুম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের প্রথম অধিবেশন শুরু করছি। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটার ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৮৩০ কিলো সাইকেলে।"[৩]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রধানত দুই ভাগে পরিচালিত হতো। একটি তথ্য বিভাগ, অন্যটি সংগীত বিভাগ। তথ্য বিভাগে সংবাদ, বুলেটিন, চরমপত্র, নাটকসহ নানা তথ্যমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো; সংগীত বিভাগে দেশাত্ববোধক, গণসংগীত, মুক্তির গানসহ বাংলাগানের ভাণ্ডার থেকে নির্বাচিত বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক স্বদেশী, আধুনিক ও লোকসংগীত পরিবেশন করা হতো। সংবাদ শাখার প্রধান উপজীব্য

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় ছিল হানাদার বাহিনীর মিথ্যাচার এবং দখল হারাবার তথ্য প্রচারপূর্বক বাঙালিকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুগপৎ ক্রোধান্বিত করে তোলা এবং মিথ্যাচার ও প্রকৃত তথ্য গোপনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে জাতিকে সামগ্রিক ভাবে আশান্বিত করে তোলা। আর সংগীত শাখার প্রধান কাজ ছিল উদ্দীপনামূলক গান প্রচার করে যুদ্ধরত মুক্তিবাহিনীর প্রেরণা জোগানো এবং তাঁদের জন্য উদ্বীগ্ন স্বদেশবাসীর মনোবল বাড়ানো। বাঙালির মুক্তির জন্য নিবেদিত গানগুলো আর কোনো কালেই এমন ফলপ্রসু গণসৃজনের বিষয় হয়নি বা এমন মহান কল্যাণকর ভূমিকা পালন করে নি[৪] ১৯৬৯ থেকে '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের তেজ ও তীব্রতাকে ধারণ করে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রবল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় সাহসী যুবকের তৎপরতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষনাসহ নানা উদ্দীপনামূলক সংবাদ ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একদিকে প্রকাশ অন্যদিকে সৃষ্টির দুরন্ত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় যে ১১ জন[৫] দুঃসাহসিক ব্যক্তি সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন– তাঁরা হলেন সর্বজনাব

বেলাল মোহাম্মদ	দলনেতা ও অনুষ্ঠান সংগঠক
আবুল কাশেম সন্দ্বীপ	প্রথম কণ্ঠদানকারী এবং সাব-এডিটর বার্তাবিভাগ
রাশেদুল হাসান	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট
সৈয়দ আব্দুস শাকের	প্রকৌশলী
আব্দুল্লাহ আল ফারুক	অনুষ্ঠান প্রযোজক, সাহিত্য
এ. এম. শরফুজ্জামান	অপারেটর
আমিনুর রহমান	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট
রেজাউল করিম চৌধুরী	প্রকৌশলী সহযোগী
মোস্তফা আনোয়ার	অনুষ্ঠান প্রযোজক, নাটক
কাজী হাবিবউদ্দিন মণি	অনুষ্ঠান সচিব
সুব্রত বড়ুয়া	লেখক

যে কয়জন নিবেদিত ব্যক্তি সাংগঠনিক তৎপরতায় উল্লিখিত কর্মীকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন–

ডাক্তার মোহাম্মদ শফি (শহীদ)
বেগম মুশতারী শফি
মীর্জা নাসির উদ্দিন
জনাব সুলতান আলী
জনাব আবদুস সোবহান
জনাব দেলোয়ার হোসেন
জনাব মাহমুদ হোসেন (শহীদ)
জনাব ফারুক চৌধুরী (শহীদ)
জনাব মোসলেম খান প্রমুখ

বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন– আমিনুল হক বাদশা, কামাল লোহানী, ম মামুন, সুব্রত বড়ুয়া, মৃণালকৃষ্ণ রায়, হাসান ইমাম,

Dhaka University Institutional Repository

আশফাকুর রহমান খান, মেসবাহ উদ্দিন, বেলাল মোহাম্মদ, আলমগীর কবির, টি এইচ সিকদার, তাহের সুলতান, আবদুল্লাহ আল ফারুক, মোস্তফা আনোয়ার, মোহাম্মদ ফারুক, আলী জাকের, জাহীদ সিদ্দিকী, আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, এ কে এম শামসুদ্দিন, টি ই এম শিকদার, মুস্তাফিজুর রহমান, আনু ইসলামসহ অনেকেই ।

নিয়মিত অনুষ্ঠানের নানা পর্যায়ে অতিথি ও বক্তা রূপে অংশ নিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান (ইসলামের দৃষ্টিতে), ড. মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, রণেশ দাশগুপ্ত (দৃষ্টিপাত), এম আর আক্তার মুকুল (চরমপত্র), কল্যাণ মিত্র (জল্লাদের দরবার), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (প্রতিনিধি কণ্ঠ), ফয়েজ আহমদ (রাজনৈতিক মঞ্চ), সাদেকীন (বিশ্ব বিবেক), গাজীউল হক (রণাঙ্গনের চিঠি), সলিমুল্লাহ (রাজনৈতিক পর্যালোচনা), মোস্তাফিজুর রহমান (কাঠগড়ায় আসামি), মাহবুব তালুকদার (মানুষের মুখ), বদরুল হাসান (পাণ্ডুলিপি ও কণ্ঠদান), নাসিম চৌধুরী (গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল), হাবিবুল্লাহ (জেহাদ ও ইয়াহিয়া সরকার) । সুধীজন হিসেবে অংশ নিয়েছেন- ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, ড. এম আর মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মওদুদ আহমদ, ড. বেলায়েত হোসেন, ড. অজয় রায়, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, জহির রায়হান, আবদুর রাজ্জাক, সন্তোষ গুপ্ত, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, অমিত রায় চৌধুরী প্রমুখ ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শাখার অন্যতম সংগঠক ছিলেন সমর দাস (১৯২৫-২০০১), সুজেয় শ্যাম এবং অজিত রায় । মুক্তির জন্য গণমানুষকে জাগ্রত করার কাজে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নিত্য নতুন গণসংগীত, অন্যদিকে জাগরণের জন্য উদ্দীপ্ত পুরাতন বাংলা গান যেমন স্বদেশীগান, রবীন্দ্র সংগীত, মুকুন্দ দাসের গান, নজরুল সংগীতসহ জনপ্রিয় গানগুলো সুনির্বাচনের মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে প্রচারিত হয়েছে । বেতার কেন্দ্রে সাথে থেকে সংগীত পরিচালনা করেছেন সমর দাস, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, লাকী আকন্দ, সুজেয় শ্যাম প্রমুখ । একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশনায় যারা কণ্ঠদান করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে–সমর দাস, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, অজিত রায়, রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রবাল চৌধুরী, রফিকুল আলম, কাদেরী কিবরিয়া, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, তপন ভট্টাচার্য, তপন মাহমুদ, বিপুল ভট্টাচার্য, আবদুল গণি বোখারী, ফকির আলমগীর, এম এ মান্নান, অনুপ ভট্টাচার্য, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, অরূপরতন চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, হরলাল রায়, সুবল দাস, রফিকুল আলম, মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালী, লাকী আকন্দ, মান্না হক, মোশাদ আলী, শেখ জহুর উদ্দীন, মঞ্জুর আহমেদ, মনোরঞ্জন ষোষাল, তোরাপ আলী শাহ, অনীল চন্দ্র, সুকুমার বিশ্বাস, তিমির নন্দী, শহীদ হাসান, সুব্রত সেনগুপ্ত, মুক্তার আহমদ, গোপীনাথ, মোঃ কামাল উদ্দীন, রঞ্জন ঘটক, প্রণোদিত বড়ুয়া, মনোয়ার হোসেন খান, জগদীশ কর্মকার, অজয় কুমার হোর, মলয় ঘোষ দস্তিদার, সৈয়দ মহিউদ্দীন হায়দার খোকা, মাহমুদুর রহমান বেনু, মোঃ আঙ্গুর, আবু নওশের, মোস্তফা, মোঃ তানুজ, মামুন আল চৌধুরী, পটুয়া কামরুল হাসান, শাহ আলী সরকার, সর্দার আলাউদ্দিন, মোকসেদ আলী সাই, মদনমোহন দাস হরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, তড়িত হোসেন খান প্রমুখ ।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম সানজিদা খাতুন, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, স্বপ্না রায়, নমিতা ঘোষ, মালা খান, রূপা খান, মাধুরী আচার্য, রমা ভৌমিক, ডালিয়া নওশীন, শাহীন সামাদ, লায়লা

Dhaka University Institutional Repository

জামান, উমা ইসলাম, নাসরীন আহমেদ শীলু, মিতালী মুখার্জি, মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, বুলবুল মহলানবীস, ঝর্ণা ব্যনার্জী, আফরোজা মাসুদ, অরুণা সাহা, ফ্লোরা আহমেদ, বুলা মাহমুদ প্রমুখ ।

"গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল লতিফ, হরলাল রায়, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নঈম গওহর, শহিদুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরী, শেখ লুতফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবদুল গণি বোখারী, ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া, আবুবকর সিদ্দিক, দিলওয়ার প্রমুখ ।"[৬]

যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত সুবল দত্ত, অরুণ গোস্বামী, অবিনাশ শীল, রুনু খান, বাসুদেব দাস, সুনীল গোস্বামী, গোপী বল্লভ, বাবুল দত্ত, দীপক মুখার্জী, সমীর চন্দ্র, কালাচাঁদ ঘোষ, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ দাসগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত বিভাগ যে গানগুলো পরিবেশন করেছে যুদ্ধকালীন সময়ে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৪ ধরণের সংগীত প্রচারের উপযোগিতা পেয়েছিল যথা–

"(ক) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দেশাত্মবোধক, আধুনিক, পল্লিগীতি ও জারিগান । এ সবের অধিকাংশই বেতার কেন্দ্রে বসেই রচিত হয়েছে ।

(খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশাত্মবোধক আধুনিক সমবেত কণ্ঠ-সংগীত । এসব গান আলোচ্য সময়ে রচিত হয়েছে ।

(গ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমূখের রচিত কালজয়ী সঙ্গীতমালা বাংলাদেশের গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে এ সময় পুনঃধারণ করে প্রচারিত হয়েছে । এ পর্যায়ে সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচিত এবং এককালে গণনাট্য সংঘ কর্তৃক পরিবেশিত গানগুলোও আমাদের শিল্পীর কণ্ঠে নতুন করে প্রচারিত হয়েছে ।

(ঘ) ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাপের মুখে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে যেসব গান প্রচারিত হয়েছিল, স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সেগুলো পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিলো ।"[৭]

উপরোক্ত বিভাজনের আলোকে যে সকল গান সেই সময় রচিত হয়েছিলো তার আঙ্গিক, বিষয় ও ভাব পূর্ববর্তীকালের বাংলা গণসংগীতের সাথে আদর্শ ও বিষয়গত মিল নিয়ে অনেক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু যে গান পরিবেশনের মধ্যদিয়ে মুক্তিপাগল লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী-সংগ্রামী মানুষকে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে—তা তো গণমানুষের গান বলেই বিবেচ্য হবে, এটাই স্বাভাবিক । এমনকি আরো অনেক গানই আছে যা সাধারণ গান হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু বেতারে পুনঃপ্রচারের পরই বিবেচ্য হয়েছে যে গানগুলোয় গণসংগীতের উপাদান ছিল যথেষ্ট পরিমাণ । উপরোক্ত চার ধরণের বিভাজনের মধ্যে যে গানগুলো পাওয়া যায়, বিভিন্ন বইপুস্তক, সাক্ষাৎকার, স্মৃতি থেকে তথ্য মোট ১২৫টি গানের বেশি পাওয়া যায় না । তবে নতুন পুরাতন পরিবেশিত গানের মধ্যে নতুন সৃজন গানের সংখ্যাই বেশি । সবমিলিয়ে শতাধিক গান সৃজন করা হয়েছে বলে ধারণা করে যায় । কিছু কিছু গান

Dhaka University Institutional Repository

বহুবার পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার পরিবেশিত গানের সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়নি। ফলে সঠিক পরিমাণ বের করা প্রায় অসম্ভব। নিম্নরূপ এ পর্যন্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে পাওয়া গানগুলোর একটি তালিকা প্রণয়ন করা হলো। বেতার কেন্দ্রে প্রচারের জন্য রচিত ও নির্বাচিত গানগুলোর তালিকা ও সংক্ষিপ্ত তথ্য গ্রন্থ-পত্রিকা, স্মৃতি-সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে সাজানো হলো :

ক্রমিক	গানের শিরোনাম	রচয়িতা/ অনুবাদক	সুর	কণ্ঠ
০১	সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
০২	শোন একটি মুজিবরের থেকে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
০৩	জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	কোরাস
০৪	সোনায় মোড়ানো বাংলা	মোকসেদ আলী সাঁই	মোকসেদ আলী সাঁই	
০৫	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
০৬	আমার নেতা শেখ মুজিব	হাফিজুর রহমান	হাফিজুর রহমান	
০৭	ওরে ও বাঙালি রে	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার
০৮	মুজিব বাইয়া যাও রে	সরদার আলাউদ্দিন	প্রচলিত	মো.আবদুল জব্বার
০৯	ও বগিলারে, কেন বা আইলু	হরলাল রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়
১০	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	
১১	নোঙ্গর তোলো তোলো	নঈম গওহর		কোরাস
১২	পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	সমর দাস+সমবেত
১৩	চাষাদের মুটেদের মজুরের	আলী মোহসীন রেজা	রথীন্দ্রনাথ রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়
১৪	বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ..	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস	
১৫	সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ	সারওয়ার জাহান	সারওয়ার জাহান	
১৬	তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	
১৭	রক্তে যদি ফোটে জীবনের ফুল	সৈয়দ শামসুল হুদা	আজাদ রহমান	
১৮	মোদের ফসল কেড়ে নিল রে	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	
১৯	জগৎবাসী একবার আসিয়া	শহীদুল ইসলাম	সরদার আলাউদ্দিন	
২০	মুক্তিভাই ঝম ঝম করে	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্
২১	জনপথ প্রান্তরে, সাগরের বন্দরে	মুস্তাফিজুর রহমান	আবদুল আজিজ বাচ্চু	
২২	পথে যেতে যেতে জন্ম হলো	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
২৩	মুক্তির একই পথ সংগ্রাম	শহীদুল ইসলাম	সুজেয় শ্যাম	
২৪	এই সূর্যোদয়ের ভোরে এসো			
২৫	বিজয় নিশান উড়ছে ঐ			
২৬	সাগর পাড়িতে ঝড় জাগেই যদি			

Dhaka University Institutional Repository

২৭	'হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার'	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	
২৮	কেঁদো না কেঁদোনা মাগো			
২৯	অনেক রক্ত কিনেছি আমরা	টি এইচ শিকদার	আবদুল জব্বার	আবদুল জব্বার
৩০	অত্যাচারের পাষাণ জ্বালিয়ে দাও			
৩১	আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা			
৩২	জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো	নয়ীম গওহর	আজাদ রহমান	
৩৩	গেরিলা আমরা আমরা গেরিলা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	
৩৪	আমার মুক্তিবাহিনী ভাইরা	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্	তোরাপ আলী শাহ্
৩৫	অবাক পৃথিবী দেখো	নূর আলম সিদ্দিকী		পটুয়া কামরুল হাসান
৩৬	ওরে আমার দেশের মাণিক সোনা	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	
৩৭	রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি			
৩৮	এ ঘর দূর্গ ও ঘর দূর্গ	গীতিনকশা: শাহজাহান ফারুক	সংগীত: সুজেয় শ্যাম	বর্ণনা: আশরাফুল আলম
৩৯	বাংলা থেকে দুশমনদের	সরদার আলাউদ্দিন	সরদার আলাউদ্দিন	
৪০	বলো বীর সৈনিক	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
৪১	শেখ মুজিবর সত্য যুগের	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ
৪২	পথের আঁধর্ আর নাই	লাকী আকন্দ	লাকী আকন্দ	
৪৩	রক্ত চাই (গীতি নকশা)		সংগীত: সুজেয় শ্যাম	
৪৪	সংগ্রাম সংগ্রাম		অনুপ ভট্টাচার্য	
৪৫	জাগো জাগো ও বাঙালি			
৪৬	ভেবোনা মাগো তোমার ছেলেরা			

এছাড়াও শতাধিক গানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় যার কোনোটির গীতিকার, কোনোটির সুরকার কিংবা শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না। এসময় সংরক্ষণের মতোও তেমন সুবিধাজনক পরিস্থিতি ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে, তৎকালীন স্বাধীন বাংলা বেতারে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে যে গানগুলো যেভাবে পাওয়া যায়, সেখানে রবীন্দ্র, নজরুল, লোকসংগীত ইত্যাদির মধ্যে নতুন কিছু গানের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে নির্ভরযোগ্য কিছুগান উল্লেখ করা হলো– কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' সুরারোপ করেন অজিত রায়; শ্যামল গুপ্তের লেখা ও বাপ্পি লাহিড়ীর সুরে 'হাজার বছর পরে'; মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালির 'জয়ধ্বনি কর বীর মুজিবর'; হরলাল রায়ের লেখা 'তোমার নেতা আমার নেতা'; বাউল অনিল চন্দ্র দে'র 'যুদ্ধ করো অসি ধরে'; নাসরীন ও স্বরূপের কণ্ঠে গীত 'জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে'; মনজুর আহমেদের 'সোনার স্বদেশভূমি'; মান্না হকের লেখা 'আমি শুনেছি শুনেছি বাংলা মায়ের'; আবদুল গণি বোখারীর 'ঐ ঐ ঐ চল চল চল নওজোয়ান', 'বীর মুক্তিযোদ্ধা তোদের'; হরলাল রায়ের 'আহা ইয়াহিয়া কান্দেরে'; হযরত আলীর 'সোনার বাংলা জারী'; মোঃ মুন্নাফের 'ও আমার দেশবাসী ভাই' মোশাদ আলীর 'সোনার বাংলা করবো সোনার', 'হানাদারদের মারতে হবে, চলো রে'; শাহ আলী সরকারের 'দস্যু মারিতে চল ধাইয়া', 'তোরা জোরসে চল', 'ওরা কোথায় গো'; মনোরঞ্জন সরকারের 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর'; ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর

Dhaka University Institutional Repository

'ও বাঙালি ভাই কে কে যাবি আয়রে'; ফেরদৌস হোসেন ভুঁইঞার 'হায় রে কিষাণ তোদের শীর্ণ দেহ'; এছাড়া গীতিকার সুরকারের নাম না জানা কিছু গান 'সোনার বাংলা বলো', 'চলরে সবাই বাঁধ ভাঙাবার', 'সাত কোটি মোরা করেছি অঙ্গিকার', 'মুজিবর মুজিবর', 'ওরে শোন রে তোরা শোন', 'দুর্জয় মোরা সাত কোটি', 'রুখে দাঁড়াও রুখে দাঁড়াও', 'জয় জয় জয় হবে বাংলার', 'আজ রণ সাজে বাজিয়ে বিষাণ', 'আকাশের তারার মতো', 'ঝড় ঝঞ্ঝার মুখোমুখি', 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'ওরা কলিজা ছিঁড়ে', 'ওরা যতই বলুক', 'আগুন আগুন আমরা আগুন', 'বারুদে বারুদে সারা বাংলা', 'দেয়ালে দেয়ালে লেখা', 'সম্মুখপানে চলবো আমরা', 'ধন্য আমার জন্মভূমি', 'আয়রে চাষী মজুর কুলি', 'আমি মরব তাতে ক্ষতি নাই', 'অত্যাচারীর পাষাণ কারা', 'লেফট রাইট, নওজোয়ান', 'চলছে মিছিল চলবে মিছিল', 'জয় জয় দুর্জয় বাংলা', 'কার বা বিচার কেবা করে রে', 'নওজোয়ান সব এগিয়ে চলো', 'রক্ত রঙিন উজ্জ্বল দিন', 'পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে', 'আরে ও মাঝি ভাই', 'এবার উঠেছে মহা ঝড় আলোড়ন', 'চল ছুটে চল' ইত্যাদি[৮] ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোনো গণসংগীতের রূপরেখা ভিত্তিক সংগঠন নয় । কিন্তু তার প্রাণে ছিল অকুতোভয় সাহস জাগানো দীপ্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার এক প্রবল প্রেরণা । বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত ও একযোগে কাজ করে যাওয়ার গণমুখী প্রচেষ্টা ইতিহাসে আর কোনো পর্বেই এমন ফলপ্রসু হয় নি । বাংলার ঘরে ঘরে রচিত এসময়ের গণমুখী গানগুলো উৎকর্ষের উচ্চতম শিখর স্পর্শ করেছিল । যুদ্ধের সাহস জাগানো, হতাশা মুক্তি, পাকিস্তানিদের মিথ্যাচার পরিবেশনের থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র সংগীত, শ্যামা কিংবা কীর্তন, সবই এখানে গণজোয়ারের স্রোতে মিলিত হয়ে গিয়েছিল একই আদর্শ ও লক্ষ্যে ।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি ও বিজয়ের গান

১৯৭১ সালে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে গণসংগীত ভূমিকা রেখেছিল প্রধানত তিনভাগে। প্রথমত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচারিত গান, পূর্বে যা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এর বাইরে যে দুইভাবে সংগীত মানুষকে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রধানত শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-লেখক-কবিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে (এরমধ্যে কেউ কেউ গ্রামীণ জীবনের সকল উপাদান নিয়ে আধুনিক মননে প্রকাশ করেছেন) এবং কালচারাল স্কোয়াড গঠন করে মুক্তিসেনাদের সাথে ও শরণার্থী শিবিরে ভ্রাম্যমাণ সংগীত পরিবেশন করে উদ্বুদ্ধ করা[৯]। দ্বিতীয়ত্ব গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্য কবিয়াল-জারিয়াল-কীর্তনীয়াদের আপন বলয়ে নিত্য নতুন সংগীত সৃষ্টি ও পরিবেশনের মধ্যদিয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত করা ও মুক্তির জন্য অস্ত্রধরার দিকে ঝুঁকে পড়ায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে হাটে-মাঠে-ঘাটে, যুদ্ধে-মিছিলে অজস্র কবিতা ও গান মুখরিত করেছিল। একদিকে যেমন এগিয়ে চলার প্রবল প্রত্যয় ও সাহস জোগানোর জন্য সুজেয় শ্যামের সুরে শহীদুল ইসলাম লিখেন–

'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম
অনাচার অবিচার শোষকের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ বিক্ষোভ ঝংকারে হুংকার
আমরণ সংঘাত, প্রচণ্ড উদ্দাম
সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম॥'

অন্যদিকে গ্রামীণ গীতিকার মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি (শফি বাঙালি) যুদ্ধের সময় পুথির ঢং-এ লিখে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশন করে বেড়ান–

'আমরা ছাড়বো না ছাড়বো না
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না...
বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছে চলো মুক্তিযুদ্ধে
গোলাম হয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যু বহু উর্ধ্বে
বসে থাকবো না থাকবো না
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না॥'

যুদ্ধকালীন সময় বাংলার মানুষের জীবন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকার মিশে গিয়েছিলো দেশ মুক্ত করার সামগ্রিক শক্তিতে। কিছু সুবিধাভোগী হানাদার বাহিনীর দালাল গোষ্ঠীর হত্যাপ্রবণ গুপ্তচরবৃত্তি না হ'লে বাংলার মানুষের যে ত্যাগ-ঐক্য ও শৃঙ্খলা লক্ষ করা গিয়েছিল, তাতে এতটা রক্তক্ষয়-নৃশংসতা ও বুদ্ধিজীবী হত্যা হতো না। অনেক মূল্য দিয়ে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাতে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উত্থান-পতনের। মুক্তিসেনারা যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল তা নয়, এমনকি অস্ত্রপরিচালনায়ও তেমন অভিজ্ঞ ছিল না, কিন্তু সমরাস্ত্রের তুলনায় এই সকল সাংস্কৃতিক তৎপরতা সাহস-স্থিরতা ও উদ্দাম যুগিয়েছে অস্ত্রের ন্যায়। মুক্তির গান ছিল একেকটা গ্রেনেডের মতো, বোমার মতো মানবিক দৃঢ়তার দেয়াল, এই সংগীত রচনার জন্য ছিল না কোনো পার্টিলাইনের আদেশ নির্দেশ, না ছিল ব্যবসায়িক সাফল্যের চিন্তা, অথবা শিল্পজগতে নাম প্রচারের বাসনা, এমনকি শিল্প বিবেচনায় সাংস্কৃতিক প্রয়াস বলেও মনে করে নি কোনো লেখক-শিল্পী। সম্পূর্ণ প্রাণের তাগিদে, জীবন জাতি ও রাষ্ট্রের গভীর

Dhaka University Institutional Repository

সংকটময় মুহূর্তে প্রত্যেকে এক হয়ে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গিকারই ছিল প্রধান। মুক্তি কোন পথে আসবে তাদের জানা ছিলো না, শুধু এগিয়ে যেতে হবে, আর যারা এগিয়ে যাবে তাদেরকে সকল দিক থেকে সাহসী ও বীরত্ব শৌর্যবান করে তুলতে হবে, মুক্তির গান শুধু সেই প্রত্যয়ের কথাই জানতো। যে কারণে অন্য সময়ের দেশগান কিংবা গণসংগীত থেকে এই সময়ে রচিত গান অনেক বেশি প্রাণস্পর্শী, তীর্যক এবং সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ।

মুক্তি আন্দোলনে প্রচারিত সংগীতের মধ্যে একদিকে রয়েছে বাংলাগানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, অন্যদিকে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জোগানো রণসংগীত, মিছিলের গান এবং দেশাত্মবোধক গান। গণসংগীতের যে অতীত ধারাবাহিকতা সেখানে মার্কসীয় আদর্শ ভিত্তিক সর্বহারা মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত। মুক্তির গান থেকে আরো বৃহত্তর অবস্থানে অর্থাৎ জাতীয় সংহতি ও সামগ্রিক জাগরণের দিকে মনোনিবেশ করেছে। শুধু তাই নয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে যে স্বদেশী গানের উৎকর্ষ ঘটেছিল– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রচিত দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে পেয়েছে তার চূড়ান্ত প্রকাশ। স্বদেশীগান যেমন রচিত হয়েছিল ভারত পুনরুদ্ধারের আকাঙ্খায় ও ব্যাকুলতায়। ১৯৭১ সাল থেকে অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান রচিত হয় বাংলাদেশ স্বাধীন করার আশায়। একটি দেশ, একটি স্বাধীনতা, একটি সামগ্রিক অধিকার মানুষের মনে ও মননে কাজ করলে যে দেশগান রচিত হয় তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দুই সময়ের ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বিবেচনায়।

মুক্তির গান প্রগতির গভীরতম প্রণোদনা। এ যেন অর্জিত অধিকারকে দুষ্কৃতকারী কর্তৃক হরণের পর তা পুনরুদ্ধারের জন্য হুংকার। হানাদারদের অবিরাম অত্যাচার খুন-ধর্ষণ ও একপেশে নারকীয়তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো গর্জন। ফলে বিশেষ সাংগীতিক সংজ্ঞায় বিশ্লেষণ করা জটিল হলেও, প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির অধিকার পুনরুদ্ধারের গণগর্জন তো গণসংগীতই। এমনই একটি গানের উদাহরণ দেয়া যায়–

'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল
জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে রক্তলাল
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল
শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে
অত্যাচারিরা কাঁপে আজ ত্রাসে
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ ওঠে
নয় বাংলার নয়া সকাল॥'

তৎকালীন ৭ কোটি মানুষই গেয়ে উঠেছিল একযোগে—যখন যুদ্ধ চলছে, হানাদার বাহিনীরা টলছে, স্বাধীনতার সূর্য উঁকি মারছে, একটি একটি করে এলাকা মুক্তিসেনাদের কবলে আসছে। হানাদারদের রণকৌশল ও অস্ত্র-গারদ শেষ হয়ে আসছে। বাংলার প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের সাহসের সামনে বিজয়ের ইঙ্গিত টের পাওয়া যাচ্ছে। এমনই পরিস্থিতি নিয়ে গানটি লিখেছিলেন গোবিন্দ হালদার, সুর করেছিলেন সমর দাস।

মুক্তি ও বিজয়ের গানকে পরিবেশনা এবং উদ্দেশ্যগত বিচারে ৫টি শ্রেণীতে অবলোকন করা যায়—

Dhaka University Institutional Repository

১. যুদ্ধকালীন সময়ে রচিত প্রণোদনামুখী গান
২. বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক অনুষ্ঠান
৩. শরণার্থী শিবিরের গান
৪. যুদ্ধপূর্বকালীন ও তৎসমকালে রচিত দেশাত্মবোধক গান এবং
৫. স্বাধীনতা উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনা

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকাংশ গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সম্প্রচার করা হয়েছে। তবে এই পর্যায়ের গান যে গ্রাম-বাংলার হাটে-মাঠে আরো কতো শত সৃষ্ট হয়েছে এবং সময়ের প্রয়োজনে জ্বলে উঠে শেষ হয়ে গিয়েছে সংরক্ষণের অভাবে। বিশেষ করে লোককবিদের গানের অনুসন্ধান করলে অসংখ্য গানের সন্ধান পাওয়া যায়।

যুদ্ধকালীন প্রণোদনামুখী গান

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহর পাকিস্তানী হানাদারদের গুলি আর খুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষ বুঝে নেয় আর থেমে থাকার সময় নেই। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রস্তুতি চলে মুক্তিকাঙ্খায় যুদ্ধে যাবার। দখল করা হয় কালুর ঘাট বেতারকেন্দ্র। ঘোষণা করা হয় স্বাধীনতা। সাধারণ মানুষেরা পালাতে থাকে গ্রামে-গঞ্জে-নিরাপদ আশ্রয়ে। শরণার্থীরা ছুটতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত মুখে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের খুনের উপর দিয়ে পাকিস্তানী আর্মিরা উল্লাস করে। আর পিছু হটা নয়, নির্বিকার মৃত্যু নয়; শিল্পী-গীতিকার-কবি-সুরকার মুক্তিপাগল মানুষের উদ্দীপ্ত করা সাহস জোগানোর উদ্দেশ্যে রচনা করতে থাকে অসংখ্য গান। আলতাফ মাহমুদ, আবদুল লতিফসহ অনেকের ভূমিকা সম্পর্কে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ বলেন–"এপ্রিলের শেষের দিক থেকেই আলতাফ মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধের জন্যে সংগীত রচনার কাজে পুরোপুরি লেগে যান। ...তখন স্বাধীন বাংলা বেতার ভালোভাবেই চলছে। রোজ প্রায় একই গান বাজতো। আলতাফ ভাই একারণেও নতুন গানের প্রয়োজন অনুভব করতেন। সারা বললেন, (আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী), কেউ জানে না, লতিফ ভাই আমাদের বাড়ি বসেই গান লিখতেন। বলতেন–সুর দেওয়া হলেই ছিঁড়ে ফেলবে। আলতাফ সাহেবও কিছু গান লিখছেন। ঐ সময়টা যেন আচ্ছন্নের মতো কাটিয়েছেন। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে একা বসে সুর দিতেন।"[১০] ঠিক এভাবেই প্রতিটি ঘর দুর্গে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষ যার যা সামর্থ্য তা নিয়ে মাঠে নেমে এসেছিলেন। গাইতে গাইতে–

'জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য উঠার এইতো সময়॥'

মুক্তিসেনাদের প্রবল আবেগ-সাহসিকতা ও স্বপ্নের প্রতিশব্দ এভাবে রচিত হয়–

'বাংলার প্রতিঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে
নেই ভয়–হয় হউক রক্তের প্রচ্ছদপট

Dhaka University Institutional Repository

(তবু) করি না করি না করি না ভয়॥

যুদ্ধের শত্রুদের পাশবিক নিধনযজ্ঞে স্বদেশ মরুভূমির মতো। মানুষের হাহাকার-ভয়-শংসয়ে চরম বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় মুসড়ে পড়া নয়—মুক্তি পেতেই হবে। জয় আমাদের হবেই এই প্রত্যয় ও সাহসে বুক বাধার প্রতিশব্দ—

অশোকের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরী
হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার
আর ঐ কান্নার শব্দ
শাসনের নামে চলে শোষণের সুকঠিন যন্ত্র
বজ্রের হুংকারে শৃঙ্খল ভাঙতে সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র
আর নয় তীলে তীলে বাঙালির এই পরাজয়
(তবু) করি না করি না করি না ভয়॥'

গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা (১৯৪৩-) এবং আনোয়ার পারভেজের সুরে এই গানটি বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে শত শতবার গীত হয়েছে।

এমনি প্রণোদনামুখী উল্লেখযোগ্য আরোকিছু গানের তালিকা নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হলো–

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও অংশুমান রায়ের সুরে ও কণ্ঠে–

'শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ॥'

গোবিন্দ হালদারের কথা ও আপেল মাহমুদের সুরে গাওয়া—

'মোরা একটি ফুলকে বাঁচবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।
যে মাটির চির মমতা আমার অঙ্গে মাখা
যার নদীর জল ফুলে-ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা
যে দেশের নীল অম্বরে মোর মেলেছে পাখা
সারাটি জনম সে মাটির ত্রাণে অস্ত্র ধরি॥'

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথা ও সমর দাসের সুরে–

'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান
বাংলার মুসলমান
আমরা সবাই বাঙালি
তিতুমীর, ঈশা খাঁ, সিরাজ সন্তান এই বাংলাদেশে
ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন,নেতাজী সন্তান এই বাংলাদেশে
এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল
কার সে কণ্ঠস্বর, মুজিবর সে যে মুজিবর

Dhaka University Institutional Repository

জয় বাংলা বলেরে ভাই॥'

আপেল মাহমুদের কথা সুর ও কণ্ঠে–

'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে ।

জীবন কাটে যুদ্ধ করে, প্রাণের মায়া সাঙ্গ করে
জীবনের সাধ নাহি পাই
ঘর-বাড়ি ঠিকানা নাই, দিনরাত্রি জানা নাই
চলার সীমানা সঠিক নাই ।
জানি শুধু চলতে হবে, এ তরী বাইতে হবে
আমি যে সাগর মাঝি রে॥'

মোকসেদ আলী সাঁই রচিত ও সুরারোপিত–

'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শশ্মান করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত জবাব দিতেই হবে॥

শ্যামল বরণী সোনালী ফসলে ছিল যে সেদিন ভরা
নদী নির্ঝর সদা বয়ে যেত পূত অমৃতধারা ।
অগ্নি দহনে সে সুখ-স্বপ্ন দগ্ধ করেছে কে?
পৃথিবী তোমায় আসামীর মত জবাব দিতেই হবে॥'

সারওয়ার জাহানের কথা সুরে–

'সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ
বাংলার ঘরে জ্বলছে
বন্ধু গো এসো হয়েছে সময়
পথ যে তোমায় ডাকছে॥

বন্ধু গো আজ চেওনা পিছু
আজ কে শঙ্কা করো না মিছে
বাংলার মাটি বাংলার তৃণ
তোমাদেরই কথা বলছে॥'

টিএইচ শিকদারের কথা ও আবদুল জব্বারের সুরে–

'অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেবো যে আরো এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে জেগেছে কাঁপণ
আয়রে বাঙালি ডাকিছে রণ ।
নেওয়াজিশ হোসেনের কথায়

Dhaka University Institutional Repository

আমি এক বাংলার মুক্তির সেনা
মৃত্যুর পথ চলিতে কভু ভয় করি না
মৃত্যুকে পায়ে দলে চলি হাসিতে॥'

যখন যুদ্ধে হানাদার বাহিনী পিছু হটছে। মুক্তিসেনাদের বিজয় চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। সেই পরিস্থিতি নিয়ে লেখা একটি অতি জনপ্রিয় শ্লেষাত্মক গান ভাওয়াইয়া ঢং-এ হরলাল রায়ের কথা ও রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুরে–

'ও বগিলারে
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশায়
শিয়াল কান্দে কুত্তায় কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া
দুপুর রাইতে ডুপুর কান্দে ভূট্টো বড়ো মিয়া কান্দে।
ও বগিলারে...॥'

ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর কথা ও সুরে–

'কে কে যাবি আয়রে, চল যাইরে
আয় বাঙালি মুক্তিসেনা বাংলার মান বাঁচাইরে
(হেই) ডাইনে বাম ডাইনে বাম ডাইনে বাম॥
বাংলারই খাই বাংলারই গাই আমরা যে বাঙালী
অন্য দেশের ধার ধারি না নই আমরা কাঙালি
যতই দেশের খানের গুষ্টি করে গণ্ডোগোলের সৃষ্টি
আমরা জানি এই দেশেতে তাদের অধিকার নাইরে॥'

মার্চ থেকে এপ্রিল ১৯৭১ যুদ্ধ চলে সগৌরবে। তার পর মুক্তিসেনাদের সামান্য রসদ তাও ফুরিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধে তখন গেরিলা পরিকল্পনা শুরু হয়। মে-জুন থেকে অক্টোবর অবধি গেরিলা যুদ্ধে হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গেরিলা থাকা অবস্থায় মুক্তিসেনারা বিভিন্ন ক্যাম্পে এই গানটি সমবেত গাইত। কথা ও সুর অজ্ঞাত–

'গেরিলা আমরা আমরা গেরিলা
স্বাধীনতার রক্তে রাঙা আমরা গেরিলা।
আমরা নতুন প্রাণ, গাই স্বাধীনতার গান
আমরা নবীন প্রাণ, গাই শিকল ভাঙার গান
বাংলাদেশের আলো-ছায়ায় আমরা বলিয়ান॥

আমরা ছুটে চলি জীবনের প্রান্তে
আঁধারের বোটা থেকে আলো ছিঁড়ে আনতে
হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো
রুধিতে পারে কি কেউ
আমাদের মেরে ঠেকানো যাবে কি
গণ-জোয়ারের ঢেউ॥'

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তির জন্য বীরত্বের মিছিল নিয়ে রচিত একটি গান কবি দিলওয়ারের লেখা ও অজিত রায়ের সুরে–

'চলছে মিছিল চলবে মিছিল
চলবেই চলবেই চলবেই
লক্ষ পথে রবির মতো
জ্বলবেই জ্বলবেই জ্বলবেই॥

তার রক্ত পলাশ বক্ষ খুনে
সূর্যমুখী স্বপ্ন বুনে
ঐ স্বপনের স্বর্ণ ফসল
সাত মহলায় ফলবে।
বীর জনতার চলবে মিছিল
চলবেই চলবেই চলবেই।'

মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ কিংবা নিরাপত্তার জন্য কোনো ঘাঁটি ছিল না। শত্রুর জন্য যে ঘাঁটি মুক্তিসেনাদের জন্যও সেই ঘাঁটিই। প্রয়োজন ছিল শুধু দখলের। কবি সেই উপলব্ধি থেকেই লিখেছেন বাংলার প্রতিটি ঘরই যেন দুর্জয় ঘাঁটি। মুস্তাফিজুর রহমানের লেখা এবং আবদুল আজিজ বাচ্চুর সুরে–

'জনপথ প্রান্তরে
সাগরের বন্দরে
শুনি হুংকার
চাই স্বাধিকার স্বাধিকার স্বাধিকার॥ ...

আজ ঘরে ঘরে আলোড়ন
জাগ্রত জনতার
সারাদেশে যেন আজ দূর্গ
দুর্জেয় ঘাঁটি কর বাংলার ঘরে ঘরে
বাংলা যে স্বর্ণালী স্বর্গ
নয় কোটি জনতার
দীপ্ত পদক্ষেপ
স্বাধীনতা দেবে উপহার॥'

শহিদুল ইসলামের লেখা ও সরদার আলাউদ্দিনের সুরে–

'জগতবাসী একবার আসিয়া
বাংলাদেশকে যাও দেখিয়ারে।
সোনার বাংলা করলো শশ্মানরে
ওরে পকিস্তানের বর্বর ইয়াহিয়া
মেশিনগান আর বুলেট বেয়নেট দিয়া॥ ...

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের রক্ত বোনের রক্ত ভাইয়ের রক্ততে
ওরে মুক্ত করতে মুজিবরের, বঙ্গভূমিকে
বাঙালি তুই দাঁড়া অস্ত্র নিয়া॥'

সৈয়দ শামসুল হুদার কথা ও আজাদ রহমানের সুরে–

'রক্তেই যদি ফোটে
জীবনের ফুল
ফুটুক না ফুটুক না ফুটুক না ।
আঘাতেই যদি বাজে
প্রভাতের সুর
বাজুক না বাজুক না বাজুক না॥'

সানাউল মাহমুদের কথা ও অরুণ সেনের সুরে–

'রক্তের অক্ষরে সাক্ষর দিলাম
শপথ নিলাম
অগ্নি শপথ
মুক্তি শপথ
আর শান্তি শপথ
আজ শপথ নিলাম॥'

আখতার হোসেনের কথা এবং অজিত রায়ের সুরে–

'স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে
আজ জাগবে বাঙালিরা
আজ রুখবে তাদের কারা॥

আকাশ বাতাস পথে প্রান্তরে
জয়ধ্বনি শোনা যায়
শৃঙ্খল বেড়ী কে আর পরাবে
মোদের কঠিন পায়
জীর্ণ খরার ভীত ধুয়ে মোরা
দেবোই দেবোই নাড়া॥

শাহ আবদুল করিমের লেখা ও সুরে–

'বলো স্বাধীন বাংলা–মোদের
মাতৃভূমির জয়
প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা কর
ছেড়ে দাও মরণের ভয়॥...

ভেবেছিল শত্রুদলে

Dhaka University Institutional Repository

জুলুম অত্যাচারের বলে
রাখিবে পায়ের তলে
মণিব রবে সবসময় ।
বীর বাঙালি বীর বিক্রমে
জেগে উঠলো ধরাধামে
ইয়াহিয়া নরাধমে
পাইবে ঠিক পরিচয়॥'

যুদ্ধ ও তার পরবর্তী এই সময়গুলোতে নাগরিক জীবনের শিল্পীরা তাদের শিল্পসাহিত্যের প্রধান প্রাসঙ্গিকতা ছিল যেমন দেশ-স্বাধীনতা কেন্দ্রিক বিষয়, গ্রাম-বাংলার প্রসিদ্ধ চারণ কবিরাও একইভাবে বাংলার সাধারণ মানুষকে এক করে তুলেছে তাদের রচনাকর্মে । জারি সম্রাট মোসলেম উদ্দিনের একটি গানে পাওয়া যায় সেই আহ্বান, দেশ রক্ষার কাজে লেগে যাওয়ার প্রত্যয়, যার যে বিষয়ে দখল আছে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন । গানটি হলো–

'জাগ চাষী ভাই জাগ শ্রমিক ভাই
সংঘবদ্ধ হইয়া চল বাংলাকে জাগাই॥

সোনার বাংলা নামটি বটে হইয়াছে শ্মশান
সব কিছু করেছে হরণ পশ্চিমা শয়তান॥

যা হওয়ার তা হইয়াছে সে যে তাতে নাইরে দুঃখ
আঁধারের পর আলোক হাসে, দুঃখের পরে সুখ॥

হিংসা বিদ্বেষ ছেড়ে সবে স্বভাবকে গড়াও
স্বভাব গড়ে সোনার বাংলায় অভাবকে তাড়াও॥

নেতার আদেশ পালন করে সবাই চলিও
নিজের ভাগ্য নিজের হতে মনে রাখিও॥

শেখ লুতফর রহমান গণসংগীতের এক অনন্য নাম । তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অসংখ্য পূর্ব প্রচারিত গান গেয়ে টাকা তুলে এবং গান পাঠিয়ে দেশের ভূমিকা রেখেছেন । তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী "এই সময় আমি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক আমার বেশ কিছু শুভাকাঙ্খী পরিচিতজনদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে মুক্তিবাহিনীর জন্য পাঠাতাম । আমার হয়ে এই কাজটি করতো আমার ছোট ভাই শেখ মহিতুল হক । মুখে তখন তার চাপ দাঁড়ি, পরনে ঢোলা সুন্নতি পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি । কে তাকে ধরে আমার হয়ে যে তলে তলে সে এই রকম ভয়াবহ কাজ করে যাচ্ছে!"[১১] তিনি যে অনেক গান দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি নতুন গানের সন্ধান পাওয়া যায় তা হলো 'এগিয়ে চল এগিয়ে চল, হাতে তোদের সূর্য পতাকা এগিয়ে চল' ।

গম্ভীরা গণমুখী চেতনার উজ্জ্বল প্রতিনিধিত্বকারী লোক আঙ্গিক । মুক্তিযুদ্ধের সময়েরও অনেক গানের তথ্য পাওয়া যায়[১২] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান –

'রক্ত দিয়্যা গড়া মোদের সোনার বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

এদেশ তোমার আমার সম অধিকার
শেখ মুজিবের হয় আদেশ ।
বুকের ব্যথা আর মুখের কথায় প্রকাশ করে যাই
নর পিশাচ ইয়াহিয়ার জুলুম ভুলতে পারি নাই ।
নয় মাস ধরে সোনার বংলায় জুলুম যে করিল
রাস্তাঘাট নষ্ট করলো–কত বাড়ি পোড়াইল ।
ধরলো কত নারীরে ভাই মানুষ মারলো কত
রক্ত নদী সোনার বাংলায় বহিল অবিরত ।...
এই ভাবেতে ত্রিশ লক্ষ লোক গেছে যে ভাই মারা
এক কোটি হিন্দু মুসলমান হয় বাস্তুহারা ।
বাস্তুহারা হয়েরে ভাই ভারত চলে যায়
সেইখানেতে গিয়্যা তারা মুক্তি ট্রেনিং লয় ।
মুক্তিফৌজে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করিল
ষোলই ডিসেম্বরে বাংলা শত্রুমুক্ত হইল ।'

বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পিছনে বিদেশীদের ভূমিকাও কম ছিল না। পার্শ্বরাষ্ট্র ভারত ছিল সর্বাগ্রগামী। সমগ্র পূর্ববঙ্গ যুদ্ধবিধ্বস্ত, তখন পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা মানসিকভাবেই সাহায্য করেনি, এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা করে বাংলার মুক্তিযুদ্ধকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়েছিল। একদিকে শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষক-ছাত্ররা প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষ শরণার্থীদের সাহায্যে নিবেদিত ছিল, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রচার-প্রচারণার প্রায় সবকিছুই ভারতের কলকাতা থেকে সম্পন্ন হতো। উদাহরণ স্বরূপ–

"৩ এপ্রিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি সাহায্য সংস্থা..., 'এছাড়া বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি (পুনা), বাংলাদেশ এইড কমিটি (বোম্বে), ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ, .. বোম্বে ইউনিভার্সিটি কমিটি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি (লেক গার্ডেন কলকাতা) বাংলাদেশ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি' বিভিন্নভাবে কাজ করেছে। এছাড়া ফ্রেন্ডস অব দ্য বাংলাদেশ মুভমেন্ট (শিকাগো), ফ্রেন্ডস অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি (লন্ডন), বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কাউন্সিল (লন্ডন), আউট টু দ্য পিপল (শ্রীলংকা), বাংলাদেশ গ্রীন ক্রস (লন্ডন) এমন অসংখ্য সাহায্য সংস্থা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহায়ক সমিতির কর্মকাণ্ড মূলত সাত ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা– ১. সমর্থন প্রচার ও সাহায্যের আবেদন; ২. শিক্ষা ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থান; ৩. মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন ও সাহায্য প্রদান; ৪. ত্রাণকার্য; ৫. চিত্র প্রদর্শনী; ৬. তথ্যসংগ্রহ ও ৭. প্রকাশনা।"[১৩] এরমধ্যে প্রচার সাহায্য চাওয়াসহ নানা কার্যক্রমের মুল বিষয় ছিল সংগীত। পশ্চিমবঙ্গের গণশিল্পী দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সুরে তেমনি একটি গান–

আমার বাংলাদেশ–সোনার বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিদেশ বাংলাদেশ ক্ষুদিরামের বাংলাদেশ
রোশেনারার বাংলাদেশ
বাংলাদেশ কথা দিলাম–
শুধবো ঋণ লক্ষপ্রাণ
রক্ত বারুদ কথা দিলাম
বীর জননী বাংলাদেশ
অহল্যা মা বাংলাদেশ॥'

ভারতের বিখ্যাত সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশংকর ১লা আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাসিডিন স্কোয়ার গার্ডেনে বিটলসের পরিবেশনায় 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর আয়োজন করেন। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বায়েজ, বব ডিলান প্রমুখ গান গেয়ে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য ও সমর্থন আদায় করেন। "৪০ হাজার শ্রোতা-দর্শক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিল। 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামক এই অনুষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তরা ২,৪৩,৪১৮,৫০ ডলার সংগ্রহ করে তা ইউনিসেফের বাংলাদেশের শিশু সাহায্য তহবিলে প্রদান করেছিলেন। ৪০ টি মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠানের গান ও কথা রেকর্ড করে তিনটি লং প্লে নিয়ে একটি বড় এ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছিল।"[১৪] কনসার্ট ফর বাংলাদেশে জোয়ান বায়েজ যে গানটি পরিবেশন করেন 'বাংলাদেশ' গানটি নিম্নরূপ তুলে ধরা হলো–

Bangladesh
(Words and Music by Joan Baez)

'Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commmands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land.'

জর্জ হ্যারিসন পরিবেশন করেন 'মাই ফ্রেন্ড কাম টু মি'–

'My friend came to me
With sadness in his eyes
Told me that he wanted help
Before his country dies

Although I couldn't feel the pain
I knew I had to try
Now I'm asking all of you
Help us save some lives
Bangla Desh, Bangla Desh.'

Dhaka University Institutional Repository

Bangla Desh, Bangla Desh.'

এভাবে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গান গেয়ে অনেক বিশ্ববিখ্যাত লোকেরা এগিয়ে এসেছিলো ।

শরণার্থী শিবিরের গান

আমেরিকার বিখ্যাত কবি এ্যালেন গিন্সবার্গের লেখা 'September on Jessore Road'-এর মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষ শরণার্থী হিসেবে কলকাতার পানে ছুটে যাওয়ার কালে কী নির্মম-অসহায়ত্বের মুখোমুখি পড়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ ।

'Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road-Long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts
Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go.'

মৌসুমীর ভৌমিকের গাওয়া অনুবাদিত গান, যশোর রোড মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের সজীব দলিলের ন্যায় । এছাড়া বিভিন্ন ভাবে শরণার্থী শিবিরে গান হয়েছে । গায়ক-বাউল-কবি-লেখকেরা এখানেও থেমে থাকেনি । বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ দেবেন ভট্টাচার্যের সংগৃহীত গান যা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি অডিও প্রকাশের মধ্যদিয়ে এই অসামান্য দলিল সংরক্ষিত হয়েছে । সেই গানগুলোর তালিকা নিম্নরূপ উপস্থাপিত হলো–

ক্রমিক	শিল্পী	গানের তালিকা
১.	শাহ আলী সরকার	১. ও বাঙালিরে, ২. কানিক্ষেত গারিনু, ৩. আসমান ভাইঙ্গা, ৪. মন মোর কান্দে রে, ৫. বিতিরি ধান কাটার বেলা
২.	তোরাপ আলী সাই	১. কে কথা কয়রে, ২. হাওয়ার গাছে ফল ধরেছে, ৩. মন পবনের নায়ে, ৪. একবার ফিরে চাও, ৫. মন চিরদিন কি যাবে, ৬. কোন সাধনে পাব আমি, ৭. নাপাকের পাক হয় কেমনে, ৮. ওলো কইন্যা ওকি, ৯. ও পাগল মন আমার, ১০. ও বন্ধু তোমার লাগিয়া, ১১. ও এলো পাগল করিয়া, ১২. মা গো চুল বান্ধি দাও, ১৩. হায় শেখ মুজিব
৩.	মোহাম্মদ শফি (বাঙ্গালী)	১. মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না, ২. জয়ধ্বনি কর, ৩. নিজের পায়ে নিজে হেঁটে চল, ৪. সূর্য উঠে রে লাল মারি, ৫. কইয়ো না কইয়ো না, ৬. মুজিব বাইয়া যাওরে
৪.	আবদুল গণি বোখারী	১. আমার সুখ নাইরে, ২. সাধুরে তুমি কি সময়, ৩. আমার ভাবতে, ৪. রূপার বৈঠা
৫.	মলয় ঘোষ দস্তিদার	১. আঁরা চাটিগাইয়া নওজোয়ান, ২. ছোড ছোড ঢেউ তুলি, ৩. নন্দিত

Dhaka University Institutional Repository

		নন্দিত দেশ
৬.	মঙ্গল বড়ুয়া	১. মাটির মানুষ, ২. রইস্যার বাপ, ৩. মালকা বানু
৭.	জয়ন্তী ভুঁইয়া	আমার নিঠুর বন্ধু রে
৮.	হরিপদ বিশ্বাস	১. আপন মনের বাঘে খায়, ২. সামাল সামাল তরী, ৩. মন মাঝিরে
৯.	বলরাম চন্দ্র নায়ক	১. জয় জয় ঘণ্টা, ২. মন তুমি দর্শনাতে গেলে
১০.	বীণা রায় চৌধুরী	পাখীর যুদ্ধ
১১.	গোবিন্দ বাগচী	তোমার বাংলা আমার বাংলা
১২.	চিত্ত ভুঁইয়া	জন্মভূমি জননী
১৩.	প্রেমচাদ রাই ও ভবেশ দাস	ধরো ধরো নিতাই পদ
১৪.	বলরাম ভদ্র	১. বাবু কি চমৎকার ঘড়িখানা, ২. মানুষ জনম

মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে একদিকে যেমন মানুষ স্বাধীনতা লাভে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো অন্যদিকে দেশমাতৃকার ধ্বংস, সম্পদ-প্রত্নসম্পদ-প্রকৃতি ও পরিবেশকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল হানাদার বাহিনীরা। হাতির দলের মতো ফসলের ক্ষেত-খামার, বুনো শুকরের মতো ছন্দময় বাগানকে তছনচ করে দিয়েছিল। তাই সকলেরই দেশমাতার প্রতি অসীম আকুতি ফুটে ওঠে। ফলে দেখা যায় পূর্বকালের গানে দেশের সৌন্দর্য আর উপমায় ঘেরা সোনার দেশের প্রতি গীত-বন্দনা, কিন্তু এই সময়ের গানে পূর্ণমমতাঘেরা দেশের ধ্বংসময়তায় ব্যাকুল কান্নার সুর। দেশের মানুষকে গভীর স্পৃহা জাগিয়ে তোলার অন্যতম কারণ এটাই। অবশ্য পূর্বকালে লেখা অনেকগানও এসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নিম্নরূপ বেশকিছু গান উল্লেখ করা হলো যা এসময়ে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। যেমন–

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কথা ও আবদুল আহাদের (১৯২০-১৯৯৪) সুরে–

'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন
শ্যামল-কোমল পরশ ছাড়া যে নেই কিছু প্রয়োজন॥

প্রাণে প্রাণে যেন তাই তারই সুর শুধু পাই
দিগন্তে জুড়ে সোনারং ছবি খেলে যায় সারাক্ষণ॥'

খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে–

'হায়রে আমার মন মাতানো দেশ
হায়রে আমার সোনা ফলা মাটি
রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না
তোর এতো ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না॥'

আবদুল লতিফের কথা ও সুরে–

Dhaka University Institutional Repository

'সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা তত নয় খাঁটি
বলো যত খাঁটি
তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি আমার
জন্মভূমির মাটি...'

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের সময় ধর্ম-বর্ণ-জাতি এমনকি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে গিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। গণসংগীতের ক্ষেত্রে যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদসহ বিভিন্ন অসম শ্রেণীচক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সচেতন প্রয়াস যা সর্বহারা শ্রেণী অধিকারকে সমুন্নত করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে, তার সচকিত প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছে। সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের সচেতন পাঠ ছাড়াই। কারণ একটি জাতি এতটাই নিষ্পেষিত হয়েছিল যে, মানবতার শ্লোগান প্রত্যেক মানুষের অনিবার্য ভাষা হয়ে উঠেছিল। তেমনি একটি সফল গান লিখেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত ও সাম্যবাদী ভাষায় আলী মোহসীন রেজা, সুর করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ রায়–

'চাষাদের মুটেদের মজুরের
গরীবের নিঃস্বের ফকিরের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার দেশ সব মানুষের॥

সেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে
নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীস্টান
দেশ মাতা একা সকলের॥

লাঙলের সাথে আজ চাকা ঘুরে এক তালে
এক হয়ে মিশে গেছি আমরা যে কোন কালে
মন্দির মসজিদ গীর্জার আবাহনে
বাণী শুনি একই সুরের॥'

মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা ও আলাউদ্দিন আলীর সুরে–

'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ॥

আমার আঙিনায় ছড়ানো বিছানো
সোনা সোনা ধূলিকণা
মাটির মমতায় ঘাস ফসলে
সবুজের আলপনা।

Dhaka University Institutional Repository

আমার তাতে হয়েছে স্বপ্নের বীজ বোনা॥'

অথবা– সুর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি
ও আমার বাংলাদেশ, প্রিয় জন্মভূমি॥

জলসিঁড়ি নদী তীরে খুশীর কাঁকন যেন বাজে
কাশবনে ফুলে ফুলে তোর মধুর বাসর যেন সাজে
তোর একতারা হায় করে বাউল আমায় সুরে সুরে॥

এমন আরো কিছু গানের তালিকা দেয়া যায়, যেমন আবদুল লতিফের কথা ও সুরে–'আমার দেশের মতন এমন দেশটি কোথাও আছে'; ফজল-এ-খোদার কথা ও আবেদ হোসেন খানের সুরে–'যে দেশেতে শাপলা শালুক ঝিলের জলে ভাসে'; নয়ীম গওহরের কথা ও আজাদ রহমানের সুরে–'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো/ এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো' ইত্যাদি ।

এই গানগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাংলার মাটিতে জন্মে গর্বিত হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে, চিরচেনা পরিবেশকে আকুলতার বন্দনাই প্রধান উপজীব্য বিষয় । যা আগের দেশাত্মবোধক গানে স্বচ্ছভাবে ছিল না, অথবা তা ছিল বন্দনা করার আহ্বান হিসেবে ।

স্বাধীনতা-উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনা

প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষের হত্যা-ধর্ষণ ও পঙ্গুত্ব বরণের মধ্যদিয়ে যে অর্জিত স্বাধীনতা, নয় মাস অক্লান্ত যুদ্ধাশ্রমের পর মুক্তিসেনারা ফিরে আসে আপন নিবাসে । তারা বিজয়ের আনন্দে পেয়ে ওঠে–'বিজয় নিশান উড়ছে/ ঐ দেশ স্বাধীন হলো' শিল্পী অজিত রায়ের মুখেই প্রথম গীত হয় দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধশেষে ফেরার কালে । ফিরে এসে মুক্তিবীরেগণ দেখে কারো ভাই নেই, মা নেই, বাবা নেই, বোন নেই, ঘর নেই, অথবা কোনো মায়ের বাবার সন্তানও ফিরে আসেনি । এভাবে বিয়োগের ব্যথা ও গৌরব মানুষের গভীর উপলব্ধির কারণ ঘটে । যুদ্ধে অগণিত শহীদ ও বিজয়ী বীরদের স্মরণে রচিত হতে থাকে অসংখ্য নাটক-গান-কবিতা । যা গণমানুষকে বিজয়ের আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অথবা বেদনার শোকে শাণিত করে । প্রতিবছর পালিত হয় স্বাধীনতা, বিজয় দিবসসহ হাজার হাজার বীরসেনাদের জন্ম-মৃত্যু দিবস । জাতীয়, সামাজিক এবং পারিবারিক ভাবে পালিত হয় এইসব স্মরণীয় দিন । নিম্নরূপ সেই গানসমূহের কিছু সংগ্রহ তুলে ধরা হলো । বিশিষ্ট গীতিকার গোবিন্দ হালদারের লেখা ও স্বপ্না রায়ের সুরে গাওয়া একটি গান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও বীরদের স্মরণে অনন্যসাধারণ গান । যেখানে মহত্ব, শ্রদ্ধা, ত্যাগ, আনন্দ-বেদনার সকল রস উঠে এসেছে আন্তরিকতার সাথে–

'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না॥

দুঃসহ বেদনার কন্টক পথ বেয়ে
শোষণের নাগপাশ ছিঁড়লে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না

Dhaka University Institutional Repository

যুগের এ নিষ্ঠুর বন্ধন হতে
মুক্তির এ বারতা আনলে যারা
আমরা তোমাদের ভুলব না
কিষাণ-কিষাণীর গানে গানে
পদ্মা-মেঘনার কলতানে
বাউলের একতারাতে আনন্দ ঝংকারে
তোমাদের নাম ঝংকৃত রবে॥

নতুন স্বদেশ গড়ার পথে
তোমরা চিরদিন দিশারী রবে
আমরা তোমাদের ভুলব না॥'

এমনি আরেকটি গান খান আতাউর রহমানের (১৯২৮-১৯৯৮) লেখা ও সুর করা। গানটিতে ইতিহাসের ভবিষ্যত বাস্তবতা ও মূল্যায়ন, বিজয়ের প্রকৃত স্বাদ ও উপলব্ধির মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। জনপ্রিয় এই গানটি হলো–

'এক নদী রক্ত পেরিয়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা
তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন ভুল হবে না।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
সাতকোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা
তোমাদের মহিমা কোনোদিন ম্লান হবে না।
হয়তোবা ইতিহাসে তোমাদের নাম লেখা রবে না
বড় বড় লোকেদের ভীড়ে
জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না
তবু এই বিজয়ী বীর মুক্তিসেনা
তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না।'

নজরুল ইসলাম বাবুর (১৯৪৯-১৯৯১) লেখা ও আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরারোপিত একটি গানে শহীদ স্মৃতিকে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

'সবকটা জানালা খুলে দাও না
আমি গাইব বিজয়েরই গান
ওরা আসবে চুপি চুপি
যারা এই দেশটাকে ভালবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ॥'

আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা বিজয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে–

Dhaka University Institutional Repository

'ওরা ফিরে আসে মুক্ত স্বদেশে
দীপ্ত বিজয়ী বেশে
রৌদ্র-মদির মুক্ত স্বাধীন দেশে ।
কতো দুঃখের কালো রাত পাড়ি দিয়ে
ফিরে এলো ওরা নতুন সূর্য নিয়ে
মায়ের ভাইয়ের বোনের অশ্রু
মুছে গেল অবশেষে॥'

নাসিমা খানের কথা ও সেলিম আশরাফের সুরে–

'যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তিসেনা
দে না তোরা দে না সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না ।
রোজ যেখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে
জীবন আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশ পেয়ে
সে মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে বলিস না॥'

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-এর লেখা ও সমর দাসের সুরে আরেকটি গান–

'তারা এদেশের সবুজ ধানের শীষে
চিরদিন আছে মিশে॥

উদাসী মাঝির গানে
বাউলের ভীরু প্রাণে
দোয়েল শ্যামার শীষে॥

গুরু গুরু মেঘে তাদের কণ্ঠ শুনি
রক্তে তখন উঠে কত ফাল্গুনি॥'

১৯৭২ সালে সমাপ্ত একটি দীর্ঘ গান বাংলা গণসংগীতকে করে অতি গৌরবাকীর্ণ । গানটিতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে পরাজয়ের থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে দুর্বিসহ যাত্রা ছিল বাঙালি জাতির পরাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলন, তাকে সামগ্রিক ভাবে ধারণ করে আছে । ৬০ লাইনের দীর্ঘ গানটি ইতিহাসকে খুব সহজেই উপস্থাপিত করে । বাংলাদেশ যে কারো করুণার প্রাপ্তি নয়, বিপুল শ্রম-রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রাপ্ত সেই কথাই অত্যন্ত আভিজাত্যের ভঙ্গিতে গীত হয়েছে সারা বাংলা জুড়ে । সংগীত শিল্পী আবদুল লতিফের লেখা এই গানটি হলো–

'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়ার নয়
দাম দিচ্ছি প্রাণ লক্ষ কোটি
জানা আছে জগৎময়॥...

উনিশ শো একাত্তর সালে
ষোলই ডিসেম্বর সকালে

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে দুঃখিনী এই
বাংলা মা যে আমার হয়॥'

একই লেখকের আরো কয়েকটি গান যেমন– 'জয় জয় বাংলার জয়/ দিগন্তে হলো নব সূর্য-উদয়।' অথবা–'অনেক রক্ত দিয়ে কিনেছি তোমার স্বাধীনতা' অথবা–'তিরিশ লক্ষ বুকের রক্তে রাঙানো এই বাংলাদেশ/ দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জত খোয়ানো এই বাংলাদেশ'। আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা একটি গান–'যায় যদি ডাক প্রাণ'; মোহিনী চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', 'এই সূর্যোদয়ের ভোরে এসো আজ'; ভূপেন হাজারিকার 'জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ, জয় জয় মুক্তিবাহিনী'।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের আন্দোলন ও গান

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মবিসর্জনের মধ্যদিয়ে শত শত বছরের ঔপনিবেশিক দাসত্ব, জুলুমবাজ লুটেরাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি অর্জিত হয়। গণ-মানুষের অধিকার, ইচ্ছার সমন্বয়ে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নতুন রাষ্ট্রের হাল ধরেন মুক্তিপাগল মানুষেরই প্রতিনিধি। কিন্তু একটি নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রকৃত ধারণা কী, জাতীয়তাবাদ কিংবা সাম্যবাদ–স্বাধীনতার সুশৃঙ্খল অবকাঠামো নিয়ে তড়িৎ গতিতে সিদ্ধান্ত নেয়া কতটা স্বার্থকভাবে সম্ভব? নানাবিধ বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই তার মোকাবেলা করা হচ্ছিল। কিছু কিছু গুরুতর ভুল সিদ্ধান্ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, স্বরাষ্ট্রীয় ধারণার অভাব, অযোগ্য নেতৃত্ব, সুবিধাবাদীদের দৌরাত্ম্য একের পর এক সদ্য বাংলাদেশকে গহীন অন্ধকারের দিকে নিপতিত করতে থাকে। সংঘাত, শোষণ, দুর্নীতি, অপঘাত, সংকট, সামরিক অভ্যুত্থানসহ নানাবিধ কালো অধ্যায়ের দিন ঘণিভূত হয়। ১৯৭৪এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৭৫-এর মুজিব হত্যা, ১৯৮২-এর জিয়া হত্যা, ১৯৯০-এর সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশকে একটি তিক্ত-বিরক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্ম দেয়।

গণসংগীত সৃষ্টির জন্য কোনো না কোন আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক প্রেরণার প্রয়োজন হয়। সুখ-দুঃখের পাঁচালী গণসংগীতের বৈশিষ্ট্য নয়। মেহনতী মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দানে সহযোগিতা ও উদ্বুদ্ধ করাই গণসংগীতের কাজ। আন্দোলন বিদ্রোহের মুখোমুখি হলেই গণসংগীত অগ্নিশিখার মতো জ্বলে ওঠে। স্বাধীন রাষ্ট্রের এই বিপর্যস্ত অবস্থানে গ্রামবাংলার মানুষ অধিকারের ভাষাকে সংগীতে রূপদান করে। অবশ্য জন্মলগ্ন থেকে তার গতিপথ যে সব মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারকে জাগ্রত করতে সৃষ্টি হয়েছে, তার বৃহৎ কলেবর এসময় খুব বেশি পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশিক শাসনামলে মৌলিক অধিকারের আন্দোলনে ছোট ছোট অধিকারগুলো চাপা পড়ে যায়, যেন মুখ ফুটে কিছু বলে না। অথচ সামাজিক জীবনে ধীরে ধীরে তা প্রকট সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ভিন্ন। জনগণের ইচ্ছার যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার আদায়েরও তেমন স্বাধীনতা থাকে। যা রক্ত ক্ষরিত বিপর্যস্ত লুণ্ঠিত নতুন একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সংকট নিরসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। সুবিধাভোগী, যুদ্ধাপরাধীদের তখন নৈরাজ্যকর হাত প্রশস্ত হয়। নির্বাচন, নিত্য-দ্রব্য, শিক্ষা, নারী-অধিকার, রাজনীতি, প্রকৃতি এক দুর্গতিপূর্ণ ঝড়ের ভিতর তলিয়ে যেতে থাকে। গণসংগীতের সাংগঠনিক তৎপরতায় তার প্রতিবাদ খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নরূপ সেই সংকটময় পরিস্থিতিকে প্রধান তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হলো–

ক. রাজনৈতিক সংকট

১. ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, ২. ১৯৭৫-এ-শেখ মুজিব হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, ৩. ভোট ও কারচুপির দৃষ্টান্ত, ৪. শ্রমিক অধিকার, মে দিবস ও অন্যান্য, ৫. স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থান।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সামাজিক সংকট

১. জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, ২. শিক্ষা অধিকার, ৩. বাল্য বিবাহ, ৪. যৌতুক প্রথা, ৫. নারী নির্যাতন, ৬. ডাক্তার প্রতারণা, ৭. ধনি-দরিদ্র বৈষম্য, ৮. ছাত্র ও নারী নির্যাতন, ৯. বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, ১০. গার্মেন্টস, চিনিকল, পাটকল প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলন।

গ. প্রাকৃতিক সংকট

১. বন্যা-দুর্গতি অপমৃত্যু, ২. মঙ্গা, ৩. তেল-গ্যাস, ৪. মশা নিধন।

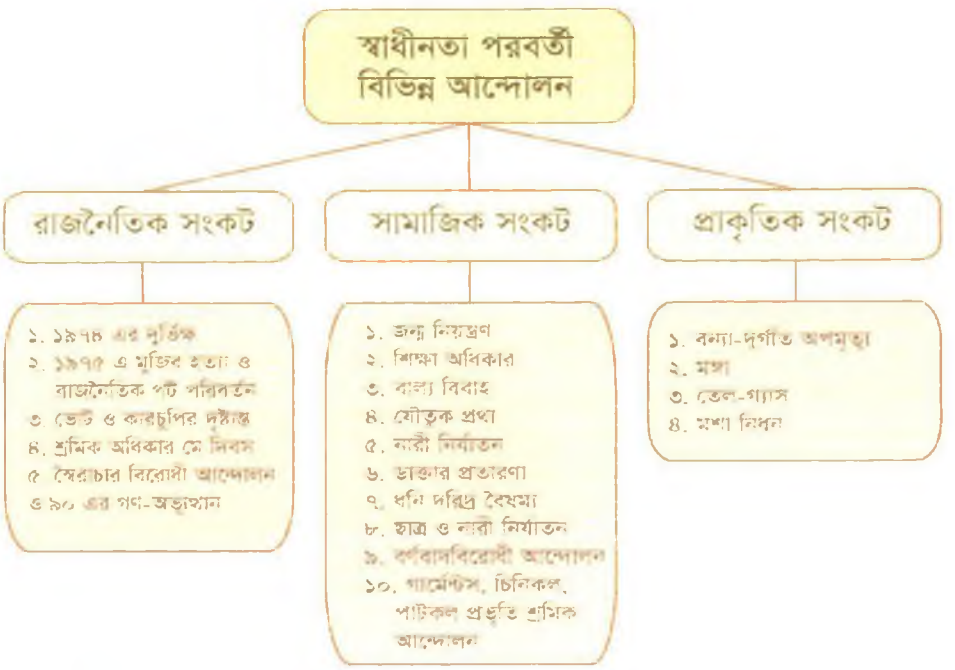

রাজনৈতিক সংকট

অনেক ত্যাগের পর স্বাধীনতা এলো এবার স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন। নিজগৃহের শত্রু এতোদিন চেনা হয়নি কারণ দেশটাই নিজের ছিল না। যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন ধীরে ধীরে ঘনিভূত হ'তে থাকলো প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ। তাদের হিংস্রতায় দেশ রাজনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। গানের ভাষায় আসে নতুন বোধ।

বিপর্যস্ত স্বাধীনতা লুণ্ঠিত নবরাষ্ট্র

সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ একটি মহত্তম জাতিসত্তায় গর্বিত হয়ে উঠার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বশস্ত্র সংগ্রামে বিজয়ের মধ্যদিয়ে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে গৃহীত জাতীয় আদর্শসমূহ সেই দীর্ঘকালের সাধনারই প্রতিফলন। এতদিন যে কথা কবির ভাষায় ছিল 'কায়মনে বাঙালি হ'-এর আদেশ। এই সময় তা রূপান্তরণের কাল, কিন্তু বাস্তব অবস্থা দাঁড়ালো তার উল্টো। মুক্তিযুদ্ধে যাদের অবস্থান ছিল অনেকটা সুবিধাবাদীদের দলে, তাদের উপর অর্পিত হলো আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়ভার। ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত ভাবে যাদের অধিকাংশ কাজের যোগ্যতা ছিল না। তারা অদূরদর্শিতা ও

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় বিবেচনায় ব্যাখ্যা করে এমন ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে থাকে-যা একটি পতনশীল অন্ধকারের দিকে নিপতিত হ'তে থাকে। উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সংখ্যালঘু আদিবাসীদের প্রতি অবিচার করে বসে। সৃষ্টি হয় জাতিবৈরিতা।

'ধর্মকে ব্যক্তিগত সাধনার স্তরে না রেখে সবগুলোকে সমানভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি অনুসৃত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক হানাহানির পথ প্রশস্ত হয়; ব্যক্তিগত সম্পদের সীমা নির্ধারণ না-করে সমাজতন্ত্র করতে যাওয়ায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুটপাট করার হিড়িক পড়ে গেল; সবশেষে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করায় বাংলাদেশের মানুষ আঘাতের তীব্রতায় অসাড় হয়ে যায়। আদর্শগত বিপর্যয় তিন বছরের মধ্যে উৎকট আকার ধারণ করে। খুন, লুটপাট, রাজনৈতিক নির্যাতন, দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতির প্রসার, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, সেই স্মৃতি এখনো অনেককে তাড়া করে। 'রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা।'-সেকালের বিক্ষুব্ধ ছড়াকারের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ। পুলিশ-সূত্রে জানা যায় প্রথম তিন বছরে ১১ হাজার হত্যাকাণ্ড, ১৮ হাজার ডাকাতি, ১১ হাজার ৬শ' লুট ও ২৬ হাজার দাঙ্গা হয়েছিল।"[১৫]

এমন অবস্থা দৃষ্টে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনও অন্ধকারের চোরাবালিতে পড়ে যায়। একটি বিশৃঙ্খল শাসনের মধ্যদিয়ে বামগণতান্ত্রিক আদর্শের মানুষেরা আদর্শের অপবাদে মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্যদিকে ধর্মাশ্রয়ী মৌলবাদীরা তাদের মুসলিম জাতিসত্তার শ্লোগান নিয়ে দেশদ্রোহিতা ঢেকে সামনে আসে। তখন গ্রাম-বাংলার কবিয়ালদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ায় পাওয়া যায় প্রকৃত পর্যবেক্ষণের উদাহরণ। শাহ আবদুল করিমের গানে প্রসঙ্গ হয়ে আসে–

'রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলেম
দুর্দশা কেন যায় না?
শোষিতগণ বেঁচে থাকুক
শোষক তাহা চায় না ॥'

অথবা– 'স্বাধীন দেশে থাকি আমরা স্বাধীন দেশে থাকি
খাবার বেলা ভাত মিলে না আল্লা বলে ডাকি ॥'

একই লেখকের আরেকটি গান ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা নিয়ে রচিত–

'দারুণ দুর্ভিক্ষের আগুন, লাগল কলিজায় রে।
প্রাণে বাঁচা দায়, প্রাণে বাঁচা দায় রে ॥

এদেশের গরীব কাঙ্গাল চেষ্টা করে বাঁচতে চায়
ভাল চাইলে মন্দ ফলে, কোন শয়তানে পথ ভোলায় ॥'

দেশে স্বাধীনতা এলেও স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাগণ মনের আকাশে যে শুভ্র সূর্যের হাসি দেখতে চেয়েছিলেন তা তো এলো না। কিছু সুবিধাবাদী লোক মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সরকারি সুবিধা নিয়ে ক্ষমতা ও সম্পত্তির পাহাড় গড়ে তুলেছে, অথচ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছে। এমন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে লেখা হয় হাসান মতিউর রহমানের কথা ও সুরে–

Dhaka University Institutional Repository

'যে দেশে কথায় কথায় বিকৃত হয়
মুক্তিযুদ্ধের কথা এ কেমন স্বাধীনতা ॥

কথা ছিল মায়ের মুখে ফোটাবো হাসি
মনের সুখে আমি আবার বাজাবো বাঁশি
আজ আমিও নাই বাঁশিও নাই
আছে শুধু ব্যথা, এ কেমন স্বাধীনতা ॥'

ঠিক এই সময়ে দেশের অবস্থা কি রকম খারাপ ও আতঙ্কজনক ছিল তার একটি উদাহরণ দেয়া যায় শেখ লুতফর রহমানের বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন–"৭৩ সালের ঘটনা এটা। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। উপস্থিত সিকান্দার আবু জাফর, সুফিয়া কামাল, সানজিদা খাতুনসহ আরো অনেকেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স এ্যানেক্সের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সেই অনুষ্ঠানে সেদিন আমি গেয়েছিলাম–

এই স্বাধীনতা ম্লান হয়ে যাবে
যদি সর্বহারা
পেট ভরে খেতে না পায় দু'বেলা
না শুকায় অশ্রুধারা
পরনে কাপড় ঔষধ রোগে
মানবতাবোধ এই দুর্যোগে
জ্ঞানের আলোকে যদি নাহি জাগে
জীবনের ধ্রুবতারা।

এই স্বাধীনতা ম্লান হতে মোরা
দেব না দেব না কিছুতেই
শহীদের লহু বৃথা যাবে নাকো
না, না এসো সূর্য শপথ নেই।
সোনার বাংলা আজকে শ্মশান
আমাদের ত্যাগে হবে গরিয়ান
দুঃখী মানুষেরা অধিকার পাবে
চির বঞ্চিত যারা।

গান গেয়ে রাস্তায় বের হতেই হোণ্ডাঅলা কতগুলো ছেলে, মাথায় লালপট্টি বাঁধা, আমাকে ঘিরে ধরে বলল, এ গান কার কথা মতো গাইলেন? বললাম, না যেমন অন্য সময় গেয়েছি, আজো তেমনি আপন ইচ্ছাতেই গাইলাম। তারা আমাকে বারবার রিক্সা থেকে নামাতে চেষ্টা করছিল। অথচ এ কথাগুলোই নেতারা বারবার উচ্চারণ করছিলেন তখন তাদের বক্তৃতার পর বক্তৃতায়। আর সে কথা বলতেই ছেলেগুলো চলে যাওয়ার সময় বলে গেল দেখে নেব একদিন।"[১৬] স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি যে পরবর্তীকালেও গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল। তার নমুনা উপরের ঘটনায় উঠে এসেছে।

পরবর্তী লেখা মতলুব আলীর একটি গান তিনি সুর দেন। গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়–

Dhaka University Institutional Repository

'লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়
শোষিত মানুষের একতার জয় ।
রাখবো না রাখবো না শোষণের চিহ্ন
রাখবো না রাখবো না কলুষতা দৈন্য
থাকবে না দারিদ্র্য দীনতার ভয়
জয় নিপীড়িত মানবের জয়
জয় নিপীড়িত জনতার জয়॥

মানুষের বাঁচিবার অধিকার কেড়ে নিয়ে
যারা করে জীবনের পথ অবরুদ্ধ
অসহায় শোষিতের সঞ্চিত শক্তিতে
ভাঙে তার শোষণের মহলটা সুদ্ধ ।
মেহনতি জনতার ঐক্যে
আমরা এগিয়ে যাই লক্ষ্যে
ক্ষমতার দম্ভের তাই পরাজয়
জয় মানবতা সাম্যের জয়
জয় জনতার ঐক্যের জয় ।'

শেখ লুতফর রহমান সুকান্তের কবিতার মধ্যে 'দুর্মর' 'অভিবাদন, 'নবান্ন', 'মোরগ, 'দেশলাইয়ের কাঠি'সহ বেশ কিছু কবিতার সুরারোপ করেন ।

বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী কবিয়াল ফণী বড়ুয়া র ভাষায় আরো পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় তৎকালীন রাজনৈতিক আর্থসামজিক পরিস্থিতি–

'বাংলার স্বাধীনতা পেয়ে দুঃখীর দুঃখ না ঘুচিল
সংগঠিত না হইয়ে ।
স্বাধীনতায় আশা করে শান্তি পাবে ভাত কাপড়ে
হাত মিলায়ে পরস্পরে দুর্নীতি ঘুচায়ে ।
হাহাকার দুর্নীতি বেকার জেতেছে বাড়িয়ে
বসন্তে নাই কোকিলের মান, শকুন নাচে দল বাঁধিয়ে ॥

অথবা– 'ও ভাই, স্বাধীন জীবন নিয়ে কেন সংকটে পড়ি
মানুষ পরিবর্তন হয় না কেন স্বাধীনতা লাভ করি ।
কথার ভেজাল, কাজের ভেজাল, ভেজাল কেন সব জায়গায়
নকল কবি ডিগ্রিধারী ভেজাল করে পরীক্ষায় ॥

চাপাই নবাবগঞ্জের গম্ভীরা গানেও একই ধরণের দুর্ভোগের কথা বর্ণিত হয়েছে । স্বাধীনতা পেয়েও বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দেশে বিশৃঙ্খলা চলছে । কোথাও শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, সেই আক্ষেপ রচিত হয়েছে গানে–

Dhaka University Institutional Repository

'স্বাধীন হয়ে এখন হামরা (আমরা) পেলাম কি বল তোমরা
চলা–ফেরার নাইখো সুখ
প্যাটে থাকছে শুধুই ভুক (ক্ষুধা)
এখন হামরা দিশ্যাহারা ।
আর কতকাল চলবে বলো নাঙ্গা ভুখা থাকা ।'

অথবা– 'কৃষক শ্রমিক হামরা এই না বাংলাদেশে
হামরা জাতির মেরুদণ্ড
খাইযে লাঙ্গল চষে
হামরা মরছি অবশেষে
সার বিছন (বীজ) আর পানির লাগ্যা সবঠে খাছি গুতা ।'[১৭]

উপরোক্ত গানে যে ক্ষোভ ও হতাশার বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে তা বাংলাদেশ নামক এক নবরাষ্ট্র পরিচালনায় দুর্বল ও বিপর্যস্ত শাসন ব্যবস্থারই ইঙ্গিত রাখে। শক্ত হাতে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে উদারনৈতিক মনমানসিকতার কারণে এবং আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্রের চাপে বিপর্যয়ের সুযোগে সুবিধাবাদীরা সুচারু পরিকল্পনা করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশ যে কঠিনতম সময় অতিক্রম করেছে, বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার জন্য বিদেশী সাহায্যগোষ্ঠীর দ্বারে গিয়েও সাহায্য মেলেনি। ফলে সাধারণ মানুষের হাহাকারের পাশাপাশি মুনাফালোভীদের গুদামজাত করা ছিল একটি কৃত্রিম ভয়ানক সংকট। এরমধ্যে তরুণ সেনাবাহিনীর একদল বিদ্রোহী কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপরিবারে হত্যার কারণে একশ্রেণীর শাসনের অবসান হয়। পরবর্তীকালে আরেক অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সামরিক শাসন চালু হলে আপাত গণতান্ত্রিক পরিবেশের মতো আস্বস্তির পথ সৃষ্টি হয় বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৭৬ সালের দিকে নতুন পরিবেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ পেলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্কোয়াড তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অবশ্য স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে আরণ্যক নাট্যচক্র, ১৯৭৩ সালে থিয়েটার ও ঢাকা থিয়েটারসহ ৪/৫ বছরে প্রায় চল্লিশটি নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ঢাকা থিয়েটার স্পষ্টত গণশিল্পী আলতাফ মাহমুদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং বেশ কয়েকজন গণশিল্পীদের সমন্বয়ে গণচেতনামূলক নাট্য ও সংগীত ধারার সূচনা করে। নাট্যাঙ্গিকে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সম্মিলনে, সংগীতে গণমুখীনতার সমন্বয়ে নতুন যুগের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে "শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধের লড়াই-এর বিষয়। পদ্মা-মেঘনা ও অশান্ত বঙ্গোপসাগরের কূলে আমাদের বাস। শত শত বছরের ইতিহাস ও ভৌগলিক পরিমণ্ডলে আমরা লড়াই করেছি। বাংলাদেশের মঞ্চে তাই আমরা নিজেদের জীবন, পরিমণ্ডল ও লড়াই-এর চিত্র তুলে ধরতে চাই।"[১৮]

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী'। সামাজিক অঙ্গিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ফকির আলমগীরের সংগঠন নতুন গান, অনুবাদ, সময়োপযোগী গণনাট্য পরিবেশনের মধ্যদিয়ে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। এছাড়া স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী', উদীচী, ছায়ানটসহ পরবর্তীকালে যেমন কামাল লোহানীর সৃষ্ট 'গণশিল্পী সংস্থা' নব উদ্যমে কাজ শুরু করে। ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠিত উদীচী সাংস্কৃতিক অঙ্গন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন তন্মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, আবুল ফজল, শহীদুল্লাহ কায়সার, জহীর

Dhaka University Institutional Repository

রায়হান, আবুজাফর শামসুদ্দিন, সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শেখ লুতফর রহমান, আনিসুজ্জামান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, সানজিদা খাতুন, আলতাফ মাহমুদ, জাহিদুর রহিম, আবদুল লতিফ, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিমা সিংহ, গোলাম মোহাম্মদ ইদু প্রমুখ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদীচীর নেতৃত্বে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য গণশিল্পী ও গণসংগীত। নিম্নরূপ সেইসব গণসংগীত কর্মীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো–

'কামরুল আহসান খান, মোস্তফা ওয়াহিদ, আবদুল খালেক, বদরুল আহসান খান, ইকরাম আহমেদ, ফকির সিরাজ, মঞ্জুর মোর্শেদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম মনজু, মঞ্জুরুল আহসান খান, মোনায়েম সরকার, মনির আহমেদ, রাবিয়া বেগম, তরু আহম্মেদ, ইকবাল আহমদ, শওকত হায়াত খান, আমিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, মিয়া সিরাজুল ইসলাম, আখতার হুসেন, জিনাত জাহান, লায়লা হাসান, হাসান ইমাম, সেন্টু রায়, রনজু সরকার, মাহমুদ সেলিম, খায়রুল আহসান খান, ফারুক ফয়সাল, ফিরোজ সাঁই, রিজিয়া বেগম, শাম্মী পারভেজ শামসুদ্দিন, জিয়া, অরুণ, ইমরুল, হারুন, জগলুল, তাজিম, রোকেয়া, মম, সেলিনা, স্বপন, শামীমা, শাহানা, হেলেনা, আভা মণ্ডল, মরিয়ম, লীনা, তিমির নন্দী, মতলুব আলী, ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া, সুইট, রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা, দীপংকর গৌতম, শিবানী ভট্টাচার্য, শৈলেশ সেন, পারভেজ, ড. হায়াত মামুদ, আসাদ চৌধুরী, মফিদুল হক, মোফাখখারুল জাপান, এ এন রাশেদা, গোলাম মহিউদ্দিন, ফকির আলমগীর প্রমুখ অন্যতম।

গণসংগীতকে বুকে ধরে যে সব সংগঠন বার বার মেহনতী-সর্বহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম চারণ, সৃজনী, বিবর্তন, সময়, বর্তমান, উত্তরণ, অনির্বাণ, সংবর্ত, লেখক শিবির, আলতাফ মাহমুদ বিদ্যানিকেতন, অভ্যুদয়, অরণী, সুরতীর্থ, সকাল, প্রকাশ, আনন্দধ্বনি, মুক্তধারা, সড়ক, গণছায়া, দৃষ্টি, অন্তর বাজাও, ধাবমান, মাতৃধারা, সমগীত ইত্যাদি সংস্থা।

স্বাধীনতা লাভের পর বারবার সামরিক শাসনের প্রবল ছোবলে বাংলার মানুষ সাংস্কৃতিক ভাবে সক্রিয় হতে অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতনের পরই সাংস্কৃতিক সুস্থিরতা আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারের দোসর সুবিধাবাদী ঘাতক দালালদের বিচারের দাবী ওঠে। সেইসব দালালদের চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনে তাদেরকে গণআদালতে বিচার করার কার্যক্রম শুরু হয়। স্বৈরাচারের পতনের জন্য প্রবল বিস্ফোরিত সাধারণ মানুষের বিপুল আগ্রহে গণ-অভ্যুত্থানের মতো ঘটনা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সার্থক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়েছে। শুরু হয় গণতন্ত্রের চর্চা। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জাতীয় কবিতা পরিষদসহ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এসময়ে ডাক্তার মিলন ও নূর হোসেনের মতো অনেক প্রাণ ত্যাগের মধ্যদিয়েই পূনঃপ্রতিষ্ঠা পায় গণতন্ত্র।

১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৮২ সালে নির্বাচিত প্রেসিডেন্সিয়াল সরকারের প্রধান বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনানায়ক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপ্রধান হন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ বছর স্বৈরশাসনের কালে সংবিধান, নির্বাচন, ধর্ম, ছাত্র-রাজনীতি, বিচারবিভাগ, অর্থনীতি, সামাজিক সংহতিকে কলুষিত ও আত্মস্বার্থে চরিতার্থ করার চেষ্টা জাতির জন্য এক গভীর সংকটময় ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী করে। অবশেষে সর্বমহল থেকে ওঠে ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং রাজপথে আত্মবিসর্জনের মতোর দুর্বার বিপ্লব। এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু দেশ ও জাতির সামগ্রিক অধিকার এমন ভাবে খর্ব করে যান, যা গণতন্ত্রের চর্চা, সুষম বণ্টন এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘকাল খেসারত দিতে হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা'[১৯], যা ইউরোপীয় সেক্যুলারিজম বা ইহজাগতিক দার্শনিক অবস্থান থেকে নয়। বহুধর্মীয় জনগণের অধ্যুষিত একটি দেশ রাষ্ট্রকর্তৃক সকল ধর্মাবলম্বীকে সমান দৃষ্টিতে দেখার প্রত্যয় ছিল এখানে। এরশাদ সরকার সেই গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যকে ভেঙে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম[২০] হিসেবে ঘোষণা দেন। এতে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও জাতিসত্তার প্রতি অবজ্ঞার সম্ভাবনা তথা সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কে দেয়। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের থেকে মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিজয় পর্যন্ত যে ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত জাতি বা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ভুল সংশোধিত হয়, ১৯৮৮'র সংশোধনে সেই একই ভুলের পথকে প্রশস্ত করে স্বৈরশাসক এরশাদ। ফলশ্রুতিতে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার কালে এদেশের কিছু মৌলবাদীরা ঢাকেশ্বরী, চট্টগ্রামের কৈবল্যধামসহ বহু মন্দির ধ্বংস করে দেয়ার সাহস পায়। প্রশাসনের বিশেষ শাখার কুমন্ত্রণায় এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই এই নজীরবিহীন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

এরশাদের আমলে জনগণের মৌলিক মতামতের হাতিয়ার 'নির্বাচন'কে অর্থহীন করে তোলা হয়। "শুধু যে শাসকদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে গায়ের জোরে জাল ভোট দেয়াটাকেই এ সময়ের রেওয়াজে পরিণত করা হয়েছিল তাই নয়, ভোটের ফলাফলকে পালটে দেয়াই রীতিমত অভ্যাসে পরিণত করা হয়েছিল। বস্তুত নির্বাচনের আগেই নির্ধারণ করে নেয়া হতো শাসকদল কতগুলি আসন পাবে। আর তা ঠিক করে নিয়ে সেভাবে কারচুপি করা হতো, বদলে দেয়া হতো নির্বাচনের ফলাফল।"[২১] মিডিয়া জগত বলতে সংবাদপত্র-টেলিভিশনকে সরকারের ইচ্ছাধীন করে প্রচার করা হতো। অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে সাজানো হতো যাতে গণমুখী মানুষ চেতনায় বা গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্দীপিত হওয়ার পরিবর্তে চটুল শস্তা, অবক্ষয়ী জীবনবোধে রক্ষণশীল মানসিকতায় প্রভাবিত হয়।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় ছাত্র-রাজনীতিসহ মূলধারার রাজনৈতিক অবকাঠামোকে। প্রথমত অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ও আদর্শবাদী ছাত্রসমাজ, শ্রমিক সমাজকে উৎকোচ দিয়ে দলকে হাতে করা, বিভিন্ন দলের সাথে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি করা এবং সরকারি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী মাস্তান বাহিনী দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সবরকমের আন্দোলনকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করে। ফলে সচেতন ছাত্রসমাজ হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়।

এছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে উদ্দেশ্যমূলক পথে প্রবাহিত করে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সৃষ্টি করে সরকারি গুণ্ডাদের অবাধ অপকর্ম টিকিয়ে রাখার পথ সুগম করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক সুসাম্য, শিল্পখাত, কৃষিখাত, শিল্প-কলকারখানা মুখ থুবড়ে পড়ে। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে চলে যথেচ্ছাচার। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদেরও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠা করলে একটি জাতি অতল অন্ধকারে যেন নিপতিত হ'তে থাকে। জাতির পিছনে ফেরার আর কোনো পথ থাকে না। তখন একসাথে জেগে ওঠে গ্রাম-বাংলার মানুষ, শহর-নগরের জনপদ, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, শিক্ষাবিদ–চিকিৎসক–সমাজসেবক।

Dhaka University Institutional Repository

একের পর এক আন্দোলন-মিছিল মিটিং-এ মুখরিত রাজধানী। যেখানে সামাজিক শক্তির ভূমিকাই বেশি দেখা দেয়। রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক শক্তির কার্যকর ভূমিকা পালন "১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ডাক্তাররা তাঁদের পেশাগত পরিচয় নিয়েই শামিল হয়েছিলেন আন্দোলনে। যে কোনো আন্দোলনে সংবাদপত্র সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে, সংবাদপত্র বন্ধ রেখে এবার সাংবাদিকরা এই আন্দোলনে যে অবদান রেখেছেন তার দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী ভূমিকা এই আন্দোলনের প্রতি মধ্যবিত্তের একটি বিপুল অংশের আস্থা পোষণে সাহায্য করেছে। নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে আন্দোলনে যোগ দেওয়া ছাড়াও আইনজীবীরা পেশাগতভাবেও সংগঠিত হয়েছিলেন। বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, গায়ক ও অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মীদের সংগঠিত ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আন্দোলনে তাৎপর্যময় অবদান রেখেছে। রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নির্যাতনের প্রধান মাধ্যম আমলাতন্ত্র পর্যন্ত গতসরকারের প্রতারণা, জালিয়াতি ও বেআইনী কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে সরকার পতনের আগে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন।"[২২] এই আন্দোলনের অন্যতম শহীদ হয়েছিলেন নূর হোসেন–বুকে যার লেখা ছিল 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক', ডা. মিলনসহ অনেকেই। শহীদ নূর হোসেনের আত্মাহুতি গণ-অভ্যুত্থানকে দুর্বার প্রতিরোধের আগুনে স্বৈরশাসকের গদি তোলপাড় করে দেয়। তবু ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার শেষ প্রচেষ্টায় শিল্পী তুলিতে 'বিশ্ব বেহায়া' স্বীকৃতি পায়। কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) নূর হোসেনের স্মরণে রচনা করেন বিখ্যাত গান। ফকির আলমগীরের সুরে–

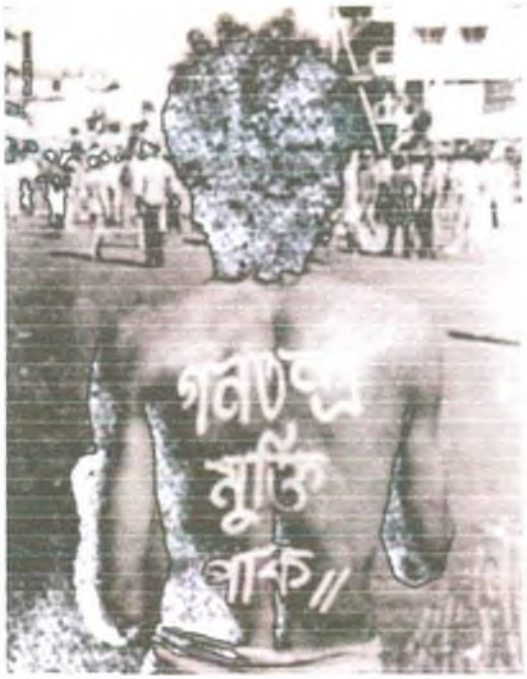

নব্বইএর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন এভাবে পিঠে লিখেছিলেন গণতন্ত্রের মুক্তি পাবার বাসনায় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ছবি ইন্টারনেট

'নূর হোসেনের রক্তে লেখা
আন্দোলনের নাম
আমরা নতুন করে
সেই ভোরে জানলাম
হাজার মৃত্যু দিয়ে গড়া
ঘরখানির ভিত
আজো তবু সব মানুষের
রক্তে কেন শীত
বুলেট এবং বুটের মুখে

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজতে থাকে আপোশের আরাম॥'

প্রখ্যাত গণসংগীতশিল্পী আবদুল লতিফ-এর অংশগ্রহণ দেশের প্রায় সকল আন্দোলনকেই স্পর্শ করে। তিনি স্বৈরাচারের পতন আন্দোলনের অন্যতম রূপকার শহীদ ডা. মিলনের স্মরণে লিখেছেন-

'হত্যা করেই ভেবেছ কি
রুখবে গণতন্ত্র
শহীদি খুন ব্যর্থ করে
সকল ষড়যন্ত্র ।
এক মিলনের রক্ত ধারায়
হাজার মিলন এসে দাঁড়ায়
দেশের তরে তারাই শেখায়
জীবন দেবার মন্ত্র ।'

শিল্পী আরেকটি গানে প্রতিবাদের সাহস দিয়ে লিখেছেন–

'আর পথ ছাড়া নয়
এইবার প্রতিরোধ
আর ক্ষমা করা নয়
এবার প্রতিশোধ ।'

এভাবে এরশাদ বিরোধী শত শত গান প্রতিদিন বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে-মঞ্চে-সভায় তাৎক্ষণিক রচিত হয়েছে আবার তা সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। তেমনি কিছু গান মানুষের মুখে মুখে পতনের ভাষা হিসেবে কাজ করেছিল নিম্নরূপ তা আলোকপাত করা হলো–

নাগরিক জীবনের থেকে প্রতিরোধের সূত্রপাত হয়। আর তাকে প্রাণের রঙে মাতিয়ে তুলতে পারে গ্রামীণ জীবনের কবিরাই। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানেও একইভাবে দেখা গেছে গ্রামের কবিয়াল–জারিয়ালদের প্রতিরোধের আগুন স্ফুর্লিঙ্গের ন্যায় ফুঁসে উঠেছে গানে। ফেনীর লোককবি মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি এরশাদের চরিত্র নির্ণয় করেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে। তাঁর লেখা একটি গান–

'কান্দিলে ন পাওয়া যায়
কান্দিলে ন পাওয়া যায়
আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে কী হবে রে উপায়?

ভাতে মরে দ্যাশের মানুষ
ভর কালে হইলে ব্যাহুঁশ
জাগায় জাগায় লোক দেখায়, লোক জোগায়
কবি এরশাদ গায় কবিতা, জোরে নাচে ববিতা
ছাপাখানায় কোরবান আলী ঢোল বাজায়॥

আতা খানের মাতা (মাথা) সুন্দর
দেখতে লাগে বিমান বন্দর

Dhaka University Institutional Repository

হেলিকপ্টার নামবে কোনো বাধা নাই॥

নাম দিয়াছে ফাস্টো লেডি
চেহারা দেখতে মরা গেডি
কুত্তা হাসে খ্যাল খ্যালায়॥'[২৩]

ময়মনসিংহের রিক্সা শ্রমিক দিলীপ দে এরশাদের ক্ষমতা, সামরিক শাসন, সুবিধাবাদী চক্রের দৌরাত্ম্যসহ সার্বিক পরিস্থিতি একটি গানে তুলে ধরেন। উদীচীর কর্মী হিসাবে বিভিন্ন মঞ্চে গানটি গেয়ে বেড়ানোর সুবাদে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন–

'কুহু কুহু ডাক শুনিয়া কাউয়ার পরাণ ফাইট্টা যায়
কী মধু বুলি, ময়নায় ভুলাইল কাউয়ায়॥

কেরানী ভাই ডাইক্যা বলে শ্রমিক মজুর কোথায় গেলে
বউ পোলা সব কাইন্দা মরে ভাত বেগারে বাঁচন দায়।
ক্ষেত-খোলায় যাও হইছিল ধান বেইচ্যা দেখি হয় না পিরাণ
বাজার হইছে আসমান সমান দিন চলে না মাসের আয়॥

যেদিন দ্যাশে মার্শাল আইল মনে করলাম দুঃখ গেল
চোর চোট্টারা ধরা পড়ল জায়গা হয় না জেলখানায়
(কিন্তু) খবর দেখি কয়দিন পরে তারাই আবার মন্ত্রী হয়রে
দেশের মানুষ হায় হায় করে এইডাও কি ভাই বিশ্বাস যায়?

গণতন্ত্র আনবো দেশে মুজিব-জিয়া মাইরা শেষে
গদিত বইয়া অবশেষে কবির ভাষায় দেশ ভোলায়।
দেশ-বিদেশের সম্মেলনে কবিতা দিয়া ভাষণ আনে
বিদেশীরা হাসে মনে (বিদেশীরা ভাবে মনে)
তারে নোবেল প্রাইজ নি দেওন যায়॥'[২৪]

ময়মনসিংহের আরেকজন সালাম বয়াতি অসাধারণ তীক্ষ্ণতায় রূপকাশ্রয়ে এরশাদের রাজ্যশাসনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। গানটি নিম্নরূপ–

'বড় গাঙ্গে শাসনতন্ত্র নিত্য নতুন হয় তৈয়ার
রাঘব বোয়াল প্রাইম মিনিস্টার, শৈল বিদেশী ব্যারিস্টার
হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট গজার, রুহিত সাজে অফিসার।
গণতন্ত্রে সমান ভাবে সবার অধিকার ভাইরে॥

শিঙ সাজে ভাই মেলেটারী, মেজর সাজে মাগুর মাছ
চান্দা মাছের কেতকেতানি, পোটকায় করে কুচকাওয়াজ
মাঝে মধ্যে আরাম দিতে বাইন সাজে তার জুড়িদার॥'

Dhaka University Institutional Repository

এইসময় যে নিত্যদ্রব্যের মূল্য অত্যাধিক আকারে বেড়ে যায়। ফলে গানেও তার প্রভাব পড়ে। বাজারে আগুন নিয়ে মাহমুদ সেলিম একটি প্যারোডি গান রচনা করেন–

'আগুন দেখি বাজারে যাইয়া
পোলাপান বাঁচে কি খাইয়া
হাওয়া খাইয়া প্যাট ফুলাইয়া
মনের সুখে ঢোল বাজাবো॥

ভাত খাবো না কচু খাবো,
লতা পাতা খাইতে খাইতে
গরু ছাগল হইয়া যাবো
ভাত খাবো না কচু খাবো॥'

এরশাদের প্রহসনমূলক সকল ছলনা ব্যর্থ হয়ে গেলে ভাটির কবি শাহ আবদুল করিমের গণতন্ত্র মুক্তি পাবার আনন্দে লেখা একটি গান–

'জনসমুদ্রে নতুন জোয়ার এল রে
স্বৈরাচারের সিংহাসন আজ ভেসে গেল রে ॥

বাংলার গণ-জাগরণে
গণতন্ত্রের আগমণে
স্বচেতন বাঙালির মনে সাড়া দিল রে ॥'

আশি ও নব্বই জুড়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালদের বিচারের দাবীতে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এবং বেগম সুফিয়া কামালের অগ্রণী ভূমিকায় আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। নানাভাবে অনুষ্ঠান, গণ-আদালতসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হ'তে থাকে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় পরিষদ'। এসময় জাতীয় কবিতা পরিষদ[২৫], সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। দেশের প্রধান শিল্পী সাহিত্যিক, কবি-ছড়াকার, চিত্রকর-গায়ক সকলেই তাদের নিজস্ব জগতে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের দাবী শিল্পের মাধ্যমে তুলে আনেন। বিশেষ করে ছড়াকার ও কার্টুনিস্টদের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে। এসময় অনেক গানও লিখা হয়েছিল, যা এখন আর যথাযথ সংরক্ষণ রূপে পাওয়া যায় না। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর গাওয়া শিল্পী আলী রেজা খোকনের কথা ও সুরে ১৯৭৮ সালের দিকে লেখা একটি গান–

'জীবন মোদের দুর্বিসহ কইরা তুলছে রাজাকার
মুক্তিযুদ্ধের সেই হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার॥

আমার শনের ঘরখানাতে
দিছে যে জ্বালাইয়া
পুড়ছে কতো কোরান কিতাব
গেছ কি ভুলিয়া
আর দেব না করতে তাদের এমন ধারা অত্যাচার॥'

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালের দিকে ফজলুল বারী বাবুর লেখা একটি গান বারমাসী গান যেমন 'আগুন জ্বলাইস না আমার গায়' জাতীয় গানের সুরাবলম্বনে–

'কতা কইলে হ্যায় চেইত্যা যায়
বন্দুক দিয়া পুলিশ নামায়
আর্মির জ্বালায় বাঁচন দায়॥

একাত্তরে ছিল দালাল পশ্চিম পাকিস্তানে
ইয়াহিয়ার পাও চাটিত আপনারা তাও জানেন
স্বাধীন বাংলায় সাজে মুক্তিযোদ্ধা
নিমক হারাম হেই হালায়॥'

স্বাধীনতা-উত্তর গণসংগীত সম্পর্কে সার্বিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গণসংগীতের প্রয়োজনীয়তা কখনো ফুরায় নি। আন্দোলনের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নতুন ও তাৎক্ষণিক ভাবে অনেক গানই রচিত হয়েছে। যা উপযুক্ত সময়ের দাবী ও পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছে। প্রয়োজন শেষে কেউ স্মরণেও রাখেনি, সংরক্ষিতও হয়নি। বিশিস্ট গণশিল্পী সত্যেন সেন-এর উদাহরণ দেয়া যায় যে তিনি শতাধিক গান রচনা করেছেন, অথচ আমরা হাতে গোনা আট/দশটি গানের সন্ধান পাই। তিনি শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করতে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে গান লিখে ফেলতেন। আবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ভুলেও যেতেন। এভাবে অসংখ্য গান মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে লেখা হয়েছে কিন্তু তা সচেতনভাবে সংরক্ষণের কেউ ব্যবস্থা করে নি। তেমন কোনো দলীয় বা সংস্থাভিত্তিক কার্যক্রম ছিল না বলেই এমন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহে দেখা যায় ব্যতিক্রম। প্রতি দশক অনুযায়ী গণসংগীতে ধারাবাহিকতা, ইস্যু নির্বাচন করে সচেতন ভাবে সাংগঠনিক তৎপরতায় যেমন অজস্র গান গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখায় শাখায় রচিত হয়েছে। গণনাট্য সংঘের বাইরেও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তাদের থেমে থাকতে দেখা যায়নি। বাংলাদেশের গণসংগীত তুলনামূলক ভাবে সত্তর এর মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের শেষাবধি সেভাবে রচিত হয়নি এটাও সত্য। এই সময়ের জাগরণী গানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গানের বিশাল ভাণ্ডার পূণর্গীত হয়েছে। গ্রামীণ কবিদের এখানেও থেমে থাকতে দেখা যায় নি। বাংলা বিভক্তির সাথে সাথে আন্দোলনের ধারাও বিভক্ত হয়েছে। তবে দুইবাংলার আন্দোলনের ঐক্য সবসময়েই কিছু না কিছু শেয়ারে এসেছে। নকশালবাড়ী আন্দোলনের কথাই বলা যাক, এদেশেও তার অনেকটা প্রভাব এখনো লক্ষ্যনীয়। সত্তরের পর পশ্চিমবঙ্গের থেকে সংগৃহীত কিছু উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গানের তালিকা ও সার্বিকভাবে উঠে আসা শিল্পীদের তালিকা প্রদান করা হলো যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকালে, সহমর্মিতা, আন্দোলনে ঐকমত্য কিংবা আদর্শের জায়গা থেকে সমন্বয় রেখেছে এবং কিছুগান উভয় বাংলাতে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়েছে, সেইসাথে গণসংগীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের ব্যাপ্তি বাড়িয়েছে। নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য গানের তালিকা দেয়া হলো–

Dhaka University Institutional Repository

সত্তর দশকের গান

ক্রম	গানের শিরোনাম	কথা	সুর	মন্তব্য
১	ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন	কমল সরকার	কমল সরকার	পল রোবসনের স্মরণে নাজিম হিকমতের কবিতা অবলম্বনে রচিত
২	আমার বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ	দীপঙ্কর চক্রবর্তী	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ্যে সৃষ্ট
৩	ও দাদারে তাড়াও বাবুইরে	নিবারণ পণ্ডিত	নিবারণ পণ্ডিত	১৯৭০-এর পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নৈরাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বসে লেখা
৪	যদি কৃষ্ণ নামে পেট ভরিত	বঙ্কিম দত্ত	বঙ্কিম দত্ত	দুর্ভিক্ষের উপরে লেখা
৫	ও দুখি নাইয়া, রাঙাপাল উড়াইয়া যা রে বাইয়া, ঐ মুক্তি সাগর পানে	কঙ্কন ভট্টাচার্য	কঙ্কন ভট্টাচার্য	পল রোবসনের 'An ol' man river-এর সার্থক অনুবাদ ও অতিজনপ্রিয় একটি গান
৬	মোরা খুঁজে ফিরি সেই সূর্যমুখী, বিশ্বজোড়া সন্ধান	কঙ্কন ভট্টাচার্য	কঙ্কন ভট্টাচার্য	১৯৭৮ সালে কিউবায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-যুব উৎসবের ভাবানুবাদ। কিউবান সুরে গীত
৭	মুর্খু গীদাল হামরাগুলা ভাওয়াইয়া গান গাই../ স্বাধীন হইনু ঘর হারাইনু নাই আর ভিটা মাটি	নিবারণ পণ্ডিত	নিবারণ পণ্ডিত	দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পী সাম্প্রদায়িক কারণে দেশান্তরী হওয়ার ক্ষোভে লেখা
৮	শাশ্বত সুমহান উজ্জ্বল একটি নাম কমরেড লেনিন	গণেশ চক্রবর্তী	গণেশ চক্রবর্তী	লেনিনের জন্মশতবর্ষে লেখা
৯	ও সাথি কিষাণ মজদুর ভাইসব হুঁশিয়ার	বাসুদেব দাশগুপ্ত	বাসুদেব দাশগুপ্ত	১৯৭০-'৭২-এর সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে রচিত
১০	বড় দুঃখ পাইয়ারে বাংলার বাউল গান ভুইল্যাছে	শুভেন্দু মাইতি	শুভেন্দু মাইতি	বাংলার দুঃখ-দুর্দশার পরিস্থিতিতে লেখা
১১	আমরা কি রে তেমনি মানুষ ভাই	শুভেন্দু মাইতি	শুভেন্দু মাইতি	'৭৮-এর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত
১২	আর না আর না আর না	শ্যামল সেনগুপ্ত	শ্যামল সেনগুপ্ত	যুদ্ধবিরোধী শান্তির সপক্ষের গান
১৩	হবে কী সকাল-রাত কাটে কি	দীপঙ্কর চক্রবর্তী	তমাল মুখোপাধ্যায়	
১৪	তোমার হাতের রক্তপতাকা করেছি	সুধীন সেন	সুধীন সেন	
১৫	আমাদের কণ্ঠে বিজয়ের মাল্য জয়টিকা ললাটিকা আমাদের	মূল: ড. নক্রুমা অনুবাদ: গীতা মুখোপাধ্যায়	দিলীপ সেনগুপ্ত	১৯৬১ সালে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে নিহত প্যাট্রিস লুমুম্বা স্মরণে কবিতা 'There is victory for Africa' অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

আশির দশকের গান

ক্রম	গানের শিরোনাম	কথা	সুর	মন্তব্য
১	ফুলের নিয়মে ফুল ফুটবেই, ভোরের কাকলি..	শ্যামসুন্দর দে	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	সফদার হাশমীর মৃত্যুকে স্মরণ করে লেখা
২	প্রাণের সবুজে অনাগত কুঁড়ি কথা কয়	রত্না ভট্টাচার্য	রত্না ভট্টাচার্য	
৩	তোমার আমার রক্তে রাঙা রক্ত নিশান	সুব্রত মুখোপাধ্যায়	সুব্রত মুখোপাধ্যায়	
৪	আর একটা সমুদ্র পেরিয়ে, আর একটা বন্দরে..	পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য	পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য	
৫	Toiling millions now are warking মেহনতী জনতা উঠছে জেগে	কনক মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ)	দিলীপ সেনগুপ্ত	১৮৮৬ সালে আমেরিকায় ৮ঘন্টা শ্রমের দাবীতে 'Knight of labour' সংগঠনের একটি গান
৬	আমরা অনব নতুন দিন ক্লান্ত আমরা নতুন শ্রমে অন্ন জোটাতে দু-বেলা দু মুঠো মরে আছি	কনক মুখোপাধ্যায়	দিলীপ সেনগুপ্ত	'Knight of labour' সংগঠনের একটি গান অবলম্বনে রচিত
৭	অধিকার পেয়েছি যা জীবন গেলেও ছাড়ব না	বঙ্কিম দত্ত	বঙ্কিম দত্ত	অধিকার রক্ষার গান
৮	আমরা রাত জাগি, সাতরঙা সেই সকালটাকে	রত্না ভট্টাচার্য	মণিলাল মজুমদার	প্যাট্রিস লুমুম্বা, আলেন্দের খুনের প্রতিক্রিয়ায় রচিত
৯	নবজীবনের সোনালী দিনের ডাক ঐ আসে	রত্না ভট্টাচার্য	রত্না ভট্টাচার্য	
১০	ঘুমোও সোনা ঘুমোও মাণিক ঘুমোও বাছাধন বাংলাদেশের গল্প বলি চুপটি করে শোন	বিষ্ণু বেরা	হিরন্ময় ঘোষাল	দুর্ভিক্ষের গান, বিষয় বাংলাদেশ
১১	মানুষ যুদ্ধ চায় না মানুষ মৃত্যু চায় না	প্রান্তর সেন	প্রতাপ লাহা	যুদ্ধ বিরোধী গান
১২	বলো সেই নাম যারা জয় করে আনলো ৮ ঘন্টা দিন/ চিরদিন আমরা পারবনা শুধতে তাদের সে ঋণ	অজ্ঞাত। অডিও সংগ্রহ		১৮৫৫-৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বাড়ী তৈরীর শ্রমিকরা ৮ঘন্টা শ্রমের দাবীতে লেখা মূল গান ক্লেইম পার্কিনসন।
১৩	জন হেনরী জানতো শিসের সুরে তুলতে মিঠা তান/ পাহাড় পথে দড়ি চলে কেউ না জানে কোন সকালে শুনতে নিজের হাতুড়িটা গান, হায়রে..	মূল : হ্যারি বেলাফন্টে অনুবাদ : কঙ্কন ভট্টাচার্য	হ্যারি বেলাফন্টে	১৮৭০-৭২ সালে রেলশ্রমিক জন হেনরী স্টিম ড্রিলের প্রচলনে শ্রমিক ছাটাইয়ের আশংকায় যন্ত্রের সাথে মরণপণ প্রতিযোগিতায় নিহত হন।
১৪	কাছে কিবা দূরে যেখানেই চোখ মেলে চাও নিঃসীম জলাভূমি দিগন্ত মেলা	সংগ্রহ: হ্যান্স আইসলার। অনুবাদ : কঙ্কন ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	১৯৩৩ জার্মানীতে পাপেনবার্গ বন্দীশিবিরের গান ইংরেজী অনুবাদ : পল রোবসন
১৫	যেথা প্রলয়ের তাণ্ডবে হারাল নগর যেথা ভস্মে রচিত কত প্রিয়ের কবর	মূল : ইসুজু অনুবাদ : কঙ্কন ভট্টাচায	সংগৃহীত	৬ আগস্ট জাপানের হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে অগণিত শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক সংকট

স্বাধীনতা লাভের পর একটি স্বনির্ভর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য একদিকে যেমন নতুন নতুন কাজের সন্ধানে উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ শুরু হয় অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপের ভিতর নানা ধরণের সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হ'তে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। উদ্দীপনামূলক গান লোককবি ও শহুরে শিল্পীদের রচনার মধ্যে বিভিন্নভাবে তাৎপর্য লাভ করেছে। প্রাপ্তির যথেচ্ছাচারও যে অনেক ধরনের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে, কখনো কখনো বিপর্যয়ের কারণও ঘটিয়েছে, শিল্পীরা বিচক্ষণতার সাথে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সাংগীতিক প্রতিবাদে রূপান্তরিত করেছেন। অধিক সন্তান জন্ম না দিয়ে সাবলম্বী হয়ে ওঠা, সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত করে তোলা, অল্প বয়সে বিবাহ না দেয়া, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়াসে যৌতুক না গ্রহণ করা, নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা মান-উন্নয়ন, সাম্যবাদী মনোভাব সৃষ্টিসহ মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা সংগীতে স্থান পায়। দেশগঠনের প্রত্যয়ও ফুটে ওঠে কারো কারো গানে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনার রূপরেখায় স্বাধীনতার আগে সে সকল বিষয় প্রধানত এসেছে তা– কৃষক বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, দেশাত্ববোধ, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, জাপানি বোমা, সমাজতন্ত্র, স্বাধিকার, ভাষা-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান। স্বাধীনতা পরবর্তী অর্থাৎ সাতের দশক থেকে সূত্রপাত হয় নতুন রাজনৈতিক ধারণা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সংগঠন, গুপ্তহত্যা, জমিদখল, লুট, দুর্নীতি, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন, মধ্যবিত্তের বেড়ে ওঠা, সামাজিক নানাবিধ সংস্কার তথা একটি নতুন রাষ্ট্রই শুধু নয়– রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ধারণা ও পরিচর্যার এক মহা-পরীক্ষায় অবতীর্ণ সরকার ও প্রজা। এছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির সাথে মানরক্ষা, দাতাসংস্থার সাথে সুসম্পর্ক, মৌলিক অধিকার, জাতিগত অধিকার, সবকিছু সামনে আসে। শত্রু শ্রেণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ঢাল ব্যবহারের কৌশল গ্রহণ করতে হয়। সবকিছু মিলেই বাংলাদেশের মানুষ এক নতুন অভিজ্ঞতার ভিতরে এসে উপস্থিত হয়। ফলে সংগীতই শুধু নয়–সংস্কৃতির সকল শাখায়ই পরিবর্তনের আঁচড় পড়ে। মানবিকতার প্রশ্নে শিল্পের উৎকর্ষ নিয়ে যতই গভীরতা পাক। মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছাড়া যে প্রকৃত বোধকে সময়মতো ধরা যায় না তার নজির এই সময় পাওয়া যায়। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে মানুষের অধিকার বা মূল্যবোধের যায়গা যখন সমষ্টিগত না হয়ে ব্যক্তিগত হয়ে যায়, উন্নয়নের সম্ভাবনাও তখন ক্ষীণ হয়ে আসে। বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ছিল একটি সমষ্টিগত লড়াই, স্বাধীনতাকে ভোগ করার মানসিকতাও একই হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ফলে ঐশ্বর্যের ক্ষেতে আগুন দিয়ে গেছে শত্রুগণ। শত্রুদের প্রতিহত করার জন্যও প্রয়োজন ছিল সামগ্রিক প্রতিরোধের। তা না হওয়ায় নাগরিক জীবন থেকে সুবিধাভোগীরা হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষমতাবান, গ্রামীণ জনপদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। লোকশিল্পীর ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটেনি। গবেষণায় দেখা গেছে স্বাধীনতা পূর্বকালে শহুরে নাগরিক জীবন থেকে যেভাবে সংগ্রামের তীব্রতা বেগবান ছিল, উত্তরকালে তা হয়েছে বিপরীত। কিন্তু লোকশিল্পীরা গণমানুষের পাশে থেকে ঠিকই উপলব্ধি করে নিয়েছে প্রকৃত অবস্থা। শিল্পের জন্য অন্তত ততটুকু বাঁধন থাকতে হয় যা গণমানুষের মননগত যায়গায় এটি নিবিড় বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র তৈরী করে। কিন্তু বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই আত্মীয়তা থাকে না। গ্রামীণ গীতিকার, কবিয়াল–গায়ক এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি। তাদের সংস্কার, আদর্শ, অধিকারের ভাষা, পোষাক এমনকি খাদ্যপ্রণালীরও যথেষ্ট মিল থাকে। ফলে জীবনচর্চার বোধ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেক প্রত্যক্ষভাবে। অবারিত নতুন নতুন ফর্ম ও কন্টেন্ট-এ রূপান্তরিত করে। সেখানে শহুরে শিল্পমাধ্যম ফর্মের আবিষ্কার করতে করতে নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে দেখা গেছে সত্তরের পরে লোকশিল্পের কাছ থেকে সংস্কার যতটা প্রখর ভাবে ফুটে উঠেছে সেই তুলনায় নাগরিক শিল্প অনেকটা ম্লান।

মাঠজরিপ, বই পুস্তক, ও লোকমুখে প্রাপ্ত বেশকিছু জনপ্রিয় ও দুর্লভ গণসংগীত নিম্নরূপ উপস্থাপন করা হলো, এতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সামাজিক সংস্কারের পর্যবেক্ষণ। প্রথমেই ভাটির কবি শাহ আবদুল করিমের গানের দিকে লক্ষ করা যাক। স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে সিলেটের হরিপুরে তেলক্ষেত্র হরিলুট হয়ে যায়। সিমিটার কোম্পানীকে নামমূল্যে লীজ দেয়ার পিছনে ছিল ব্যাপক দুর্নীতি, তেল জনগণের সম্পদ অথচ তা সরকারের দালাল ও কোম্পানীর লোকেরা লুট করে নেয়। বাংলার স্বর্ণপ্রসু প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে সিলেটের উদ্বিগ্ন গণকবি আবদুল করিম উঠে আসেন মঞ্চে। পরিবেশন করেন–

'অনেকে বলে আমারে
গাও না একটা তেলচোরার গান।
তেলচোরা সে বিষম চোরা
সে যে অনেক ক্ষমতাবান...

হরিপুরের হরির লুট কেন
দেশবাসী কি খবর জানো,
তেলচোরারা নিলো শুনো–
এ দেশকে করতে চায় শশ্মান।'

শোষণের বিরুদ্ধে জাতি যেন নির্বাক। শাসন সংস্থা অসহায়। বিচারালয় পর্যুদস্ত। এই দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে শোষকেরা ইঁদুরের ন্যায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের সম্পদ, মাঠের সম্পদ, জাতিত্বের স্মারক, সভ্যতার নিদর্শন। অথচ আমরা যেন বধির-অন্ধ! তাই এই লোকশিল্পী সচেতন করে দিয়ে বলছেন–

'খবর রাখো নি–উন্দুরে লাগাইছে শয়তানি ॥
চাটি কাটে পাটি কাটে কাপড় চোপর আর
দিন রাত ঘরের মাঝে উন্দুরের দরবার ॥
বাড়িত কাটে বাড়ির বস্তু ক্ষেতে কাটে ধান
ঘরের ধান বাইরে নেয় ঘটাইছে নিদান ॥
ধান খায় চাউল খায় কাটে ঘরের বেড়া
কাটতে কাটতে গৃহস্থেরে করে বাড়ী ছাড়া ॥
বাউল আবদুল করিম বলে উন্দুর আছে ঘরে
বিলাইয়ে ধরে না উন্দুর দুঃখ বলব কারে ॥'[২৬]

এই গানটির মধ্যে দিয়েই বর্তমান বিশ্বরাজনীতি চক্রান্ত ও আমাদের অবস্থান সুচারু রূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য প্রত্নসম্পদ, বৃক্ষ, বীজ, ধাতু, প্রাকৃতিক সম্পদ, মোটিফ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিন বিদেশীরা নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ঘরের ভিতর থেকে আর আমরা নির্বিকার। কবির এখানেই বড়ো দুঃখ যে ইঁদুরের কাজ ইঁদুর করছে কিন্তু বিড়াল কেন নির্বিকার। সমষ্টিগত স্বার্থ থেকে সরে এসে ব্যক্তিস্বার্থ এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বলেই জাতি আজ নিমজ্জিত।

কবি আরেকটি গানে এবার আদেশ করে বলছেন–

'উন্দুর মাররে দেশের জনগণ
উন্দুরে করিতেছে বড় জ্বালাতন..

উন্দুরে ফসলের ক্ষতি করে নিশিদিন
দেশেতে খাদ্যের অভাব করতে হয় ঋণ..

উন্দুরের সংখ্যা বাড়িলে হইবে বিপদ
উন্দুর মার রক্ষা কর জাতীয় সম্পদ..

কত কঠিন রোগ বীজানু (জীবানু) উন্দুরে ছড়ায়
রোগে ভুগে কত মানুষ দুঃখ কষ্ট পায়..'

এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন কবি, জাতীয় সম্পদ হরণ করছে পরিণামে দিচ্ছে বিষাক্ত সব রোগ। আমাদের ধানের প্রজাতি ছিল ১২০০০ হাজারের মতো। এখন তা বর্তমানে সব বিলুপ্ত-লুট হয়ে দুএকশ'তে দাঁড়িয়েছে[২৭]। আর যারা এই বীজপ্রজাতি নিয়ে যায় তারা শিখিয়ে যায় হাইব্রীড প্রযুক্তি, বিষ আর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার। এই লোককবি গভীর উপলব্ধি তাই আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান করণীয় সম্পর্কে গভীর সতর্কবাণী করে দেয়।

একইভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে তাঁর কয়েকটি গান পাওয়া যায়। প্রথম দিকে লেখা সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিপক্ষে কবি অনেকটা ভাববাদী এবং অদৃষ্টের প্রতি নির্বিকার সমর্থন করেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গভীর পর্যবেক্ষণের আলোকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষেই রায় দেন। পূর্বোক্ত গানটি হলো–

'কেন করিব জন্মনিয়ন্ত্রণ।
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম চলে
তার ইচ্ছায় জন্ম-মরণ॥'

পরবর্তী গানটি হলো–

'জনসংখ্যা বাড়িতেছে জমি কিন্তু বাড়ে না
ভবিষ্যতে কি হইবে কর না বিবেচনা।
ভালো মন্দ যে বোঝে না
পাছে পাবে জ্বালাতন...

শান্তিতে থাকিবে যদি শান্তিকামী দুনিয়ায়
হিসাব করে সংসার বাড়াও
বাউল আবদুল করিম গায়
ক্ষেত খামার কল-কারখানায়

Dhaka University Institutional Repository

বাড়াও দেশের উৎপাদন ॥'

বাল্যবিবাহ নিয়ে একটি সংস্কারমূলক গান–

'কারে কী বলিব আমি
ঠেকছি নিজের আক্কলে ।
টেকা-পয়সা না জমাইয়া
বিয়া করে কোন বেয়াক্কলে ॥'

মশার উপদ্রব যে গ্রামবাংলার মানুষের নিত্য উপদ্রব ও স্থায়ী সমস্যা । সামাজিকভাবে নেই এর কোনো প্রতিকার, সরকারীভাবে সমাধানের কোনো রাস্তা নেই, কিছু প্রজাতির মশা মানুষের কঠিন রোগ ছড়িয়ে মৃত্যু ঘটায়, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর মতো ভয়াবহ রোগ দ্রুত জীবন বিনাশের কারণ ঘটায় । কবির সংগীতে এইসব বিষয় এড়িয়ে যায় নি । তিনি লিখেন–

'মশারি নাই সুযোগ পাইল নিদারুণ মশায়
দুই নয়নে ঘুম আসে না সারা রাইত ভরা কামড়ায়...

পাগলা মশার কামড় খাইয়া অনেকের হয় ম্যালেরিয়া
কুইনাইন ইনজেকশন লইয়া দিনরাত্রি মাথা ঘোরায়॥'

বাংলার আরেক শিল্পী, নগর জীবনের সাথে সংগ্রাম করে এলেও তাঁর ভাষা চিত্রকল্প এবং প্রসঙ্গ সর্বদাই গ্রামীণ জীবনের গভীর অনুসন্ধান মুখর হয়ে উঠে এসেছে । তিনি আবদুল লতিফ । সর্বাধিক ভাষার গান তাঁর কলম থেকে উঠে এসেছে, আবার স্বাধীনতাউত্তর কালে সমাজ সংস্কারমূলক বেশ কিছু অসাধারণ গান লিখেছেন– যার বিষয়, ভাষা, আঙ্গিকতা নতুন ধারার সন্ধান দেয় । ১৯৭৪ সালে লেখা যৌতুক বিরোধী গান–

'ইচ্ছা করে ঐ ব্যাটাদের মারি মুখে থুক,
কইরা হউরের (শ্বশুর) কাছে চায় যারা যৌতুক॥

ব্যাটা খয়রাতির পুত
খাইতে চায় ক্যান বিড়ালের মুত
তাই দেখিয়া হাসে হুলো করিয়া কৌতুক॥'

১৯৭৫ সালে নারী নির্যাতন ও প্রতারণা বিষয় সামাজিক জীবনের নিত্য ঘটনা, জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দানের ঘটনা তুলে এনেছেন–

'পথে পথে কানতে কানতে
কইতেছিল গেদীর মায়,
বুঝি না যে, হায়রে আল্লাহ
মানুষ কেন ঢাকা যায়?
ঢাকায় গিয়া বাঁচাইতে প্রাণ
গেদী আমার খোয়াইল মান
বেটিরে মোর খাইলো ওরা

Dhaka University Institutional Repository

শকুন যেমন মড়া খায়॥'

ডাক্তারদের প্রতারণা ও অবহেলায় প্রতিবছর শত শত লোকের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৮২ সালে এ বিষয় নিয়ে লিখেন–

'হাসপাতালে ডাক্তার নামে থাকে যত কসাই
সাবধানে যাইবেন সেথা ও মিয়া মশাই॥

গরীব দুঃখী পায় না দাওয়া
তাদের ভাগ্যে গালি খাওয়া
ইচ্ছা করে বইঠা তাদের চামড়া টাইনা খসাই॥'

হকার নিয়ে ব্যান্ড শিল্পী তৎকালীন 'সোলস'এর আইয়ুব বাচ্চুর গাওয়া একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি হলো–

'একটি হকার কেউ নেই তার
সকাল হলেই ছুটোছুটি
আর চিৎকার করে বলে
পেপার পেপার॥'

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক সংকট

ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ এলাকা । উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ছোট-বড় নদীর স্রোত সম্মিলনে । এছাড়া মৌসুমী অঞ্চলের প্রভাবে বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙনের মতো দুর্গতিকে প্রতি বছরই কোনো না কোনো ভাবে সামাল দিতে হয় । দুর্যোগকে কেন্দ্র করে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতি বছরই সাহায্য সহযোগিতা, দান-ত্রাণ, ঋণ ও বণ্টনের ঘটনা ঘটে । এতে যেমন দয়াবান লোকেরা নিবেদিত চিত্তে এগিয়ে আসে সাহায্য নিয়ে, অন্যদিকে অসৎ মনোবৃত্তির লোকেরা (সমাজের সুবিধাভোগী নেতৃত্বস্থানীয় অস্ত্র ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দুর্বৃত্তের দল) বিভিন্ন কৌশলে দান ও ত্রাণের সম্পদগুলো নিজের ঘরে লুকিয়ে ফেলে । সাধারণ ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের অবস্থা ক্রমাবনতি ঘটে । এমনকি রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হয় । অসহায় মানুষ বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন, ঘরহীন জীর্ণতার পথে কোনোমত দিনাতিপাত করে এমন লোকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ । ১৯৮৪ সালে শিল্পী আবদুল লতিফ তেমনি একটি বাস্তব দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন গানে ।

'মানুষের দ্বারা কাঁদিছে মানুষ
মানুষ ফিরে না চায়
কোথায় মানবতা মনুষ্যত্বে
মানুষ গেল কোথা?...

দেখেছি মানুষ মানুষের দ্বারে
মান সম্ভ্রম লাজ ঢাকিবারে
ছিন্নবস্ত্র মাগিছে মানুষ
আমরা কি দিছি তায়?
দুর্গত এই গণ-মানুষেরা
হয়েছে সহায়-সম্বলহারা
তবু কেন তারা মানুষের কাছে
সহানুভূতি না পায়?

বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে লেখা ব্যান্ড দল অবসকিউরের গাওয়া একটি গান 'বিধি তোমার এমন খেলা, শ্রাবণ জলে আগুন জ্বলে/ আকাশভরা গজব লীলায়, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ কাঁদে ।'; সোলস-এর তপন চৌধুরীর কণ্ঠে গাওয়া একটি গান 'ও নদী–এই কীর্তিনাশা তীরে, বাইন্দাছিল ঘর/ নদী ভাইঙ্গা দিল তাই হইলাম দেশান্তর'; ফিডব্যাকের মাকসুদের গাওয়া মাঝি তুমি বইঠা ধরো রে/ চলো যাই দূরে সুদূরে...মাঝি তোর রেডিও নাই বলে জানতেও পারলি না/ আইতাছে ধাইয়া এত বড়ো ঢেউ/ সারা বাংলাদেশ জানলো মাঝি/ তুইতো জানলি না ।' ইত্যাদি গান গণসংগীত হিসেবে পরিচিতি পায় নি । তবে গণমানুষের হাহাকার-বাস্তবতা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠে এসেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গণসংগীতের একাল

গত তিন দশকে বিজ্ঞানের যে দ্রুত বিকাশ হয়েছে, এতে করে শিল্প-সংস্কৃতি, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনীতি তো বটেই, সর্ববিষয়ে আমূল পরিবর্তন হয়েছে–যেন আধুনিক বিজ্ঞানের ঝড়ে উড়ে গেছে লক্ষযুগের সীমাবদ্ধ জীবনের দেয়াল। যে বিশ্বকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে জাতি-রাষ্ট্র সংঘের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাব এখনো অব্যাহত আছে শোষক প্রভুর আসনে। অপরদিকে তথ্যসাম্রাজ্য বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রকাশনা, চলচ্চিত্র, স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটারের মতো অসম্ভব বিষয়কে খুব সহজ করে দিয়েছে। সংগীতও তেমনি ছিল মঞ্চের পরিবেশনা এখন রেকর্ড–ভিডিও এনিমেশনের নানা কারুকার্যে ভরা। ধ্বনি সংস্কৃতি ধারণের সাফল্য এসেছে ১৮৭৭ সালে। টমাস আলভা এডিসন সেই বৎসর 'ম্যারি গোল্ড আ লিট্‌ল ল্যাম্ব' কলিটি যন্ত্রের মধ্যদিয়ে শোনাতে পেরেছিলেন। ১৯৩০ সালের মধ্যে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে ধ্বনি ধারণ এবং প্রসারের সুযোগ ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে এল পি, ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি, এমডি, কম্পিউটার, এমপি থ্রি হয়ে এসে সংগীত এখন মোবাইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এমন একটি জনপ্রিয় ও সহজলভ্য উপস্থাপনে পরিণত হয়েছে যে মঞ্চ ও গোষ্ঠী পরিবেশনার বাইরেই এর জগৎ অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ে গেছে। ফলে সংগীতের মাধ্যমে বাণিজ্য নির্ভরতা বেড়েছে, আসর কেন্দ্রিক সংগীত লোপ পেয়ে একক নির্জনের উপাদান হয়েছে। ফলে নাগরিক জীবনের স্বাদ, চাহিদা মেটাতে সংগীত সার্বজনীনতা কিংবা শুদ্ধাচার ছেড়ে নাগরিক জীবনের অন্তঃসার হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নাগরিক জীবনের মধ্যবিত্ত বাঙালির মনন এতদিন যে চরিত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তা আজ অবলুপ্ত , এমনকি গ্রামীণ জীবনেও তার প্রভাব কম পড়েনি শহুরে হাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে; সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থের বলি হয়েও কম পরাধীন নয়। এর ভিতর অবলীলায় ঢুকে পড়েছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, ফলে স্বাদশিকতার যে দায় বোধ, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই' কিংবা 'ছেড়ে দে রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী, কভূ হাতে আর পরো না' জাতীয় গান নৈতিক মূল্য হারিয়েছে প্রতিযোগী অর্থনীতির কাছে। যেখানে বিদেশী সংস্কৃতি, পোষাক, ফ্যাশন কিংবা খাদ্য-প্রসাধনী শহরে-গ্রামে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে, স্যাটেলাইটের বিজ্ঞাপন, সেলুলারের সহজলভ্যতা বিশ্বকে একটি ছোট্টঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেখানে 'বিশ্ব অর্থনীতির নতুন নিয়মে স্বাদেশিকতার অস্বীকারই বলা যায়। সমাজতন্ত্র প্রয়োগে পরাজিত। আদর্শের রাজনীতি ও সংগঠন এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় (পশ্চিমবঙ্গ) গিয়ে সুবিধাবাদের লেজুড়বৃত্তি করে রাজনীতিক আন্দোলনে ও নাগরিক বাঙালির সংস্কৃতিতে বিষয়হীনতা এনে দিয়েছে।

নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত এখন যে আন্তর্জাতিকতা থেকে বিফল হয়ে স্বদেশে ফিরেছে অথচ শিক্ষায় সে আন্তর্জাতিক। সে গ্রাম থেকে এসেছে। নিজেকে নগরে স্থাপন করতে গিয়ে নিজের অবস্থান বুঝতে চাইছে। আবার নগরের ক্লান্তিতে প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কৃষক-শ্রমিকের সাথে তার জোট তৈরী হলো না, সে মধ্যবিত্তের অবস্থানে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে। আবার গণ্ডির সীমাবদ্ধতায় নিজের অবস্থানকে সমালোচনা করে। সাম্যবাদী রাজনীতিতে তার অনাগ্রহ, আবার সংগ্রামের ঐতিহ্যে তার আকর্ষণ। সমষ্টির মিলনে তার স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে নিজেকে ব্যক্তিতে স্থাপিত করতে চায়। আবার ব্যক্তি অবস্থান থেকে ব্যক্তিস্বার্থ-আকাঙ্খা–ব্যক্তি প্রাপ্তিতে সে অসমর্থ। একদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে পছন্দ, অন্যদিকে সহযোগিতার আকাঙ্খা। এই জটিলতায় সে আকড়ে ধরতে চেয়েছে তারই বাতিল

Dhaka University Institutional Repository

করে দেয়া দর্শন–মানবিকতাবাদ । মানবিকতার নির্দিস্ট সংজ্ঞা নেই, সুপরিকাল্পত কর্মসূচী নেই, সুপঠিত সংগঠন নেই, মানবিকতা নির্মিত হয় ।[২৮]

মানবিকতা যেন টিকে থাকার জন্য শোষকের দরবারে গুটিপায়ে মাথা গুঁজে আশ্রয় নেয়া; সততার ভীরু মূল্যবোধে ছোট ছোট প্রতিবাদ করে যাওয়ার পাশাপাশি ভীষণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা । মিডিয়া বিরোধীতার শ্লোগান তুলে আবার হন্যে হয়ে ফিরে মিডিয়ার দ্বারস্থ হওয়া । তাই নাগরিক জীবনে প্রকৃতি আসে চিত্রকল্প, উপমা হয়ে নয়, স্মৃতি ও রোমন্থনের ভাষা হয়ে । শৈশব, চারিত্র্য, প্রতিবাদ শ্লোগানের মতো সজীব হয়ে উচ্চারিত হয় না । আসে উত্তরাধিকার হয়ে বীরের সন্তান বলে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সনদ হিসেবে । ফলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা সদর্থক অর্থেই রূপকতা-বিমূর্ততা লাভ করে । আধুনিক চিত্রকলাই যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ ।

অন্যদিকে বিশ্বের পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পকলায় আদিরসের নানা শৈল্পিক উপাদান শরীর নির্ভর হয়ে ওঠে । ফলে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করেও 'সিটিজেনশীপ ইমিগ্রেশন লটারী'র ফাঁদে মানসিকভাবে অবনমিত সর্বস্তরের তরুণ-যুবক সমাজ । 'দেশজ পণ্য কিনে হও ধন্য' এমন বোধ আজ বিদেশী সহজলভ্য ঝকমারি প্রসাধনের দাপটে ম্লান, বিশ্ব-অর্থনীতির নব্য-উপনিবেশিকতা এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, জাতিসংঘের দলিলে রাষ্ট্ররেখা অক্ষত থাকলেও ধনিরাষ্ট্রের লাভালাভ দেশ দখলের চেয়েও অনেক বেশী অগ্রগামী হয়েছে পণ্য রফতানীর মধ্যদিয়ে লুটেরাবৃত্তির পরিচর্যা ।

নাগরিক জীবনের সংকটই তাই অন্যরকম । দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন সংগ্রাম-বিপ্লব আলাদা, উপাদানগত কারণেই । এই সংকট দ্বন্দ্বের, দর্শনের । অনেক সংকটই দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার সুরাহা হওয়ার কোনো উত্তর জানা নেই, মানে দার্শনিক সংকটই মানুষকে নিশ্চল প্রাজ্ঞের আসনে বসিয়েছে । তাই অধিকারের ভাষা বিবেকের কাছে পরাস্ত হয়ে যায়, অস্তিত্বের সংকটে ঠুনকো মূল্যে মেধা বিক্রি হয়ে যায় । শিল্পেও তার প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক । জীবন ও প্রতিবাদের ভাষায়ও শুষ্ক প্রান্তর, ধূলি, ঝলসানো মুখ, পুলিশের থাবা, চারুকলার আড্ডা, অজগর, ধানে বিষ, কারখানা বন্ধের হাহাকার, মেশিন, বুটের লাথি, ঘরহারা বাস্তুহারা, বন্ধুহারা, ফ্ল্যাট বাড়ি, ড্রইংরুম, নেড়ি কুকুর, টোটো কোম্পানী, গেরস্তালী, বৃদ্ধাশ্রম, সোফাসেট, ড্রইংরুম ইত্যাদি অনুসঙ্গ-প্রসঙ্গ উঠে আসে । প্রতিবাদের ভাষা ও বলার আকাঙ্খা, অনেক গভীর থেকে কিন্তু বলার সাহস নাই–এমন ইঙ্গিতকে শৈল্পিক প্রকাশ হিসেবে মনে করা হয় । অন্যদিকে ঘরে ফেরার বাসনা নিয়ে লোক-প্রভাব এসেছে পরিচর্যার বাহন হিসেবে, কিন্তু তার খাঁটিত্ব না রেখে বাণিজ্যমুখী আধুনিকতার ছাপই প্রধান হয়ে উঠেছে । সংগ্রামের সরলীকরণ মনোবৃত্তি, হারিয়ে যাওয়া শ্রমগীতের প্রতি হাহাকার কিন্তু শ্রমগীত না গেয়ে পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত জনপ্রিয় গানের চিৎকারে নিজেকে মিলিয়ে নেয়া, এই হলো গানের একালের ভাষা ।

শোষকের কাজই হলো অস্ত্রের ধারণা পাল্টে দেওয়া, বারবার শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণী যে অস্ত্র উদ্ভাবন করে, শোষক শ্রেণী পরবর্তীকালে তা-ই গলাদ্ধকরণ করে ছুঁড়ে দেয় সেই উদ্ভাবকের প্রতিই । তাই প্রযুক্তির কাছে তার উপযুক্ত চমকের কাছে নতজানু হতে হয় । নির্ভরশীল হতে হয় বারবার । শিল্প, দর্শন, সংগীতও একইভাবে নতজানু হয়ে পড়ে অন্তত পৃষ্ঠপোষকতার কাছে । ফলে নিঃস্ব একাকিত্ব, ধুসর মলিন বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় । সেখানেও আবার আশাবাদ, সমষ্টির ইঙ্গিত রেখে যাওয়া, এই-ই বাংলাগানের বর্তমান ভাষা । ভাষার বাঁক বদল মানে দুর থেকে নিজেকে আবিষ্কার করতে শেখা যে, সে

Dhaka University Institutional Repository

আর সমষ্টির নেই, যে কোনো সোসাইটির আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলা গৃহপালিত আদুরে প্রাণীর মতো, একজন জ্ঞানী শিশু। একজন গণশিল্পীর ভাষায় বললে–"আমরা যুগ যুগ ধরে জনপদের মানুষ, জনপদের গরু-বাছুর, পাখ-পাখালি, গাছ-পালা সবাই পরস্পরের থেকে কতোটা দুরের হয়ে থাকছি! আর ব্যক্তিমানুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে পারছি না। প্রত্যেকেই যেন–খাপ খোলা ছুরি বের করে বসে আছি। ঘুরছি তো ঘুরছিই। এই সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ব্যক্তিমানুষ কে কতটা ভয়ানক জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। ...কিন্তু মহাজাগতিক অর্থেই আন্তঃসম্পর্কের একটি নিঃশর্ত নিবিড় ঐক্য থাকার দরকার। ডাকটা দরকার। সেই ডাক ঝড়েরই হোক, বাঘেরই হোক, সিংহেরই হোক, শিশুরই হোক, গাছ-গাছালির পাতার ফাঁক ফোকরেই হোক, রান্নাঘরে হেঁসেলে কারখানায় পেটানোর আওয়াজই হোক, সকল হিংস্রতার নৃসংশতার দাঁত শিং ভেঙে দিয়ে সুরের ডাকের গর্জনটা হোক– অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভালোবাসার নিবিড় মমতায় অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের পক্ষে।"[২৯]

অর্থাৎ মানবতা বা গণচেতনামূলক গানের ভাষা যেমন ফ্যাসিবাদ-ব্রিটিশ বিদ্রোহের সময় একরকম ছিলো, ভাষা আন্দোলনে তা পরিবর্তন হয়েছে। তেভাগা, কৃষক বিদ্রোহ, নির্বাচন, গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, দেশের টানে যে ভাষা ও পরিভাষার বাঁক বদল করেছে। একইভাবে এই সময়ের পরিভাষা আলাদা। একালের গানের বাঁক বদলের ভাষায় প্রত্যক্ষ হয় অচেনা কোনো শত্রুর কথা যে ক্ষত করে যাচ্ছে ধীরে ধীরে নিজেরই শরীর, অথচ প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই, কোনো অবিশ্বাস যা মুখ ফুটে বলা যায় না, কোনো নিঃসঙ্গতা যাকে দূরে ফেলে দিতেও ইচ্ছে করে না, ভালবাসা যা কখনো খুব ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, স্থূল কোনো বন্ধু নিয়ে অবিরাম হাঁটা, কোনো প্রতিশোধ, যা কখনো নেয়া হয় না, ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্রত্বের কাছে নতিস্বীকার, রাজনৈতিক, সামাজিক অনাচারের সামনে দাঁড়িয়ে, একশ্রেণীর বর্বরদের অস্ত্রের মুখে নির্বিকার কোনো নগ্ন-স্থূল সংস্কৃতি-শিল্পের জয়গান–যার সাথে কোনোভাবেই বসবাস করা যায় না। এমনি একটি সময় যাকে বিশ্লেষণ করার দার্শনিক কোনো তত্ত্ব নেই, অথচ জিজ্ঞাসা আছে, সমাধানের ভরসা আছে, গানের চরিতার্থ বিষয় এমনি।

কারণ বর্তমান বিশ্ব বিশ্বায়নের। মহিনের ঘোড়াগুলোকে এখন আর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পথ অতিক্রম করে আবিষ্কার করতে হয় না ভিন্ন কোনো দেশ বা গোত্রের ইতিহাস-আচরণ-সংস্কারকে জানতে। গুরুর পাঠ গুরুত্বহীন, সংঘবদ্ধতা হারানো একাকী বিশ্ব-দর্শন, শ্রমের চাপ কমে কৌশলের চাপ বেশি। অন্যদিকে টেকনোলজির হাজার দুয়ার, ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট, লেজার লাইট। তাই গানের প্রতিপাদ্য বিষয় হয় দেশ বন্দনার কথা না এসে, বিপর্যয় থেকে মুক্তির বন্দনা। একসময় পাখি কিংবা প্রাণির নৃত্য চিত্র ফুটে উঠতো গানে-কবিতায়, এখন সেই বিলুপ্ত পাখির টিকে থাকার জন্য বন্দনা। মানুষের ফেলে আসা উজ্জ্বল অতীত যেখানে মানবিকতার ব্যঞ্জনা পরতে পরতে রক্ষিত আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে এখন গাইছে একাকিত্বের জয়গান। তবু গানতো থামতে পারে না। গণসংগীতের ঐশ্বর্যের অভিজ্ঞতায় বিবর্তনকে ধারণ করে পরিণত হয় অন্যকোনো ভাষার কিংবা অবক্ষয়ের শিক্ষা থেকে নেয়া নতুন কোনো সমৃদ্ধ ভাষা বৈশিষ্ট্য। এখনকার 'সাতটা শঙ্খ একবারে বাজাবো' গানে তাই উঠে আসে–

'বাঘের বুকে জাগল বুঝি সাগর দেশের ঝড়
পাখির ডানায় দারুণ শক্তি, গরুর চোখে মায়া
গরুর চোখে মায়া লাগে, শিঙে লাগে সাহস॥...

গরুর বুকে জাগলো বুঝি মাঠের হাহাকার

Dhaka University Institutional Repository

আর গরু বললো– আমার মাঠ নাই... আমার ঘাস নাই

চাষার বুকে জাগলো বুঝি গরুর হাহাকার
আর চাষা বললো... আমার মাঠ নাই... আমার গরু নাই॥'

শিল্পী কফিল আহমেদের চোখে এই যে গরুর হাহাকার, চাষার হাহাকার, বাঘের হাহাকার, পাখির হাহাকার সবমিলে পৃথিবীটা আজ অন্য রকম, অন্য ভাষার। জাপানে প্রাকৃতিক উপায়ে আবাদকারী কৃষক মাসানুবো ফুকুওকা নিয়ে গান লিখেন, যে কৃষক ধানাবাদের কালে মাঠের আগাছা সাফ করেন না, আবাদী ফসলের কিছুটা অংশ পাখি ও পতঙ্গের অধিকার আছে বিবেচনা করে কিছু ফসল মাঠেই রেখে যান, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাসায় নিয়ে জান না। গানটি হলো–

'পাখিটার কথা বলি যে কারণ আমাদেরো ডানা কাটা
গরুটার কথা বলি যে কারণ আমাদেরো চোখ বাঁকা
মাসানুবোফুকুওকা মাসানুবোফুকুওকা মাসানুবোফুকুওকা

ছবিটার কথা কলি না কারণ ছবিটা তো শুধু আঁকা
ছবিটা কি শুধু আঁকা
তুমি আমি যদি এত ফাঁকা তবে ছবিটারে কেন রাখা॥

কতো বৃষ্টি বাদলা মন উতলা ভিজে না তো কোনো ছায়া
আলোছায়া বনে ভাঙা ডালে দেখো ছোট ফুল কতো একা॥

কতো মরিচ ফুলের মরিচা জ্বেলেছি মরীচিকা কি আলোটা
লাগে মরীচিকা কি আলোটা
পাখা ঝাপটায়ে পাখা ঝাপটায়ে ভাঙাতো যায় না খাঁচা
পাখা ঝাপটায়ে পাখা ঝাপটায়ে ডাকি লাল মোরগের ডাকটা
মাথা নত না করা মাথা নত না করা মাথা নত না করা॥'

মরিচের সাথে মরিচিকা, পাখির সাথে খাঁচা, ছোট ফুলের ভিতর একাকিত্ব, এই কথাগুলো এসময়ের দ্বান্দ্বিক দার্শনিকতাকেই প্রকাশ করে। প্রতিবাদের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া নিরুপায়ের আর্তি, আর্তনাদ, বন্দীত্ব, ইতিহাসের মহাকালে, জাতীয় ও বিশ্বজীবনের স্নায়ুবিক জালে। তবু মাথা নত করা যাবে না কারণ বুকে জ্বলছে সেই প্রাগৈতিহাসিক আগুনের শিখা, সেই আগুনের সাথে অনন্তকালের প্রেম সহোদরের ন্যায়। তাই তিনি বলেন–

'আগুনে ঘুমাই আগুনে খাই
আমি এবং আমার আগুন জমজ বোন জমজ ভাই॥

আগুন তুমি মাটির তলায় আঁধারে ছিলে
আগুন তুমি পাথরে চাপা ঘুমে ছিলে
আগুন তুমি মেয়েটির মনে সঙ্গোপনে লুকিয়েছিলে।
কী করে যাই আমি কী করে যাই
আগুন আমি তোমায় ছেড়ে কী করে যাই॥

Dhaka University Institutional Repository

আগুন তুমি সিগ্রেটে নও ছাই ভস্ম
আগুন তুমি ভাড়াটে লোকালে ভোট চাওয়া নও হত্যা প্রবণ
আগুন তুমি গেরিলার বুকে ঘুমিয়ে থাকা গ্রেনেডে ছিলে
কী করে যাই আমি কি করে যাই
আগুন আমি তোমায় ছেড়ে কি করে যাই॥'

এখানেই বাংলা গণসংগীতের পূর্ণতা পায়। ভাষা-সাহিত্য-দর্শন-প্রতিবাদ-উপাসনা-অর্জন ও চেতনার সকল রূপ এই গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। জনপ্রিয় এই গণসংগীতে আদিম ইতিহাস থেকে স্বৈরাচারের ভোট-দুর্নীতি পর্যন্ত, তরুণীর বুকের আগুন থেকে গেরিলার গ্রেনেড পর্যন্ত ধারণ করেছে গানটি। গানটি সম্পর্কে একটি ভাষ্যরূপ–"কফিলের আগুনে ঘুমাই, আগুনে খাই গানটি শোনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের 'আগুণের পরশমণি' 'আগুনে হল আগুনময়' ও 'ওরে আগুন আমার ভাই' গান তিনটির কথা মনে এসেছে; পরে তাই গীতবিতান খুলে বসেছি, বারবার পড়ে দেখেছি পূজাপর্বের এ গান তিনটিতে আগুনের দাহ্যশক্তির বন্দনা আছে, যেমনটা একটি অগ্নি উপাসকের চৈতন্যে থাকে। আগুনের দাহ্যগুণের বন্দনার চেয়ে কফিলের গানে ব্যক্তিগত দহনের কথা যেন বেশি বলা হয়ে যায়। আগুন নিয়ে প্রতারণাময় বাণী সন্নিবেশিত কফিলের আরো একটি গান আছে, যে গান শুনতে গিয়ে মনে হয় গানে যাকে বলা হচ্ছে 'সহোদরা জ্বলন্ত অগ্নির' সে দাহিকা শক্তির অধিকারী কোনো এক আদিবাসী নারী, যে নারী মহুয়ার রাত্তিরে জাগে, শোনে বাঁশি বাজে হাহাকার। এ গানের কফিল অগ্নিচেতনায় শান দেওয়ার কথা বলে আমাদের হাত ধরে নিয়ে চলেন কৌম সমাজের কাছে, যে-সমাজের মানুষ বিশ্বাস করে সাম্যে। সেই রকম শুভবাদী সমাজ গঠনের আকাঙ্খায় কফিল আহমেদ"[৩০] গান লিখে চলেছেন অবিরত। তেমনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গানের অংশ তুলে ধরা হলো। নিম্নবর্ণের অভাব দুঃখের একটি বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখেন–

'আর যাবো না ঠাকুর বাড়ি
আমার রাধার নাইরে শাড়ি
শশী তুমি ডুবে যাও
সূর্য তুমি নিভে যাও
অন্ধকারে স্বর্গ আঁকো
তোমার লজ্জা ঢাকো
আমার লজ্জা রাখো
যে চিনে সে চিনে নেবে
অন্ধকারে ঠাকুর বাড়ি।'

কেন ঠাকুর বাড়ি সে যাবে না তার কারণ হলো "জগন্নাথের বড় রাধা পূজোয় নতুন শাড়ি না পাওয়ার অভিমানে আত্মহত্যা করেছিলেন। ছোটবেলায় নিম্নবর্ণের আত্মহননকারী এ হিন্দু নারীর শ্মশানযাত্রায় শরিক হওয়ার স্মৃতি তাঁকে তাড়িত করে, ভুলতে পারেন নি। শবদাহের সময় জগন্নাথের আর্ত হাহাকার, হাহাকার করে জগন্নাথ আর কক্ষনো ঠাকুর বাড়ি না যাওয়ার ঘোষনা দিয়েছিলেন।"[৩১]
বর্তমান সময়ের মানুষ যেন একটি অতিকায় অভিজ্ঞ শিশু যে সব বোঝে, সব জানে কিন্তু কিছু মুখ ফুটে বলতে পারে না। সে কারণে সমাজের, রাষ্ট্রের, প্রকৃতির সংকটগুলো, একাকিত্বগুলো নির্দিষ্ট হয়ে আসে

Dhaka University Institutional Repository

না, আসে অনুসঙ্গ হয়ে প্রসঙ্গ হয়ে, পূর্বকালের গানে যেমন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা গানকে চেনা যায়, বর্তমানের গানে তা গুরুত্ব পায় না অথচ একই সাথে উঠে আসে অনেক প্রসঙ্গ–
যেমন–

'বাংলার আকাশে উড়ে যাওয়া জেট জঙ্গীর দিকে ছুঁড়ে মারছি আ
দাও দাও করা সারাটা দুপুরে বস্তিতে পোড়া আ
কসাইখানার বাছুরের ডাক শেষ ডাক যত আ
বাগানের চারা গাছেরে ডেকে ডেকে বলি রাস্তায় নেমে আ'

এখানে প্রকৃতির চিৎকারকে নির্মাণ করেছেন কফিল । একই ভাবে–

'দেখলাম মধুপুরে চোখের নিকটে
কয়টা হরিণ বান্ধা আছে কাঁটাতার ঘেরা বনে
হনুমান ঝুলে আছে পাতাটাতা খুঁজে বনে
পাতাটাতা নাই বনে হনুমান তরে জ্বরে'

এভাবে বুড়িগঙ্গা নদীর কান্না, গাছের কান্না, মাছের কান্না, ফসলের কান্নার সাথে নিজের জীবনের কান্নার দহন কফিলের বক্তব্য, যা এসময়েরই বক্তব্যকে প্রতিনিধিত্ব করে ।

এসময়ের গানে ভাষাগত বিচারে স্থূলতার অপবাদ এসেছে, তা গানের সার্বিক বিচারে অর্থাৎ বাংলা গানের অন্যান্য অঞ্চল পর্যালোচনা করলে বিষয়টি মিথ্যা নয় । কিন্তু তা সুক্ষ্মভাবে না দেখার অপবাদ । এই কালে কফিলের মতোই আরো অনেক চিন্তাশীল শিল্পী লেখক আছেন যাদের মননে সুষমাময় শিল্পেরই শ্লোগান । হয়তো তা স্বদেশী গান হিসেবে বা গণসংগীত নাম নিয়ে আসছে না । হয়তো তা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো পরিভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় । কখনো 'জীবনমুখী গান', 'নতুন ধারার গান', 'সমাজ বদলের গান', 'বাঁক ফেরার গান', 'উত্তরাধুনিক গান' ইত্যাদি, যে গানগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভিন্ন কিছু শিল্পীর নাম আজম খান, সুমন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা, মৌসুমী ভৌমিক, মাহমুদুজ্জামান বাবু, জেমস, অমল আকাশ, অরূপ রাহী, হায়দার হোসেন, নিতুপূর্ণা, বিশ্বজিৎ দাশ সোহাগ, ফরহাদ মজহার, আহমেদ বাবলু, কৃষ্ণকলি, আরিফ বুলবুল, শুভ, তূর্য, রত্না ভট্টাচার্য, কঙ্কন ভট্টাচার্য, শুভেন্দু মাইতি, দিলীপ সেনগুপ্ত, অসিত রায়, প্রতাপ লাহা, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, হিরন্ময় ঘোষাল, দিলীপ রক্ষিত, অমল নায়েক, মধু গোস্বামী, ঘনশ্যাম সর্দার, বকুল আচার্য, শ্যামল মন্ডলসহ পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নাম না জানা অসংখ্য গণকবি-গণশিল্পীদের গান উল্লেখযোগ্য ।

এসময়ের গানের যাদের গান খুব বেশি আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে সুমন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম । পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী হলেও তিনি বাংলাদেশেও বিস্তার করেছেন তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা । বাংলাগানের একালের যে বিষয়মগ্নতা তার গানেই সবচেয়ে বেশিকরে পাওয়া যায়, নাগরিক মধ্যবিত্তের ভাষা ও ভাবকে তিনি নানা আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন । সাম্রাজ্যবাদকে রুখে দেয়ার জন্য একসময় যে প্রতিবাদ ছিলো, এখন সে ভাষা সরে গিয়েছে, কারণ তখন ছিল সাম্রাজ্যবাদের দখলদারিত্বের কাল, আর এখন গলাদ্ধকরণের কাল । ফলে এখন আমরা খাবারে পরিণত । সুমন সেই কথাগুলো বলেন এভাবে যে–

Dhaka University Institutional Repository

যদি ভাবো কিনছো আমায় ভুল ভেবেছ
কেনা যায় কণ্ঠ আমার দফা দফা
রুজি রোজগারের জন্য করছি রফা ।

দু'হাতের আঙুলগুলো কিনতে পারো
আপোশে নেই আপত্তি নেই আমারো
আমাকে না আমার আপোশ কিনছো তুমি
বলো কি জিতলে তবে জন্মভূমি জন্মভূমি ।'

সাম্রাজ্যবাদ যে আমাদের প্রকৃতির উপরে প্রভাব বিস্তার করে নদী, নির্জনতা, তৃণলতার সকল প্রবাহকে বন্ধ করে দিচ্ছে তারই একটি গল্প কিভাবে আসে–

ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল
ঘাটের কাছে গল্প বলে নদীর জল
আদ্যিকাল শ্যাওলা হল ঘাটের গায়
ভূতের চার নখের নৌকো যায়
নদীর ধারে বসবে বুঝি পাটের কল॥

পাটের কলে মানুষ ফ্যালে মাথার ঘাম
পরের ঘামে মালিক জপে টাকার নাম
ঘামের জলে নৌকো চলে, দেখবি চল॥'

মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে রাজা আসে রাজা যায়, মিটিং-মিছিল হয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, অধিকার আদায়ের শ্লোগানে মানুষ ভেসে যায়, ভাবে এই বুঝি মুক্তি আসবে, আবার কখনো দল পাল্টায়, নিজেদের লোক, মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিকে ক্ষমতায় আনে। কিন্তু ইতিহাসের একই নিয়ম যে নিরীহ–ভুখা নাঙা মানুষের জীবন কখনো বদলায় না। মানুষ যে অধিকারের দাবী নিয়ে মিছিলে আসে। মিছিল শেষ হলে তাদের সেই পুরোনো সংকট আর বাঁচার লড়াই। এমনি অভিজ্ঞতা হাজার বছর ধরেই চলছে। ক্ষমতায় গেলেই মানুষের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। সুমনের উপলব্ধি–

'ব্রিগেডে মিটিং হবে, লক্ষ লক্ষ মাথা
ব্রিগেডে মিটিং শেষ, হাফাচ্ছে কলকাতা ।

ব্রিগেডে মিটিং হবে, ময়দান তোলপাড়
ব্রিগেডে মিটিং শেষ, ছড়ানো চায়ের ভাঁড় ।

ব্রিগেডে মিটিং হবে, গ্রাম থেকে আসা মুখ
ব্রিগেডে মিটিং শেষ, বিছানা আগন্তুক ।

ব্রিগেডে মিটিং হবে, রাস্তায় যানজট
ব্রিগেডে মিটিং শেষ, ফুরোয় না সংকট ।

ব্রিগেডে মিটিং হবে, অনেক উঁচুতে মাচা

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিগেডে মিটিং শেষ, বড্ড নিচুতে বাঁচা ।

ব্রিগেডে মিটিং হবে, মানুষ উত্তেজিত
কি করে বাঁচবে লোকে, কেউ যদি বলে দিত!'

এই যে অতিক্রান্ত সময়ে মানুষ একা । তা কিন্তু নিরুপায়ের কথা বলে । মানুষ যেন নিজের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়েছে । ক্লান্তি আর অবসাদে ঘেরা অভিজ্ঞ মানুষ । যে সব বুঝে-চেয়ে চেয়ে দেখছে, দুর্বৃত্তদের দূরাচার । আর সুমনের ভাষায় বলছে–

'আগুন দেখেছি আমি কত জানালায়
কত জানালায় তার মুখের আদল
কতো জানালায় ঝরে অকাল বাদল॥

কতো জানালার কাছে কতো চেনা নাম
কতো দেখা হাসি মুখ ভাসে অবিরাম
কতো জানালার কাছে একলা মানুষ
একলা পৃথিবী তার যেন মহাকাল
কতো জানলায় আসে একার সকাল॥

কতো জানলার কাছে রাখা পোস্টার
কতো কথা কতো ক্ষিদে কতো চিৎকার
কতো জানলার কাছে কাতারে কাতার
মানুষ জমেছে দাবী গরাদ ভাঙার
ভাঙে যেন জানলার গরাদ সবার॥'

এভাবে সমাজের নীতিবাদী মানুষ একটু ভালোর জন্য গুমরে ওঠে । চায় জেগে উঠুক নতুন করে, নবীন শতদল । কিন্তু তা হয় না । নবীনদের শিক্ষাব্যবস্থা, খেলাধূলা, বিনোদনের ভিতরে যে বীজ ঢুকিয়ে দেয়া হয়, তা বড়দের লোভী-চাতুর্যের অবকাঠামো । আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তাদের মুখে যেন না ফুটে ওঠে শোষকের অত্যাচারের কাহিনী । তাই ইতিহাসকে পাল্টে দেয়া হয় । এমনি একটি রূপক গান লিখেছেন, যেখানে লেখক নিজেই একজন গোপন গেরিলার মতো নবীন সমাজের মাঝে আর্ত, ক্ষত-বিক্ষত মানুষের প্রতিনিধি খুঁজে বেড়ান, গোপনে শোষকের মুখোশ পরে এসে ফাঁক-ফোকর দিয়ে জানান দিয়ে যান বাঙালির প্রকৃত দুরবস্থার কাহিনী । গানটি হলো–

'বাচ্চারা কেউ ঝামেলা করো না উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করো না
খেলা ছুটাছুটি বেয়াদবি সব চুপচাপ বসে থাকো
তোমাদের বড়ো আনন্দ আজ
বড়োদের তাই বেড়ে গেছে কাজ
জমে গেছে তোমাদের উৎসব বসে আঁকো॥

এঁকো না তোমার চেনা রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে ভরে বস্তায়
যে ছেলেটা রোজ একা চলে যায়, তার মুখ কদাকার

Dhaka University Institutional Repository

সেও কি কোথাও বসে ছবি আঁকে, কারা রঙ আর খাতা দেয় তাকে
এসব প্রশ্ন কখনো করো না বোবা কালা হয়ে থাকে
আমিও ভণ্ড অনেকের মতো গান দিয়ে ঢাকি জীবনের ক্ষত
তবুও বলি শোন দেখতে ভুলো না অন্য ছবিও আঁকো॥'

স্বাধীনতার পরও বিদেশী লোভীরা এদেশের সম্পদ চুরিতে এখনো ক্ষান্ত হয় নি। আবার স্বার্থলোভীরা সামান্য মূল্যে বিকিয়ে দিচ্ছে জাতীয় সম্পদকে। ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ যে এভাবেই হচ্ছে তারই ইঙ্গিত দিয়ে গান লিখেছেন অমল আকাশ। পালকী চলার সুরে লেখা গানটি হলো–

'হু-হুম-নাহো-হু-হুম-না
হু-হুম-নাহো-হু-হুম-না

সাদা সাদা চার বিহারা
মাথায় টুপি পায়ে বুটের
ভারী জুতো আমার গায়ের
লক্ষ্মী নিয়ে ঐ চলেছে
ঐ চলেছে, ঐ চলেছে।
কেউ দেখে না কেউ বোঝে না...'

বাংলাদেশে আদিবাসী বা নৃগোষ্ঠী ভাষা ও জাতিগত কারণেই অনেকটা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তারা এদেশেরই সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক। কিন্তু পাহাড়ি জীবনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্রের কারণে জীবন-যাপন আলাদা। সারকারী ভাবে ভোটাধিকার আছে, রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা আরোপের অধিকার আছে। কিন্তু তা হচ্ছে না বরং বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার থেকে। লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি জাতিই বিলীন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ২০০৩ সালের ৪ জুলাই নারায়ণগঞ্জের আলী আহম্মদ চুনকা পৌর মিলনায়তনে গণসংগীত বিষয়ক সেমিনার এবং সংগীতাসর বসে। সমগীত পরিবার তাদের বেশ ক'টি গান পরিবেশন করেন। তন্মধ্যে পাহাড়ী জীবনের বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে এই গানে–

'ঝর্ণার ছন্দে ঢাল বেয়ে নেমে আসে
দুরন্ত পাহাড়ী মেয়ে
পাহাড় পেরোবার প্রচণ্ড স্পর্ধা,
দৃঢ়তার-ই গান গেয়ে–
কামনা কান্তি খাওলাই কামনা কান্তি খাওলাই নিখাদ

হাজার বছরের বঞ্চিত জীবনের
লাঞ্ছিত স্বপন আর তৃষার্ত আবেগের

ক্ষুব্ধ শ্লোগান নিয়ে তাজিংডং পাহাড়ের
ঢাল বেয়ে নেমে আসে
দুরন্ত পাহাড়ী মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তার বুকের গভীরে গর্জে ওঠে–
আমি জিংতাংআই আমি জিংতাংআই আগদিন ।'

মানবতার মুক্তি ও হরণের কতো শত সহস্র বিষয় সামনে এসে দাঁড়ায় যখন একটি মানুষ তার সহজাত অধিকার নিয়ে বার বার ঘুরে দাঁড়াতে চায় । ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য লক্ষ মা-বোনকে মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম দিতে হয়েছে । কিন্তু আজো কি তারা মুক্ত? মানবিকতার কাছে তারা কতো ভাবেই না পরাস্ত । কোনো নিপীড়িত যৌনকর্মীর প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে যখন পত্রিকায় চোখ যায় । "একজন ফটোসাংবাদিক রমনা উদ্যানে ভ্রাম্যমান যৌন কর্মীদের ছবি তুলতে গেলে ক্যামেরা দেখে সবগুলো মেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু একটি মেয়ে হঠাৎ করে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায় । তারপর এক ঝটকায় তার গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে চিৎকার করে বলে, 'নেন, যত ইচ্ছা আমার ছবি তোলেন' । মেয়েটির সেদিনের সেই চিৎকার"[৩২] প্রমাণ করিয়ে দেয় সামাজিক অবস্থান নিয়ে সুশীল সমাজ যাই ভাবুক মানবিক অবস্থান তাদের কোথায় । এ বিষয়ে একটি গান–

'সন্ধে এলে এই শহরে উদোম বুকে ফুলকি ধরে
ও তুমি দশটি টাকা বাড়িয়ে দিলে
উরুর কাপড় দিতে পারি তোমার হাতে ।
ও বাবু আর দশটি টাকা বাড়িয়ে দাও
উরুর কাপড় তুলে দেবো তোমার হাতে ।
মাংস আছে, আছে আমার বুকে
মাংস আছে, আছে আমার ঠোঁটে
মাংস আছে ভাঁজে ভাঁজে
মন্দ নয় তো চেখেই দেখো
দশটি টাকায় বিকিয়ে দেব ।'

উগ্র ধর্মানুভূতি আর লোভ-পাশবিকতা-দাঙ্গা কিংবা ধর্ষনের মতো নৃশংস উপাখ্যান বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে । শক্তিমান দুর্বলকে, সংখ্যাধিক সংখ্যালঘুকে, ধনি গরীবকে, রাজা প্রজাকে শোষনই নিত্য ঘটনা । এমনি একটি নৃশংস প্রতিবেদন তুলে ধরা যায় "বাগেরহাটের কোমরপুর । ৯ মার্চ ২০০৩ । গভীর রাতে ঠাকুর বাড়ির কর্তা নিরঞ্জন ভট্টাচার্যকে হত্যাকল্পে হামলে পড়ে পনেরজন পাষণ্ড বর্বর । কিন্তু নিরঞ্জনকে পাওয়া গেল না সেই রাতে । তাতে কি! ওরা বড় ভাইয়ের বদলা ছোট ভাই তপন ভট্টকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলো । ঘটনাটি এখানেই শেষ নয়, ওরা বাড়ির দু'দুটি জোয়ান বউ, বউয়ের মাকে ধর্ষণ করলো পালাক্রমে । অপরাধ–ওরা সংখ্যালঘু–ওরা ভোট দিয়েছিলো । নিহত তপনের কিশোরী বউ মাত্র সপ্তাহখানেক আগে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেছিল । তার সেলাই ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্তে রক্তে ভেসে যায় শাড়ি, শাড়ির আঁচল বেয়ে বাড়ির উঠান–মাঠ আমাদের হাঁটবার পথে পথে পুরোটা বাংলাদেশ ।"[৩৩] মাথা হেট হয়ে আসা হাহাকারের বন্দনা ওঠে অমল আকাশের গানে–

'ঠাকুরবাড়ির বউ গো ঠাকুরবাড়ির বউ
জানলো না তো কেউ
তোর কাঁচা জঠর ছিঁড়ে ঝরলো কতো লউ ।

তুলসিতলার অন্ধকারে কান্দে হাহাকার

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙা শাঁখার চিতায় পোড়ে সোনার সংসার
দশদিকে ফণা তোলে পাষণ্ড পাষাণ
কোন দেশে আছে পাখি পাখার আসমান ।..'

জরায়ু রক্ত কান্নায় ভেজা শাড়ি
বধূ তুলে দিয়েছিলো জানোয়ারে
'দোহাই, তবু সিঁথির লালটুকু আমার মুইছে নিও না ।'

এ কোন লজ্জার বানে ভাসে গো বেহুলা বাংলায়?'

১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে পুলিশ সম্প্রদায়ের হাতে ধর্ষিত হয় দিনাজপুরের ১৬ বছরের তরুণী ইয়াসমিন। অরূপ রাহীর একটি গানে সেই নির্মম বেদনাহত কাহিনী ইয়াসমিনের আত্মজীবনীর আকারে উঠে এসেছে–

'শপথ জবানের আমার নাম শুধায়ো না
আমি এই শহরেই থাকি, আর ঐ গাঁয়েরই ঠিকানা ।...
কোরবানীতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে
তোমার মুখে রক্তনদীর জোয়ার লেগেছে
এই খুনের মহিমায়
আবার তোমায় চেনা হল, হল পরিচয়;
এবার আঅোয় ভরুক দিন...
নিবাস দিনাজপুর, আমার নাম ইয়াসমিন ।'

এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে তেল ক্ষেত্র, মঙ্গা, গার্মেন্টস শ্রমিক, পাট কল এবং ফুলবাড়ী, কানসাট ইস্যু নিয়েও শ্রমিকদের কিছু কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান কালে সমাজ সচেতনতা নিয়ে আরো বেশ কয়েকজন গীতিকারের নাম উল্লেখযোগ্য বিশেষ করে মাহমুদুজ্জামান বাবু, কৃষ্ণকলি, শুভ, রাজিব, মুকুলের গান বর্তমান প্রজন্মকে গণচেতনায় উজ্জীবিত করেছে।

স্বাধীনতার আগেই বিদেশী জনপ্রিয় ধারার গানের প্রভাব এদেশে এসে পড়ে। বিদেশী সুরের আমদানী প্রধানত চলচ্চিত্র থেকে এবং দ্বিতীয় গণসংগীত রচনার পর সুর হিসেবে আন্তর্জাতিকতা বোধ জাগরণ। এরই ধারাবাহিকতায় এবং ইউরোপ আমেরিকার কিছু প্রগতিশীল গানের দলের আবির্ভাব বিশ্ব কাঁপিয়ে বাংলাদেশেও তার হাওয়া এসে লাগে। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আয়োলাইটস'। পরবর্তীতে 'র‍্যাম্বলিংস', 'লাইটনিংস', 'স্পন্দন' ইত্যাদি ব্যান্ডদল বিদেশী পপ, রক, জ্যাজ-এর বাংলায় রূপান্তরের চেষ্টা করলেও কেউ সেভাবে গ্রহণ করেনি। স্বাধীনতার পর দেখা যায় তার উল্টো। একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে নতুন নতুন ব্যান্ড দল। তাদের গানে গণমানুষের কথা বা রাজনৈতিক দর্শনগত বিষয় না থাকলেও প্রধানত রোমান্টিক ও দেশগানের প্রাবল্য বাংলা গানের ধারাকে নতুন মাত্রায় অভিসিক্ত করে। তৈরী হয় 'উচ্চারণ' ১৯৭২ সালে 'সোলস', ১৯৭৬ সালে 'ফিডব্যাক', এভাবে 'মাইলস' (১৯৭৯), 'রেনেসাঁ' (১৯৮৫), 'চাইম' (১৯৮৬), 'এলআরবি' (১৯৯০), 'আর্ক' (১৯৯১), 'ঢাকা' (১৯৯৭)সহ পরবর্তীতে অসংখ্য ব্যান্ড দলের প্রতিষ্ঠা পায়। কিছু কিছু ব্যান্ড স্বাধীনতা চেতনা ও দেশপ্রেম নিয়ে উঠে আসে, যাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যান্ডগায়কের নাম উল্লেখযোগ্য যেমন আজম খান,

Dhaka University Institutional Repository

আলম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ, ফিরোজ সাঁই, ফকির আলমগীর, মাকসুদ, জেম্‌স, নকীব, পার্থ বড়ুয়ার নাম জনপ্রিয়তা পায়। গণসংগীতে আদর্শগত বিচার না করে যদি সমষ্টি বা বৃন্দগান হিসেবে মূল্যায়ন করা যায় তবে ব্যান্ড-এর অবদান কম নয়। তাছাড়া গণসংগীতের হাত ধরেই বাংলা গানে সরাসরি বিদেশী সুরের আবির্ভাব ঘটে। বিদেশী যেসব প্রতিবাদী শিল্পীর প্রভাব বাংলা ব্যান্ডে পড়েছে, তারা গণমুখী গানের মানুষদেরকেও প্রভাবিত করেছে, তন্মধ্যে হ্যারি বেলাফন্টে, বব ডিলান, জন লেনন, জিম মরিসন, হ্যানস আইসলার, ক্রিস ডি বার্গ, বব মার্লে, জোয়ান বায়েজ প্রমুখ।

গণসংগীত আন্দোলনের সাথে অথবা পার্টিলাইনের বাইরে থেকেও উপরোক্ত গানকে গণসংগীত বলা যাবে কি না এপ্রসঙ্গে অনেকের দ্বিমত আছে। পশ্চিমবঙ্গের গণশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অন্যতম শিষ্য মুরারি রায়চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মতামত দেন এভাবে যে–"ভালবাসাই মূল কথা। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভালবাসা নিয়ে গানের কথা একান্ত প্রয়োজন। ভনিতা বা ভান নয়, ভালবাসার মধ্যেই আছে সব কিছু। এমন গানের কথা হবে যা শুধুমাত্র জ্ঞান দেওয়া নয়, আরো কিছু। যা প্রয়োজনে আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানেও সে কথার কবিতা বা গান করা যাবে। যা শুধুই মিছিলে মিটিং-এ সীমাবদ্ধ নয়, সর্বক্ষেত্রেই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলবে। সুখে, দুঃখে, আনন্দে, সংগ্রামে, প্রতিবাদে যা জীবনের কথা বলবে। এ ধরণের গানের কথা নিয়ে গান নিয়ে কিন্তু আছে, যা গণসংগীত হয়ে নয়, আধুনিক বা জীবনের গান নাম নিয়ে বা জীবন মুখী নামে প্রচলিত। সে ধরণের কিছু কিছু গানতো ভালই, অনেক সহজ সরল ভাবে সত্যি কথা, সমাজ জীবনের কথা সে গানে আছে। সে গানও তো গণসংগীত, মানুষের গান।"[৩৪]

পশ্চিমবঙ্গের কিছু গান যা গণনাট্য সংঘ কর্তৃক পরিবেশিত নব্বই দশকে প্রায় ৮০ টি গানের উল্লেখ দেখা যায় যা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই শতাধিক শাখার মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, যে সকল শাখা সংগঠন বেশ প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের অংশীদার, তন্মধ্যে লোক ও লোকশিল্পী শাখা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা), শিবপুর (হাওড়া) শাখা, মুক্তধারা (পূর্ব মেদিনীপুর), উত্তর হাওড়া, কিন্নর শাখা (উত্তর চব্বিশ পরগণা), সালার শাখা (মুর্শিদাবাদ), বারুইপুর শাখা, ধামুয়া শাখা, তারকেশ্বর গণমঞ্চ (হুগলি), সাম্প্রতিক শাখা (উত্তর চব্বিশ পরগণা), অনির্বাণ শাখা (হুগলি), অঙ্গীকার শাখা (কলকাতা), নান্দনিক শাখা (হুগলি), সাগ্নিক শাখা (উত্তর চব্বিশ পরগণা), শতদল শাখা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা), ভিষ্টর জারা শাখা (বীরভূম), উত্তরণ শাখা জয়পুর (বাঁকুড়া), খড়দহ শাখা, প্রতীক শাখা, বর্ধমান শাখা, জলপাইগুড়ি শাখা, অরুণিম শাখা, রুদ্রবীণা শাখা অন্যতম। নিম্নরূপ এই সকল শাখার মধ্যে যে গানগুলো নব্বই দশকের মধ্যে এবং তারও পরে গীত হয়েছে তার থেকে কয়েকটি গান বিষয়ভিত্তিক বিবেচনায় তুলে ধরা হলো।

মারণাস্ত্র এ্যাটমবোমার শক্তিই যেন রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি। মানবিকতা প্রকৃতির থেকে আহরিত অবারিত সম্পদ থেকেও যা মূল্যবান। হত্যাপ্রবণ, যুদ্ধপ্রবণ, আগ্রাসনের চরিত্রই এই এ্যাটমিক অর্জন যা মানবিকতাকে গ্রাস করেছে, সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। ভিয়েতনাম, জাপান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরানসহ অসংখ্য সভ্যতার অনেকটাই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিখ্যাত যাদুঘর এবং গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও কম নয়। বিজ্ঞানের অশেষ দানকে যে মানুষেরা করে তুলেছে অভিশাপের কুরুক্ষেত্র, তা তো আর মেনে নেয়া যায় না। দিলীপ সেনগুপ্ত তাই লিখেছেন–

'মোরা নতুন পৃথিবী গড়বো

Dhaka University Institutional Repository

যেথা মারণ অস্ত্র হবে না গড়া
হাজারো সূর্য গড়ব॥

যেথা শিশুর কলতানে জীবনেরই প্লাবন আনে
যেথা মাটির বন্ধ্যা প্রাণে শ্যামলিমার পরশ আনে
সেই পৃথিবী গড়তে মোরা
মজুর কিসান হাত ধরব॥'

নব্বই দশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর লেলিনের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়[৩৫]। যে ব্যক্তি মার্কসবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন, সেই ইতিহাসের মহানায়ক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন তার মূর্তি যেন কোনো মূর্তি নয়, এতো সর্বহারা মানুষের মুক্তির প্রতীক। ভাঙনের যোগসূত্রতা যে সেইসব সাম্রাজ্যবাদীদেরই কাজ, একটি আশ্রয়কে নিপাত করে শোষণের রাস্তা প্রশস্তই করা হলো, ঠিক সেই উপলব্ধি থেকে কঙ্কন ভট্টাচার্যের লেখা–

'ও লেনিন, ফেলাই দিছে ওরা তোমায় আস্তাকুঁড়ের ঠাঁয়
লাগে বড় ব্যথা কেন আমাদেরই গায়
ও লেনিন খাড়াই ছিলা টিলার পরে রৌদ্র বাদল সয়ে
ছাতা মাথায় নাইকো তবু সবার ছাতা হয়ে
কেউবা তোমায় চিনলো নাকো কেউবা চিনেও বুঝলো না
কেউবা তোমায় ভালবেসে সইল মরণ যন্ত্রনা
তবে কি মানুষ চেনার পালা তোমার আজো না শেষ হয়॥

রত্না ভট্টাচার্য জীবন সংগ্রামের প্রান্তে এসে দেখেন আসলে কিছুই পাওয়া হয় নি। তবু ইচ্ছাটাতো বেঁচে থাকতেই হবে। তিনি সেই ইচ্ছার দৃঢ়তাকে প্রত্যয়ের আসনে তুলে বলেন–

'আকাশের বুক চিরে, পৃথিবীর বুক ভরে
সূর্যটা আলো দিক–এ আমার ইচ্ছা।...
জীবনের সংগ্রামে, অসংখ্য না পাওয়ার
পাহাড়টা ভেঙে যাক–এ আমার ইচ্ছা॥
আলোটাকে ডেকে এনে জীবনের আঁধারে
সব কালো মুছে দিক–এ আমার ইচ্ছা।
কতযুগ হাহাকারে শূন্য কলসি গুলি
ফ্যানায় ভরে যাক–এ আমার ইচ্ছা॥'

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মূর্তি, লেনিন স্মরণী, মস্কো।

যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে, এখানে প্রকৃতি–আকাশ–বাতাস–নদী–মাটি এমনকি কৃষক পর্যন্ত সবার জন্য নিজেকে উদার ভাবে উজার করে দিয়েছে পরসেবায়, আত্মবিসর্জন দিয়ে। কিন্তু মানুষ এই পরিবেশের প্রতি মমতা তো দেখায়ই না, বরং ছোট ছোট লোভে ধ্বংস করে দেয়। যদি অভিমানে

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা ক্ষোভে প্রকৃতি মানুষের সাথে এই আচরণ করতো তাহলে কি হতো। এই জিজ্ঞাসা নিয়ে অসাধারণ একটি গান লিখেছেন অমল নায়েক–

'যদি সূর্যটা কোনোদিন রেগে বলে
বহুযুগ দিয়েছি তো আলো উত্তাপ
তোমরাতো ভাগ নিতে পার নি
আমি নিভে যাবো
কী ঘটতে পারে শুধু একটু ভাবো॥

যদি জল বলে, নদীনালা ভূতলে সাগরে
আমিতো প্রবহমান জীবন সুধা
তোমরা তো ভাগ করে নিতে পার নি
আমি ডুবে যাবো
কী ঘটতে পারো শুধু একবার ভাবো॥'

দুইবাংলার জাতিসত্তার মিল ও মমতা নিয়ে একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্ম কিংবা জাতির বিচারে যে একটি দেশ দ্বিখণ্ডিত হতে পারে না। সেখানে একটি ভাষাগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট অবস্থান থাকতে হয়, আমাদের দেশভাগ হয়েছে ভাষাভাষী অঞ্চলের আনুগত্যকে বিবেচনায় না এনে একটি প্রহসনমূলক উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে। এক মায়ের পেট চিরে উত্তরাধিকার পাওনার মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বাংলা একটি ভাষা, এই ভাষাভাষী মানুষের মনের ঐক্যকে তো আর কেউ ভেঙে ফেলতে পারে না। সেই উপলব্ধির আলোকে লেখক মধু গোস্বামীর লেখা একটি গান–

'আমার বাংলা ঢাকায় থাকে
একই বাংলা কলকাতায়
একই আকাশ মাথায় নিয়ে
শ্রাবণ ধারায় মন মাতায়॥

জালালাবাদ ধর্মতলায় সকাল সন্ধে দেয় পাড়ি
বাস খোঁজে না চায় না বিমান
চড়তে চায় না রেলগাড়ি
নাচোল এবং কাকদ্বীপেতে
আমার বাংলা বুক তাতায়॥

লালন ফকির রবীন্দ্রনাথ
মুকুন্দদাস নজরুলের–
আমার বাংলা আমার বাংলা
পৌষালী ধান কাশফুলের–
আমার বাংলা কানহো সিধোর
মাতঙ্গিনী হাজরাদের
আমার বাংলা প্রীতিলতার
আমার বাংলা বরকতের

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গা থেকে আমার বাংলা
উজান বেয়ে পদ্মা যায়॥'

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ভাষা আন্দোলনের শহীদ ও ভাষা অধিকার বিবেচনায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে ঘোষণা করে।[৩৬] বিশ্বের প্রায় ৬০০০ ভাষা গোষ্ঠী নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এই দিনটি আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্যদিয়ে। সে উপলক্ষে দেবীদাস তরফদার রচনা করেন–

'মুখটি তোলো মাগো আমার মিষ্টি মা আমার
তোমার রফিক, সালাম, বরকতেরা মাতালো সংসার॥

তোমার গালে বৃষ্টি, চোখে পুকুর সাথে জয়ের হাসি
তাই নিয়ে আজ গান ধরেছে নানান ভাষাভাষী
আকাশ জুড়ে এ এক নবীন প্রভাতী ঝংকার॥

তোমার ছেলের বুকের রক্ত আভায় রাঙলো যে আসমান
আঁধার খোঁজে গভীর আঁধার পেয়েছে ফরমান
দিগ্‌বিদিকে উড়ছে স্নেহের আঁচলটি তোমার॥

সরিয়ে দিয়ে পাথর, মনের ভাব ছুটেছে ধেয়ে
নেমেছে ঢল নদীর বুকে মুক্তির স্বাদ পেয়ে॥

(সবার) ভাষা পেল নতুন ভাষা কথা নতুন কথা
মান অভিমান ফেলছে ভেঙে তাড়িয়ে মনের ব্যথা
আরও জয় যে সামনে, দেখো কাটছে গো আঁধার॥'

এর বাইরেও আরো অসংখ্য গণসংগীতের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তা গণনাট্য সংঘের নিজস্ব গীত নয়। ব্যক্তিগত আবার কখনো আরো অসংখ্য গণসংগীত সংগঠনের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের, মুরারি রায়চৌধুরী, অজিত পান্ডে এমন অনেকের গানই পাওয়া যায় দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখার মতো।

বাংলাগান যে সত্যিই বাঁক ফিরিয়েছে কোনো এক নতুন ভাষা-ভঙ্গি, চিন্তা ও দর্শনের দিকে, নানা বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে তা এগুচ্ছে। এই গানগুলো গণসংগীত বলা যাবে কি না, তা হয়তো বিচার্য হবে পূর্বকালের প্রতিষ্ঠিত মতের উপর ভিত্তি করে। তবে গণসংগীত সৃষ্টির পেছনে যে এক টানাপোড়েন থাকে অর্থাৎ শস্তাদরের ব্যবসাদারী গানের বাজারে ভালো গানের আকাল সবসময়ই থাকে, এটাও সত্য যে ভালো দু'একটি গান তা ঐ ভিড়ে হারিয়ে যাক বা না যাক, গণমানুষকে যে কোনো ভাবেই নাড়া দেয় চেতনায়, সাড়া দেয় প্রত্যয়ের পথে। সেই গানগুলোর মতো এই গানের জন্ম। এখনো ব্যবসাদারী গানের সংখ্যা হাজারে হাজার। প্রতিদিনই দুইচার ডজন গান বাংলা গানে সংযোগ হচ্ছে কিন্তু তার চরিত্রের কারণেই দু'এক সপ্তাহ পর হারিয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত গানগুলো সেই সব গান থেকে আলাদা। বিশেষত কোনো অধিকার আদায়ের মিছিলে, প্রতিবাদে, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার আসরে এইগানগুলোই অধিক সমাদর পায়। সেই বিচারে গণচেতনায় শান দেয়ার মতো উদ্দীপনা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে ২৮শে মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামে প্রচারিত হয়। এই নামে অনুষ্ঠান প্রচার করেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বেলাল মোহাম্মদ। ২৭শে মার্চ রাত্রির অধিবেশন থেকে লে. শমসের মোবিনের প্রস্তাবক্রমে 'বিপ্লবী' নামটি বাদ দেয়া হয়।
সেলিম রেজা সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮ এবং ৫৭

২ ফকির আলমগীর, *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান*, অনন্যা ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৫

৩ এম আর আখতার মুকুলের প্রবন্ধ: স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি, সেলিম রেজা সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, পৃ. ১২

৪ আবদুশ শাকুর, *বাঙালির মুক্তির গান*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ১৩০

৫ আবুল কাশেম সন্দ্বীপের ভাষ্যমতে ১০ জন ট্রান্সমিটারটি তুলে নিয়ে যান, যাদের প্রত্যেকেই ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। সেখানে সুব্রত বড়ুয়ার উল্লেখ নেই তবে পরবর্তীকালে ২৮ মে '৭১ থেকে তিনি বার্তা বিভাগে কাজ শুরু করেন। তবে মাইক্রোবাস চালক এনামের নামটিও সাহসীদের কাতারে উল্লেখযোগ্য হ'তে পারতো।
সেলিম রেজা সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, পৃ. ৪৬-৪৭

৬ শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, *গণসঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ৯০-৯১

৭ এম আর আখতার মুকুল,প্রবন্ধ: স্বাধীন বাংলা বেতারের ধ্বনি, সেলিম রেজা সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, পৃ.১৮-১৯

৮ গানগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, সাক্ষাৎকার ও গণশিল্পীদের স্বকণ্ঠে গীত অডিও ধারণের মাধ্যমে। গণশিল্পী সেলিম মাহমুদ বেশিরভাগ গানের তথ্য দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের দলিল অবলম্বনে।

৯ তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ পরিচালিত, *মুক্তির গান*, একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী

১০ হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *আলতাফ মাহমুদ*, বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউস, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৬২

১১ জীবনের গান গাই, শেখ লুতফর রহমান, পৃ. ৮৭

১২ তাসাদ্দক আহমদ, *গম্ভীরা গান : বিষয়গত বিভাজন (ফোকলোর সংকলন : ৬৭)*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯

১৩ নান্টু রায় সম্পাদিত *ভারত বিচিত্রা*, প্রবন্ধ: ড. দুলাল ভৌমিকের লেখা 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান' ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ১৮

১৪ মতিউর রহমানের *প্রবন্ধ ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববরেণ্য শিল্পীসমাজ*, সেলিম রেজা সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, পৃ. ৪১

১৫ 'মুনীর উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর (১৯৭২-৭৫)*, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ৩৩' এবং সাইদ-উর রহমান, *সংস্কৃতি সংগ্রাম*, মোতাহার হোসেন সুফী সম্পাদিত, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ১১

১৬ শেখ লুতফর রহমান, *জীবনের গান গাই*, সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৮৮-৮৯

১৭ তাসাদ্দক আহমদ, *গম্ভীরা গান : বিষয়গত বিভাজন (ফোকলোর সংকলন : ৬৭)*, পৃ. ৪০

১৮ মামুনুর রশীদের লেখা *ঢাকা থিয়েটারের নাট্যচর্চা*, *সচিত্র সন্ধানী*, এপ্রিল ১৯৮৩-এর উদ্ধৃতি অবলম্বনে 'সাঈদ-উর-রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-৮২, অনন্যা, ঢাকা ২০০১, পৃ. ৭৮

১৯ ১৯৭৮ সালে সালের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিল বলে "১২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।" অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি থেকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, সংঘ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, পৃ. ৬

২০ 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ৩০ নং আইন)-এর ২ ধারাবলে ২ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, সংঘ প্রকাশন, পৃ. ৩

২১ অজয় রায়, *গণআন্দোলনের নয় বছর (১৯৮২-৯০)*, মুক্তধারা, ১৯৯১, পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

২২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে*, *রচনা সমগ্র ৩*, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২১৩

২৩ শফিকুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত রচয়িতা মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালীর (শফি বাঙালী) স্বকণ্ঠে গীত ক্যাসেট থেকে অনুসৃত।

২৪ গানটি উদীচী কেন্দ্রীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ সেলিম কর্তৃক সংগৃহীত

২৫ জাতীয় কবিতা পরিষদ ১৯৮৭ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি প্রগতিশীল কবিতার অঙ্গিকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কবি বেগম সুফিয়া কামালের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে এই সংগঠন যাত্রা শুরু করে এবং প্রতিবছর ১ ও ২রা ফেব্রুয়ারি কবিতা উৎসব আয়োজনে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়। প্রতি বছরেই দেশের মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে একটি শ্লোগান এবং উৎসব সংগীত রচনা করা হয়। এরকম ২২টি উৎসব সংগীত রচিত হয়েছে যার মধ্যে গণচেনতার উপাদান বিদ্যমান।

২৬ গানটি ভাটির চিঠি গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া। এতে মারফতি সুরের প্রভাব রয়েছে এবং একটি মারফতি গানের অনুসরণে রচিত বলে অনুমান করা যায়। গানটি হলো–'ও বা হকির মোল্লাজী/ ঝুল্লার মাঝে উন্দুরে কাটছে তকিত রাখ্ছনি। চাটি কাটছে পাটি কাটছে/ কাটছে উড়ার বান/ মণি পুরে গিয়া কাটছে/ মোকাম চাইর খান।'
খালেদ চৌধুরী, *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ২০০৪, পৃ. ১১৪

২৭ ২২ জানুয়ারি ২০০৮ এর রাত ৯ টায় 'এনটিভি সাময়িকী' অনুষ্ঠানে বলা হয়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রের জরিপে দেখা গেছে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশে ১২,৪৮২ প্রজাতির নিজস্ব বীজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যার অনেক প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত। মনসানটো, সিনজেনটা বা কারগীলের মতো কোম্পানীরা হাইব্রীড প্রযুক্তিকে তৃতীয় বিশ্বে এনে পরিণামে দেশজ বীজকে লুপ্ত করার মাধ্যমে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে উর্বরা শক্তিকে বিনাশ করে দিচ্ছে। ফলে প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর দেশগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে তার নিজস্ব শক্তি। বহুজাতিক কোম্পানীরা এভাবে বৃক্ষবীজ নিধনের মধ্যদিয়ে প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাণবীজকেই হরণ করছে। জ্ঞানবীজকে করছে সীমাবদ্ধ, প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা না নিয়ে তারা বহুজাতিক কোম্পানীর কাছে যাতে শিক্ষা নেয়, তারই পথ সুগম করছে। উপস্থাপন–আজফার হোসেন, আলোচনা–পার্থ তানভীর, প্রযোজনা–আলফ্রেড খোকন।

২৮ শুভেন্দু দাশগুপ্ত, *এবং জলার্ক 'যুদ্ধ জয়ের গান'* সংখ্যা, সম্পাদনা স্বপন অধিকারী, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৮৩১

২৯ কফিল আহমেদ, *ধাবমান*,একটি সাহিত্য আন্দোলনের ছোট কাগজ, সম্পাদক আবীর পরশ, নারায়ণগঞ্জ ২০০১, পৃ. ২৮

৩০ রাজীব নূর, *বাংলা গানের মাত্রা ও গানের মাল্লারা*, *নন্দন সাহিত্য পত্রিকা*, সম্পাদক আলফ্রেড খোকন, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৫৩

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩২ পতিত সংগীত, *সমগীত সংস্কৃতি প্রাঙ্গণের সংকলন*, নারায়ণগঞ্জ, জুলাই ২০০৩

৩৩ বাংলা আমার মা, প্রাগুক্ত

৩৪ মুরারি রায়চৌধুরীর স্বহস্তে প্রদত্ত একটি প্রবন্ধ, *প্রসঙ্গ গণসংগীত*, গণ আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, কলকাতা, পৃ. ১২৩

৩৫ When the Soviet Union collapsed in 1991, Lenin statues were pushed over and beheaded as a symbol of the society's new openness. (That means in the countries occupied by the Russians). In Russia Lenin statues are however still a common sight. Most cities have at least one statue of Lenin and it is usually placed at Lenin square at the most central location. Small towns (up to 20 000 inhabitants) usually have an ugly low budget version or a bust instead.
Anders Thorsell, *internet by google*, Sundsvall, Sweden,

৩৬ 21 February was proclaimed the International Mother Language Day by UNESCO on 17 November 1999. International Mother Language Day is observed yearly by

Dhaka University Institutional Repository

UNESCO member states and at its headquarters to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism. This is mostly the international recognition of Language Movement Day, which has been commemorated in Bangladesh (formerly East Pakistan) since 1952, when 07 Bengali-speaking people were killed by the Bengal police and army in Dhaka.
International mother language day,*Wikipedia, the free online encyclopedia,* Wikimedia Foundation, Inc

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুরবৈচিত্র্য

বাংলাদেশের গণসংগীত (স্বাধীনতা ও পরবর্তীকাল)

ভূমিকা

বিপ্লব যখন অনিবার্য, সাধারণ উদ্দীপনামূলক বা দেশাত্ববোধক গানও তখন গণজোয়ারের প্রেরণায় উছলে ওঠে। স্বাধীন বাংলা বেতারে পরিবেশিত গান তারই উপযুক্ত উদাহরণ। চল্লিশ দশকের গণসংগীত তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ পঞ্চগীতিকবির দেশাত্ববোধক গান মুক্তির আন্দোলনে গণজাগরণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তা বিষয় কিংবা সুর উভয়ের আকর্ষণেই। একইভাবে জারিগান, বাউলগান, গম্ভীরাসহ বিভিন্ন লোকসংগীত মুক্তিসেনা ও স্বাধীনতাকামী মানুষকে প্রবলভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেতনা সৃষ্টি করেছিল। শরণার্থী শিবিরের মানুষকে শত মৃত্যুর ছোবল উপেক্ষা করে, মুক্ত-স্বদেশ গড়ার বাসনায় দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। এতে বোঝা যায় গণসংগীত যেমন কখনো ঝিমিয়ে পড়ে সময়ের বন্দিত্বে, আবার অতি সাধারণ গানও বিষয়ের জোরে গণমুখীনতার হিত-সাধন করে। অতএব গণসংগীতের উৎকৃষ্টময়তা সময়ের তাৎপর্যের উপর নির্ধারিত। আর সুরকে কোনো দশকে বন্দী করা সম্ভব নয়। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন ভাষার সাধারণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, সুরও তেমনি সময়ের হাওয়ায় রং বদল করে। এরকম সাধারণ প্রবণতা ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তীকালের গানের ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্রে সুরবৈচিত্র্যের নতুনত্ব উদ্ভাবন করা দুরুহ। এসময়ে অসংখ্য নতুন গান রচনা করা হয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশকে মুক্ত করা। মুক্তির জন্য অপার সাহসিকতা সৃষ্টি, প্রার্থনা, শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিজয়ী বীরদের পরিজন হারানোর হাহাকার এবং তাদের প্রতি সমবেদনা জানানোর প্রয়োজন ছিল। তাই যেভাবেই লেখা হোক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রসহ ক্যাম্পে ক্যাম্পে অজস্রবার গীত হবার ফলে গানগুলো নিপীড়িত-নির্যাতিত অসহায় মানুষের জপমালা হয়ে উঠেছিল। ফলে সুর যা হয়েছে সরল জীবনের সুর–বুকের করুণ বেদনার সুর–মর্মের সুর, একে কাঠামো বা ব্যাকরণ দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা অবান্তর। গ্রামীণ লোক-জীবনের ভাটিয়ালি-রাখালী সুর যেমন বিশেষ ব্যাকরণে বাধা যায় না, উজ্জীবনের সুর–স্বতঃস্ফূর্ততার সুর ব্যাকরণ দিয়ে ঠিক তেমনি নির্ণয় করা কঠিন।

স্বাধীনতা ও পরবর্তীকালীন গণসংগীতের সুর প্রধানত '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং স্বাধিকার আন্দোলনের সুরাবহের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গণসংগীতের ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের গান, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ সাল আইয়ুব খানের (১৯০৭-১৯৭৪) সামরিক আইন চালুর পূর্ব পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের গানে বিভিন্ন সুরের মিশ্রণ এবং রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধকরণ (১৯৬২) নিয়ে আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৭০) পর্যন্ত সুর ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহে মিশেছে। সামরিক শাসনের সময়ে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় সে সময়ে কোনো গান রচি বা পরিবেশিত হয় নি। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে বাঙালি প্রবল বিক্রমে গর্জে ওঠে। এসময়ের বাংলা গান বা গণসংগীতের ভাষা ও সুর ছিল অন্য যে কোনো সময়ের থেকে স্বতন্ত্র, বিপ্লবী এবং প্রত্যক্ষ। ফলে এর প্রভাবই মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

গানকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাছাড়া মুক্তির গান বলতে ভালো গান বা মন্দ গান এমন কোনো বিচার্যের উপায়ান্তর ছিল না। সময়ও ছিলো না গানের নান্দনিকতা বা সৌকর্য নিয়ে ভাববার, যে গান মানুষকে সরাসরি অস্ত্রের ন্যায়, বুলেটের ন্যায় শক্তি জোগাতে পারে, তাই করা হয়েছে। ফলে স্বতঃস্ফূর্ততার এমন এক নজির স্থাপন করেছিল সেই গানগুলো, যা আজও অবধি সমান সর্বজনপ্রিয়তার কারণ হয়ে আছে।

১৯৭৪ সালে থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত আবার থিতিয়ে যায় গণসংগীত। রাজনৈতিক কলুষতা, সামরিক শাসন, দুর্বৃত্তায়ন, জুলুম, লুট, ছিনতাই, সাম্প্রদায়িকতা, খুন, আইনের যথেচ্ছাচারসহ নানা বিশৃঙ্খলায় দেশ তো নয়ই গণসংগীতও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালে এরশাদ শাহীর (রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৮২-১৯৯০) স্বৈরাচার পতন আন্দোলন পর্যন্ত উত্তাল জনতার মাঝে অসংখ্য গণসংগীত তাৎক্ষণিকভাবে গীত ও রচিত হয়েছে। যা পূর্ব-পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এরপর নাগরিক জীবনের উচ্চতর বিকাশের ধ্যান ধারণায় বাংলাগানের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সুরের নতুনত্ব লক্ষ করা যায়; যাকে নাগরিক চেতনার প্রকাশ, জীবন মুখীনতা, নতুন ধারার গান, অন্য ধারার গান, নগর বাউল, জীবন চেতনার গান ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়।

দীর্ঘ সময়ের অতিক্রান্ত পথে, সভ্যতার বিবর্তনে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের নানা ভাঙন-গড়ন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার অপতৎপরতার ভিতরে আজ বিশ্বসংগীতের কাঠগড়ায় গণসংগীতকে দাঁড় করালে দেখা যায় এক ব্যাপ্তিময় ভাবাদর্শ নিয়ে বৃহৎ অথচ স্বতন্ত্র দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে এই ধারা। যার উদ্ভব শোষক আর শোষিত শব্দদ্বয়ের আবিষ্কারের সময় থেকেই। যেখানে হাজার বছর আগে চর্যাপদের মধ্যে প্রতিবাদ ও জনগণের অধিকারের বাণী প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাঠামো বা অবয়বের সংজ্ঞার্থ নিয়ে হয়তো দাঁড়িয়েছে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকে। পৃথিবীতে শোষক–শোষিতের সমন্বয় যতদিন না ঘটবে ততদিন গণসংগীত থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গণসংগীত যুগে যুগে তার চরিত্র, ভাষা, আঙ্গিক ও সুর বদলাবে এটাও সত্য। চল্লিশ দশকের গণসংগীত একটি বিপ্লব মাত্র, তা Conceptually উন্নীত হয়েছে আন্তর্জাতিকতা ও সাম্যবাদের জয়গান গেয়ে। আর সুরের দিক থেকে বিচার করলে বৃন্দ পরিবেশনা ও ঝোঁক দিয়ে প্রতিবাদী করে তোলার মতো ঘটনা ছাড়া স্বতন্ত্র বলতে কিছু নেই। সবই প্রকৃতির থেকে বেড়ে ওঠা সহস্র বছরের সুরেরই আদল, যা স্বাধীনতা পূর্বকালের সুরবৈচিত্র্যে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুরের পরিবর্তন যা হয়েছে, আধুনিকতার উপযোগিতাকে জিইয়ে রাখামাত্র। সুরের পরিবর্তন, গ্রহণ-বর্জন যা হয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই। গণনাট্য সংঘের জোয়ারের সময় বা ভাষা-আন্দোলনের সময় যে উত্তাল জাগরণের গান লেখা হয়েছে–ঠিক একই প্রণোদনায় মুক্তি ও বিজয়ের গান লেখা। কোনো বিপ্লবী ঘটনা ও আন্দোলনে সফলতার পর স্থির বা সুস্থির সময়ে চিন্তার জাগৃতি ঘটে যে গানগুলোর মান কতটুকু? এসব বিচার বিবেচনা ঘুরপাক খায় অন্যান্য সংগীতের ন্যায় জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু গণসংগীতকে জনপ্রিয়তার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা অন্যায়। যদিও কোনটি 'গণ' আর কোনটি 'গণ' নয় তা সংজ্ঞার্থের আলোকেই বিচার করে বিজ্ঞজনেরা। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো অবকাশ থাকে না। অতএব দেখা যায় ভালো অনেক গণসংগীতই কোনো সিদ্ধ ব্যাকরণ বা মার্গীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে রচিত হয় নি। সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলন ও পরিস্থিতির মূল্যবোধ থেকে। তবে একটি ফর্ম হিসেবে সময়ের দাবী ও শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের আধুনিক চিন্তার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা হলো শিল্পের দায়। গণসংগীত

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও মানবিক বিকাশের হাতিয়ারের ন্যায় একটি সাংগীতিক ধারা–যা সুরের আধুনিকতা গ্রহণের উপর মান বজায় রাখে। সলিল চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ফর্ম ও কনটেন্ট নিয়ে বাকবিতণ্ডাই যার উপযুক্ত প্রমান বহন করে। একইভাবে বিশ্ব ও জাতীয় সংগীতের সাথে তাল মেলানোর প্রকৃয়াও প্রয়োজন।

১৯৮৫ সালে নেয়া সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে গণসংগীতের আধুনিক মূল্যায়ন। ড. অনুরাধা রায়ের নেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন–

"নতুন যুগের চেতনাকে তুমি যদি তোমার সুরে তোমার কথায় প্রতিফলিত না করতে পার, তুমি টিকতে পারবে না, বাঁচতে পারবে না। সেটা নিয়ে আমি গোড়া থেকে লড়াই করেছি। I being a musician I could fight it out এবং I could influence all the top singers of india."[১]

গণসংগীত বিপ্লবের আগুনে ঘি ঢেলে দেবার মতো অস্ত্র। কিংবা সামরিক শোষক-শাসকের বিরুদ্ধে গণরোষ, গণ-বিদ্রোহের বুলেট। সাধারণ সংগীত থেকে এটি হলো বিশেষ পার্থক্য। যখন গণসংগীত এরকম আচরণ করে না, তখনই অভিযোগ ওঠে। অস্ত্র হিসেবে গর্জে ওঠার মতো কথার সীমাবদ্ধতা থাকে। এমনকি শ্লোগান কিংবা ভাষণেও জনগণকে জাগাতে অসমর্থ হয়। তখনই সামনে আসে গণসঙ্গীত–সুরের মাহাত্ম্য নিয়ে। মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ঠিক সেই সুরকে বেছে নিতে হয় যা জনগণের খুব কাছের। ভারতের বিখ্যাত শিল্পী গদর সেই কাজটি করতে গিয়ে যা আশ্রয় করেন এবং বলেন, তা হলো–

"শ্রমজীবী জনতার স্পন্দন হলো আমাদের সঙ্গীত। 'ভাগিদিন তোম' বা 'কিট্‌তাকি তোম' আমরা শিখি নি। আমরা যা বাজাই সে শুধু ঢোল তবলা নয়, সে হলো মানুষের বুকের আওয়াজ। ...আমাদের নৃত্য শোষিতের আবেগের প্রতিরূপ। তালে তালে আমাদের পদক্ষেপ। আমাদের বঞ্চিত ভাইদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ। নিঃস্ব জনসাধারণের আর্তনাদই আমাদের গানের প্রাণ। আসলে এই গান আমার গান নয়। এগুলি জনসাধারণের গান। জনতার মধ্যথেকে জনতার কাছেই আমার যাত্রা। আমার গানের উপর আমার কোনো অধিকার নেই। আমার গানের উপর আধিপত্য জনগণেরই।"[২] আধুনিক কালের গণসংগীত তাই বিশেষ ভাবে ফিরে গিয়েছে লোকসংগীতের তথা শ্রম-সংগীতের দিকে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয় এলাকাতেই। জনগণের জন্য সহজভাবে অর্জনের সুর তার প্রতিবেশ ও পরিবেশকে অবলম্বন করে লালন করতে চায়। যেখানে শাস্ত্রীয় সুরের নিখুঁত কাঠামো ও রস দিয়ে মোহিত করা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সুরের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রধানত যে চারটি ধারার সাথে গণসুরের সমন্বয় ঘটেছে, তা হলো লোক সুর, শাস্ত্রীয় সুর, বিদেশী সুর ও আধুনিক সুর। এ বিষয়ে পূর্বে যে বিশদ আলোচনা হয়েছে এই অধ্যায়ের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য, তাই একই বিষয়ের পূনরাবৃত্তি বাঞ্চনীয় নয়। তবে ধারাক্রম অনুযায়ী ঐ একই রকম নিয়ম-নিগড়ের মধ্যেও সুরের গ্রহণ-বর্জনের সুক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন তো আসেই। সভ্যতার নিয়ম অনুযায়ী চিন্তা ও দর্শনের পরিবর্তনের ন্যায় সুরের চারিত্রিক গুণাবলীকে ভিন্ন ভাবে অবলোকন করা সম্ভব। সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে গণসংগীতের বিষয় বন্দনাতে যেমন, আঙ্গিকতায় যেমন পরিবর্তন

এসেছে, সুরও একইভাবে দার্শনিক ভিত্তি পাল্টিয়েছে। সে বিচারে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সুরকে বিশেষ ভাবে বৈচিত্র্য নিরূপণ করা যায় ৩ ভাগে। যথা–

১. লোকসুরাশ্রিত নাগরিক সুর
২. বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ও মিশ্রসুর এবং
৩. প্রতিবিপ্লবী ও নাটকীয় সুর।

নিম্নরূপ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো–

লোকসুরাশ্রিত নাগরিক সুর

লোকসুরকে নাগরিক জীবনে উপস্থাপন করার ঘটনা নগর জীবনের উৎকর্ষের সময় থেকেই চলে আসছে; এ নিয়ে অবশ্য বিপত্তিও কম হয়নি। বিপত্তি বলতে প্রথমত– লোকশিল্পীকে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনা থেকে ব্যাহত করা। দ্বিতীয়ত– লোকভাষা (একসেন্ট) শহুরে শিল্পীর অস্বাভাবিকত্ব হিসেবে নজরে পড়া। অন্তরায়ের আরো কারণ হলো গ্রামীণ সমাজ সংগীতের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় না গিয়ে বরং জীবন ও প্রকৃতির প্রবাহিত জল-হাওয়ার সহজাত সুর থেকে গান সৃষ্টি করে থাকে। তাঁরা গানের চলনের উপর যন্ত্রে সুর বাঁধেন। সুরের তাত্ত্বিক ব্যাখা প্রদান করা এক্ষেত্রে শিক্ষিত সংগীত গবেষকের বিলাসিতা বলা যায়। একদা এক অনুষ্ঠানে অন্ধ গুবগুবি বাদকের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছিল। নাম নৃপেন ধর (৪০), সাক্ষাৎকার অঞ্চল নারিকেল বাড়ী, ভাঙ্গার হাট, কোটালী পাড়া গোপালগঞ্জ, উপলক্ষ্য গণেশ পাগলের মেলা, তারিখ ১০ জুন ২০০৬। শিল্পী গায়কের সাথে সঙ্গত করে চলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কোন স্কেলে বাজালেন? তিনি বলতে পারেন না– কোন কোন স্বর আছে, এমনকি সারগামটাও নয়। অথচ ঠিক সুরে সঙ্গত করে চলেছেন। আওয়াজ তুলছেন অসাধারণ দক্ষতায়, শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে কোনো ভাবেই বাঁধা সম্ভব নয়। শিল্পী খালেদ চৌধুরীর একটি বক্তব্য উপস্থাপনযোগ্য–

"একধররণের লোক আছেন যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে লোকসংগীত ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন সংগ্রহ করেন এবং পরিবেশনও করে থাকেন। তাঁরা আবার অনেকেই দেখাতে চান লোকসংগীতের শৈলী কত উন্নত। তাই ভাটিয়ালিতে কোমল গান্ধারের উপর এমন ঝোঁক দেন, যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পর্দার উপর গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত জরুরি। ভাটিয়ালি অথবা ভাওয়াইয়াতে কোমল গান্ধার নেই, যেটা আছে সেটা গান্ধারের শ্রুতি 'ক্রোধা'। গ্রামীণ লোকেরা শ্রুতি তো দূরের কথা সারেগামাও জানেন না কিন্তু নিজের মতো করে যন্ত্রে সুর বাঁধেন। নিজেদের বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গিতে বেসুরাকে বলেন 'উনসুরা'। অর্থাৎ 'উন' সুর থেকে একটু কম। অথবা যন্ত্র ঠিক সুরে বাঁধা না হলে বলেন 'দশমীতে' ঠিক লাগেনি ইত্যাদি। শ্রুতি পরম্পরায় তাঁরা গান শেখেন বা গান। জিজ্ঞেস করলে বলতেও পারবেন না কোন পর্দায় গাইছেন। কাজেই লোকসংগীতের বিকৃতি শুরু হয়েছে যেদিন ভদ্র লোকেরা লোকসংগীতকে উদ্ধার করে শিক্ষিত মানুষের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করার ব্রত নিয়েছেন সেইদিন থেকে।"[৩]

তাহলে লোকসংগীতকে প্রকৃত মর্যাদা দানের উপায় কি? যদি তার বৈশিষ্ট্য ধারণ করা যায় সুরের আদলকে যথাযথ শ্রুতিবিদ্যার মতো করে গ্রহণ করে, তখন লোকসংগীতের সম্প্রসারণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গণসংগীত উদ্ভবের আগে যেমন লোকসংগীতের মধ্যে গণচেতনার নানা মাত্রা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। গণমুখী গানে লোকসুর বা আঙ্গিকের উপাদান ব্যবহৃত হওয়ায় লোকসংগীতেরই জাগরণ ঘটেছে। একদিকে লোকজীবন থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক কর্ণধার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, নেতৃস্থানীয় সাধনালব্ধ গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে; অন্যদিকে শ্রদ্ধাস্পদ মার্গসংগীতের বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের লোকসুরকে যথোপযুক্ত সমাদর করার সুযোগ ঘটেছে। খালেদ চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী–

"আমাদের দেশে বড়ে গোলাম আলী, কুমার গন্ধর্ব ইত্যাদি অনেক সংগীতজ্ঞ লোকসংগীতের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যন্ত্রীদের মধ্যে রবিশংকর, আলী আকবর, বিলায়েত খান, নিখিল ব্যনার্জী, বাহাদুর খাঁ ইত্যাদি অনেকে তাদের ধুন বাজাতে গিয়ে ভাটিয়ালি, কীর্তন, ভাওয়াইয়া, কাজরি ইত্যদির সুপ্রযুক্ত ব্যবহার করেছেন এবং করে থাকেন। এতে লোকসংগীত বিকৃত তো হয়ই নি বরং শাস্ত্রীয় সংগীতের অঙ্গনে স্থান নিয়েছে স্বসম্মানে।"[৪]

গণসংগীতের ভাব ও চেতনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ জনপদ ও শহুরে জীবনে পৌঁছে দেবার জন্য লোকসুরকে অবলম্বন করে দেখা গেছে বেশি সুবিধা হয়েছে। এতে করে আঞ্চলিক লোকসুর যেমন সর্বস্তরে উঠে এসেছে, লোক অঞ্চলেও একই ভাবে গণচেতনার গানগুলো পৌঁছে গেছে। এমন কয়েকটি গানের নমুনা দেয়া হলো–

হরলাল রায়ের লেখা ও রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুরে–

'ও বগিলারে
কেন বা আলু বাংলাদেশে মাছের আশা নিয়া।
শিয়াল কান্দে কুত্তা কান্দে, কান্দে ইয়াহিয়া
দুপুর রাইতে ডুপুর কান্দে, ভুট্টা বড় মিয়া কান্দে
ও বগিলারে....'

ভাওয়াইয়া সুর অথচ বিষয় রাজনৈতিক। সুরের আকর্ষণে রাজনৈতিক সূক্ষ্মতম শ্লেষ সাধারণ জনপদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

এস এম হেদায়তের কথায় আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরারোপিত এবং সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া সারিগানের সুরে–

'ও মাঝি নাও ছাইড়া দে
ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে
গা রে মাঝি গা কোনো গান॥

একদিন তোর নাও মাঝি ভাসবে নারে
নীল নদীর জলে, মাঝি রে...
সেইদিন তোর গান মাঝি শুনবে না রে
কেউ গাইবে না বলে, ও মাঝি রে...
ও পালের নৌকা কাইড়া নেবে সুর॥'

জনপ্রিয় গানটির সুরের নমুনা হলো–

												ররা	ররা	ধ্	সা
												ও	মা	ঝি	
গা	-া	গা	গা	গাঃ	গঃ	গা	গা	গাঃ	পঃ	ধা	পমা	রা	-া	-া	-া
না	ও	ছাই	ড়া	দে	ও	মা	ঝি	পাল	উ	ড়াই	য়া	দে	০	০	০
রাঃ	রঃ	রা	রা	রা	গরা	গা	মা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া
গা	রে	মা	ঝি	গা	০০	কো	নো	গা	০	০	ন	০	০	০	০

আরো কিছু গানের নমুনা দেয়া যায়। আপেল মাহমুদের কথা সুর ও কণ্ঠে–

'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি
হাল ধরেছি শক্ত করে রে।'

আলী মোহসীন রেজার কথা এবং রথীন্দ্রনাথ রায়ের সুরে–

'চাষাদের মুটেদের মজুরের
গরীবের নিঃস্বের ফকিরের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার দেশ সব মানুষের॥'

লোক-টপ্পা ও কীর্তনের আশ্রয়ে বৈতালিক গান আবদুল লতিফের–

'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়ার নয়
দাম দিচ্ছি প্রাণ লক্ষ কোটি
জানা আছে জগৎময়॥...'

প্রচলিত লোকসুরের খুব জনপ্রিয় একটি গান আলতাফ আলী হাসুর লেখা এবং ফকির আলমগীরের সুরে–

'ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে
আমি এখন রিক্সা চালাই ঢাকার শহরে'

ব্যান্ডের গ্রুপ ফিডব্যাকের গান মাকসুদে গাওয়া একটি গানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা এসেছে। জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবের ভয়ে মহা বিপদসংকের জারি করার পরও যেমন দরিদ্র মাঝি সাগরে মাঝ ধরতে যায়, কারণ তার কোনো রেডিও নেই, সে জানে না, মৃত্যুর মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে। গানটি হলো– 'মাঝি তোর রেডিও নাই বইলা জানতেও পারলি না' কিংবা আজম খানের একটি আলোচিত গান 'আলালে দুলাল, আলালে দুলাল' গরীব রিক্সাচালক বাবা সারাদিন কষ্ট করে দু'পয়সা রোজগার করে সংসার কোনো রকম চলে। কিন্তু তার সন্তান আলাল দুলালেরা মহল্লা অতিষ্ট করে তোলে। এইসব গানে লোকসুরের ব্যবহার এসেছে খুব স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে, কিন্তু গানগুলো নাগরিক জীবনেরই বয়ান।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ও মিশ্রসুর

গণসংগীতের জন্মলগ্ন থেকে বিদেশী সুর ব্যবহৃত হয়েছে সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ভূপেন হাজারিকা, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনুবাদিত গানের সংযুক্তির মাধ্যমে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে পূর্বেকার পরিচ্ছেদে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিদেশী সুর আরো অভিনব এবং প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে। আগে গণসংগীত পরিবেশন করতো বিশেষ কিছু প্রগতিশীল সংগঠন এবং রাজনৈতিক আদর্শ আশ্রিত সাংস্কৃতিক সংগঠন। স্বাধীনতার পর গণসংগীতের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে পূর্বেকার ধারণা অনুযায়ী গণসংগীতের সৃজন অনেকটা অবক্ষয়ের মতো মনে হয়। কিন্তু আধুনিক শিল্পী-লেখক এবং মুক্ত ব্যাণ্ড দলগুলোর মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গিকার প্রগাঢ় ভাবে স্থান পায়, এমন ঘটনা অন্য কোনো সময়ে দেখা যায়নি গণসংগীত যে পার্টির অঙ্গসংগঠনের সম্পত্তি নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। ফলে বিষয়ের দিক থেকে যেমন পূর্বকার গণসংগীতের কাঠামো ভেঙেছে একইভাবে সুরের কাঠামো থেকে বের হয়ে এসে সরাসরি পাশ্চাত্যের সাংগীতিক মেজাজকে হাজির করেছে বাংলার মঞ্চে। যেখানে গণসংগীতও আধুনিক গানের পোশাক নিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্যের সুর ও আঙ্গিকের মধ্যে যা নতুন নতুন সংযোগ হয়েছে, রক, জ্যাজ, পপ, হেভি মেটাল, ব্লুইজ, আরাবিক, ল্যাটিন সব আঙ্গিক মিডিয়ার কল্যাণে ঢুকে পড়েছে বাংলা গানে। বিশেষ করে বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আগে এভাবে কখনো দেখা যায়নি। সলিল চৌধুরীদের রেকর্ডেড মিউজিকে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, হারমোনি, কাউন্টার হারমোনি দেখালেও সরাসরি মঞ্চে হাজির হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি। স্বাধীনতা পর ব্যান্ড সংগীতের প্রসারতায় স্প্যানিশ গীটার, ইলেকট্রিক গিটার, কীবোর্ড, কঙ্গো, ড্রাম, ইলেকট্রিক ফ্লুট, ভায়োলিন, ভায়োলা, ক্লারিনেট, পারকাশন প্রভৃতির প্রচলন নবযুগের সূচনা করেছে: গণসংগীতের আসরেও যার সংযুক্তি কম বেশি লক্ষ্যনীয়। ব্যান্ডের আসরে বেশকিছু গণসংগীত ব্যাপক প্রশংসার ঘটনা ঘটিয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ব্যান্ডের দিকপাল আজম খান, আলম খানসহ অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পথে প্রান্তরে মুক্তিকামী মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে গান গেয়ে যাওয়া এক তাৎপর্যময় ঘটনা। পরবর্তীকালে আজম খানের ব্যান্ড উচ্চারণ, সোলস, ফজলের নোভা, মাইলস, চাইম, অবসকিউর, ওয়ারফেজ বাংলাগানের পাশাপাশি বেশকিছু গণমুখী গান গেয়ে তরুণ প্রজন্মকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে, কিছু গানের উল্লেখ করা হলো নিম্নরূপ–

দরিদ্র এক বস্তির ছেলে যে যুদ্ধে গিয়েছিল দেশকে মুক্ত করতে, কিন্তু সে আর ফেরে নি। মা তার কাঁদে লাশের পাশে বসে, কিন্তু কিছুই করার নেই কারুর। আশির দশকে খুব আলোড়ন তোলা গানটি আজমখানের লেখা সুর ও গাওয়া–

> 'রেল লাইনের ঐ বস্তিতে
> জন্মেছিল একটি ছেলে
> মা তার কাঁদে
> ছেলেটি মরে গেছে
> হায়রে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ॥...
>
> কত মায়ের অশ্রু আজ নয়নে

Dhaka University Institutional Repository

কে তার বোঝাবে কেমন
যে চলে যায় সে কি আর আসে॥'

গানটি মুক্তি যুদ্ধকালীন সময়ে 'বিটলসের' জর্জ হ্যারিসনের গাওয়া 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এর 'বাংলাদেশ' গানটি সুরাবলম্বনে গীত।

নোভা ব্যান্ডের গাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের 'রাজাকারের তালিকা চাই' আহবান হিসাবে তাদের বিচারের দাবী চাওয়ার মতো বিষয় নিয়ে গাওয়া গান পিংক ফ্লয়েড-এর বিখ্যাত গান 'উই ডোন্ট নিড নো' গানটির সুরাবলম্বনে গাওয়া বিখ্যাত গান প্রগতিশীল ছাত্র সমাজকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। গানটি হলো–

'কোনো রূপকথা গল্পগাথা নয়
আমার স্মৃতি কলুষিত বিস্ময়
আমি দেখেছি ধর্ষিত বাংলা মায়ের মুখ
ছিল বিজাতি শোষক দুর্জয়॥

ধীরে ধীরে জাগে বিদ্রোহী এদেশ
বুকের তাজা খুনে রাঙা খুনে শিনে
আঘাতে হানে ভেঙে দিতে শোষকের প্রাসাদ
স্বাধীনতার স্বপ্ন কোলে এল সেই রাত'।[৫]

এদেশে পাশ্চাত্য সংগীতের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র না থাকলেও আশির দশকে ব্যক্তি উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় ব্যান্ডের নামে বিভিন্ন দলের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। এ নিয়ে সংস্কৃতি সেবীদের নানা রকম বিরোধিতা ছিল। তবে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র এবং সুরের অবকাঠামোগত পরিবর্তন এলো, তার কিছুটা সুফল বর্তমানকালের গানে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক মানের বাদ্যযন্ত্রে যতটা পারদর্শী হওয়া যায়, সংগীতের আন্তর্জাতিক অবস্থান ততই পোক্ত হবে। আজ সংগীতের জাগরণে পুরোনো দিনের গানও নতুন মাত্রা পাচ্ছে, এটাও বাদ্যযন্ত্রের গ্রহণ উপযোগী মানসিকতার ফলাফল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবিপ্লবী ও নাটকীয় সুর

নব্বই দশক থেকে বাংলাগানে কথা ও সুরে অন্যধরণের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পরিবর্তনের মধ্যে 'অন্য' শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'সংগীতের একাল' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিবর্তনের ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল সত্তর ও আশির দশকে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসময়ী বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী ব্যান্ডের মধ্যদিয়ে। যেখানে নাগরিক জীবনের একাকিত্ব, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, দারিদ্র, জলোচ্ছ্বাস, দূর্নীতি, ছাত্র-রাজনীতিতে কলুষতার নিখুঁত চিত্র উঠে আসতে থাকে। জনমানুষের প্রতিবাদ, প্রতিবাদের ভাষা এখন আর মিটিঙে মিছিলে-শ্লোগানে নয়, জনসমক্ষে নয়। সামনে বিমূর্ত শত্রু, যার বিরুদ্ধে অস্ত্রও ধরা যাচ্ছে না, অথবা কখনো শত্রু নিজেই তার নিজের বিরুদ্ধে। ফলে সুরের প্রকাশ কোনো সুললিত নয় আবার হুংকারের ন্যায় গর্জে ওঠা নয়। এই সুর জীবন দহনের থেকে সৃষ্ট উথলে ওঠা বেদনার পারিভাষিক চিৎকার। কণ্ঠের মাধুর্যময় সুরকেও ভঙ্গুর আওয়াজ কখনো তিরস্কার করে, সুরের প্রকৃতি থেকে সরে এসে নাটকের প্রকৃতিকে (ডায়ালগ) অবলম্বন করে। নবজাত শিশু এই দুঃশাসনের পৃথিবী দেখে সে যেন মানতে চাইছে না কিছুই, কিন্তু তার বলার ভাষা নেই। শুধু চিৎকারই একমাত্র তার প্রতিবাদের ভাষা। একইভাবে মিউজিক কম্পোজিশনেও কোনো সুললিত বীণার রাগিণী নয়। জীবনের পচে যাওয়া গলে যাওয়া দুর্গন্ধময় মানবিক বোধের প্রকাশ। ছন্দের ভিতর ছন্দহীনতা ঢুকে মিলে মিশে এক বিভ্রান্তির ঝংকার। নানা ধরণের অশোধিত ধাতুশব্দের একত্রে ঝনঝনানি জানিয়ে দিতে চায় যে, এ পৃথিবী সে চায় না। এ পৃথিবী হত্যার, লুণ্ঠনের, আগ্রাসনের পৃথিবী, সংঘাতের পৃথিবী। এই ধরণের গানের শুরু অবশ্য ইউরোপে ষাটের দশকে শুরু হয়। জিম মরিসন, জন লেনন, মাইকেল জ্যাকসন এই ধারায় যুগস্রষ্টা। বাংলাদেশে সত্তরে আবির্ভাব বা একধরনের আমদানী বলা যায়। আশির দশকে তরুণসমাজ বাস্তবতার নিরিখে সংগীতের এই ধারা লুফে নেয়। ফলে দেখা যায় সংগীতের মাধ্যমে প্রতিবাদকে জানান দেয়া বা সংগীতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধ করা। আর এখন নিজেই একটি নিজেই প্রতিবাদ–অবয়বে, সুরে, বাদনে ও পরিবেশনে।

সমাজের যাবতীয় অন্যায়ের মধ্যে মুখ বুজে চুপটি করে থাকা মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের সহনীয় হয়ে ওঠা পরিবেশের সামনে হঠাৎ করে কারো তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠা পাগলের ন্যায় এই গানের বোধ। সেই পথ ধরেই নব্বই দশকের গান পরিশীলিত পথে এগোয়। ধীরে ধীরে সংযুক্ত হয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাংগীতিক প্রতিবাদের পরিমিত ভাষার সাথে। এই ভাষা শুধু কণ্ঠে নয় বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে। তারুণ্যের জয়গানকে শিশুর জন্য একটি সুন্দর সাজানো বাগানের পরিবর্তে যেখানে নোংরা, জীর্ণ ধ্বংসস্তুপ ছাড়া প্রদর্শনের কিছুই নেই। প্রকৃত শিক্ষা নেই, চাকরী নেই, হতাশার ও মরণ নেশার মানবিক চিৎকার এছাড়া আর কি হ'তে পারে। এ সময়ের সুর তাই অন্য কোনো সময়ের সাথে মেলানো যায় না। নান্দনিক বোধই যেখানে অতীতের সাথে মেলে না–সুর সেখানে কিভাবে মিলবে। তাই গানের ভাষা ও সুরে অন্য কোনো ইঙ্গিত রেখে যায়, অন্য কোনো পরিভাষা নির্মাণে ব্যাকুল, সেখানে রোমান্টিকতাও নিদারুণ ফ্যাকাশে।

বাস্তবিক অর্থে এরশাদের স্বৈরাচারী কুশাসনের কালে ছাত্র ও শিক্ষার সম্পর্ক ঘটে সন্ত্রাসের সাথে। বইয়ের বদলে বুলেট, জ্ঞানের বদলে টাকা, নীতির বদলে সন্ত্রাস, ভালবাসার বদলে হত্যা এই সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠও যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। অথচ স্বাধীন দেশ। সবমিলে সুস্থ জীবনের জন্য আশা করা যেন সমুদ্রের তীরের সন্ধান পাওয়ার অপেক্ষা। তখন গানের সুরে প্রবল গর্জন কিন্তু চলনের দিক থেকে সরল। কিছুটা বিপ্লবী কবিতার আবৃত্তির ন্যায়। অথবা নাটকের ডায়লগের মতো পরিস্থিতিকে জানান দেয়।

নব্বইয়ের পরে আসে গণতন্ত্রের বাতাস। তখন সুস্থির চিন্তার অবকাশ পায়। গানে আসে সুরের সংকট। নির্মিত হয় অন্য কোনো প্রত্যাশার কথা স্বপ্ন দেখার জন্য দু'হাত পাতার মতো প্রার্থনার সুর। কখনো জীবনের পরিণত অবস্থায় না পাওয়ার আর্তি; অথবা কেরাণী জীবনের দু'মুঠো আয়ের সংসার গোনার মতো সীমাবদ্ধ জীবনের একটি আশার দক্ষিণা সরল বাতাসের ন্যায় সরল অলংকারহীন সুর। সুরের সে ভোক্তা নয়, কিন্তু বেঁচে থাকার মতো স্বাভাবিক সুর যা ধরে মনে, সুমনের গানে, নচিকেতার গানে সেই সুর ভেসে আসে। আইয়ুব বাচ্চু, জেমস, মাকসুদ, চাইম, নোভা ব্যান্ডের শিল্পীরা সেই পথকে চিনিয়ে নিয়ে যায় সম্ভাবনার দিকে, যে পথের যথার্থ মূল্যায়ন আরো সময়ের ব্যাপার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১ অনুরাধা রায়ের নেয়া *সলিল চৌধুরির একটি সাক্ষাৎকার*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, বর্ষা ১৯৯৬, পৃ. ১২২

২ গদরের সাক্ষাৎকার থেকে, *গানই 'বুলেট'*, আন্দোলন প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ৮ ও ৯

৩ খালেদ চৌধুরী, *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৭

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৫ নোভা, '*রাজাকারের তালিকা চাই*', শিল্পী ফজল, অডিও এ্যালবাম, সারগাম প্রেজেন্টেশন, গান নং ২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গণসংগীত সৃষ্টির পথ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যদিয়ে আবির্ভাবের জন্যে প্রতিনিধিত্বের দিকটি ছিল সুবিধাজনক। অর্থাৎ একটি দলীয় কার্যক্রমে যে মনোবল থাকে তার পুরোটাই ভোগ করেছিল তৎকালীন আইপিটিএ'র শিল্পীরা। কিন্তু সৃষ্টির সহজাত প্রকাশের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব কখনো কখনো অনেক বাধার কারণ ঘটেছে বলে গণসংগীত প্রবক্তারাই বিভিন্ন ধরণের দ্বিধান্বিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শিল্প বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে পশ্চিমা বিশ্বের শিল্প যেমন একটি বিপ্লবে, যুগের নির্দিষ্ট ধরণে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্প আন্দোলন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মতবাদে প্রকাশিত হয়েছে, এদেশে তেমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব নয়, কারণ এই অঞ্চলের মানুষের শিল্প-সৃষ্টি জীবন ও প্রকৃতির সহজাত প্রবাহের মতো প্রকাশমান। লোক-সংস্কৃতির দিকে নজর দিলেই দেখা যাবে সেখানে কোনো দল বেঁধে নতুন কোনো ফর্মকে আবিষ্কার করার কারণ ঘটে নি, এমনকি মার্গীয় বা শাস্ত্রীয় ধারায়ও না। প্রকৃতি যেমন ধীরে ধীরে নিজেকে পরিবর্তন করে নেয় এই ভূখণ্ডের শিল্পকলার বিকাশ সেরকমই।

গণসংগীতের প্রকৃতি এইদিক থেকে সম্পূর্ণ উল্টো। যেন একটি প্রাসাদ কিংবা দুর্গ নির্মাণের মতো অবকাঠামোগত প্রস্তুতি। যা আমাদের লোক-সাংস্কৃতিক জীবনের চর্চার সাথে একেবারেই গোলমেলে। দেখা গেছে 'গণসংগীত' নামক শিল্পধারা সম্পর্কে ধারণার শুরু থেকেই এর-প্রভাব ও ফলাফল বরাবরই ফলপ্রসু; উদ্দেশ্যও অনেকাংশে সফল। কিন্তু সাধারণ জনপদের গ্রহণে অনেক দ্বিধা। অর্থাৎ প্রবাহিত সাংস্কৃতিক ধারার ন্যায় মিশে যেতে অনেক শংসয় অতিক্রম করতে হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক চর্চাও একটি নতুন ধারণা। ফলে গণসংগীত সাধারণের গান নয়, রাজনীতিবিদদের গান অথবা কমুনিস্টদের গান এমন কথাও প্রচলিত আছে। কথাটা অনেকটাই সত্য, কিন্তু গণসংগীতের যে উদ্দেশ্য তার সাথে অন্যান্য সংগীতাঙ্গিকের সংঘাতটা কোথায় তা বের করা কঠিন। সংঘাত থাকলেও তা যতটুকু মার্গীয় ধারার সাথে দেশী ধারার, ততটুকুই। আবার বাংলার রেনেসায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের দেহবাদী-বস্তুতান্ত্রিক ধারার বিকাশ যে প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছে। বাংলার বাউল সমাজের মানবতাবাদী আদর্শের মতো গণসংগীতের দুরত্বও খুবই কম। এমনকি কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা, তরজাসহ নানান ধারার আশ্রয় নিয়ে যে গণসংগীত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেখানে অনেক গানই লোকসংগীত হিসেবে আদর্শগত কারণেই স্বীকৃতি মিলেছে। তাছাড়া গণসংগীত স্বকীয়তা রক্ষা জন্য বা মৌলিকত্ব আবিষ্কারের জন্য কখনোই রক্ষণশীল থাকে নি। বরং জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক মাধ্যমের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা এত বেশি আর কোনো মাধ্যমেই করা হয় নি।

যেহেতু প্রচারই গণসংগীতের মূল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য আদর্শ প্রচার, শান্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠা, সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা। যেখানে দরবারের শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্নদের মতো কোনো গুরুশিষ্য পরম্পরা নেই, নেই গাণিতিক-জ্যামিতিক বা শাস্ত্রীয় নিয়ম শৃঙ্খলা। এখানে প্রধান লক্ষ্য সোসাইটির ভিতরে লুকিয়ে থাকা আবর্জনা-কুসংস্কার ও কুচক্রিদেরকে সনাক্ত করা। এই গান হলো অ-বিদ্যান জনপদের, যাদের সুরজ্ঞান, যন্ত্রসংগত বা সংগীত পরিবেশনার জন্য বিশেষ আয়োজনের যোগ্যতা নেই। কিন্তু মানসিক প্রত্যয়ের জায়গাটা এমন যে, এই পরিবেশনের তীব্রতায় শাসকের সিংহাসন টলে

Dhaka University Institutional Repository

যাবে অথবা শোষকের হাতের চাবুক ভয়ে খুলে পড়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে একদিকে প্রত্যাশা অন্যদিকে উপাদানের সীমাবদ্ধতা সবসময়েই নতুন নতুন রূপে-বিশেষণে দাঁড়াতে চেয়েছে। দাঁড়াতে গিয়ে হাজির করেছে বাঙালি সংস্কৃতিই শুধু নয়, বিশ্বসংস্কৃতির যা কিছু সাধারণের প্রেরণা ও মুগ্ধতার মাধ্যম– সবকিছুর আবরণকেই নিজের শরীরে ধারণ করতে চেয়েছে। একদিকে বাংলার লোক-সংগীতের যাবতীয় ধারা, শাস্ত্রীয় কুসুম, বিদেশী সুরের কিছুটা রং–ঢঙ, এই যে এত কিছুর সম্মিলন পৃথিবীর কোনো শিল্পমাধ্যমেই প্রয়োগ হয় নি। ফলে গণসংগীত বিষয়ক গবেষণার ফলস্বরূপ যে যে বিষয় উঠে এসেছে– তার বিশ্লেষণ করলে এক কথায় বলতে হয়, এইগান নিজেকে যতটুকু বিকাশ করতে পারে নি তার থেকে অনেকগুণ বেশি ধারণ করেছে।

সংগীতের তাত্ত্বিক রূপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংগীতে পদ্ধতিগত যে ভিন্নতা, সেখানে কোনোভাবেই উভয়ের সমন্বয় করা সম্ভব নয়। তা পরিবেশনা, শৃঙ্খলা এমনকি বিদ্যার্জনের ধরণকে উপস্থাপন করলেই বোঝা যায় উভয়ের পার্থক্য কোথায়। পশ্চিমা সংগীতের তত্ত্ব, প্রয়োগ, আয়োজন, পরিচালনা, পরিবেশনা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারিক বিন্যাসের সাথে তুলনা করলে এদেশের সংগীত একেবারেই স্বতন্ত্র ও ভারতীয়। কিন্তু গণসংগীত সেই সকল দেয়ালকে একটি উপভোগ্য মঞ্চে আনতে পেরেছে। পশ্চিমা সংগীতের ধারণা এদেশের মানুষ আগে থেকেই পেয়েছে, কিন্তু তা ছিল ঔপনিবেশিক প্রভাবে, শিক্ষিত উচ্চবিত্তদের সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের মতো। গণসংগীত সম্মিলন ঘটিয়েছে প্রয়োজনে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সর্বহারা-শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের বুলি হিসেবে। পরবর্তীতে বাংলা গানের যে সচেতন বৈশ্বিক বিকাশ– তাও গণসংগীতের কল্যাণেই।

বিশ্বসংগীতের সাথে পরিচয় লাভের আরেকটি কারণ অনুবাদিত গান। গণসংগীত আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ গানগুলোর অনুবাদ গণশিল্পীরা যে নিবেদন ও পরিচর্যার ভিতর দিয়ে করেছেন, তা একমাত্র সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সর্বোপরি মানবিক দায়বদ্ধতার প্রকাশে। অনুবাদ ও পরিচর্যার কারণে গণসংগীতে ছড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের শত শত সাংস্কৃতিক উপাদান ও আঙ্গিক। এই গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তা সুনির্দিষ্টভাবে উঠে এসেছে। অনুবাদ সম্পৃক্তির চর্চা শধু গণসংগীতকেই নয়, সামগ্রিক ভাবে বাংলা গানকে অনন্য স্থানে উন্নীত করেছে।

গণসংগীত নিয়ে কমবেশি গবেষণা পূর্বেও হয়েছে। সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং গুরুত্ব তুলে ধরে অনেক বিস্তারিত গবেষণাই পাওয়া গিয়েছে যা বর্তমান লেখকের গবেষণাকর্মে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কিছু গবেষণায় গণসংগীত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, ক্রমবিকাশের ধারায় স্খলন, অবক্ষয়, শিল্পমূল্য বিচার নিয়ে বেশিরভাগ বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ গণসংগীতকে তার নিজস্ব আঙ্গিক বা চরিত্রে বিশ্লেষণ না করে অন্য ধারার সাথে তুলনামূলক বিচারই গবেষকের আগ্রহের বিষয় ছিল। এটাই গণসংগীতকে সঠিক মর্যাদা দানে কখনো কখনো ব্যাহত করেছে। গণসংগীত নিয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কথাও এসেছে, বাঁচিয়ে রাখার মতো কারুণ্যও অনেকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, যা গণসংগীতের প্রকৃত অবস্থান ও তাৎপর্যকে অনেকাংশে আড়াল করে। যে ধারা সরকার কিংবা ধণিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলার মঞ্চ তৈরী করে, তা সেই ধনিকের পৃষ্ঠপোষকতা কীভাবে চাইতে পারে, এটাই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রধান দ্বান্দ্বিকতা হয়ে দেখা দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যাঁরা গণসংগীতকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে উঁচায় উঠাতে চান, তাঁরা আসলে নিজেরই অবস্থানকে পরিবর্তন করতে চান। গণসংগীতের অবক্ষয় নিয়ে যে সকল কথা এসেছে, তা এই সকল মানসিক

Dhaka University Institutional Repository

দৈন্য সম্পন্ন গবেষক বা শিল্পীদেরই চরিত্রেরই প্রকাশ । অন্তত উপরোক্ত গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়ের সাথে এদেশের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের যে গভীর সম্পর্ক ও অবদান– তা থেকেই অনুমান করা যায়, গণসংগীতের জ্বলে উঠার সাথে সময়ের কতটুকু গভীর সম্পর্ক ।

ফলে গণসংগীতের স্বরূপ ও বৈচিত্র্যের দিগন্ত অনেকটাই উন্মোচিত হয় নি । কখনো প্রশংসনীয় করে তোলার জন্য ঐতিহাসিক প্রতিবেদনকে বেশি মূল্য দেয়া হয়েছে । সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আলাদা সত্তা নিয়ে যে গণসংগীতের পদক্ষেপ, সেভাবে বিশ্লেষণ নজরে বেশি পড়ে নি । অন্য কোনো ধারার সাথে এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বিচার করা ছাড়া বিষয়ভিত্তিক কোনো গবেষণাও লক্ষ্য করা যায় নি । অত্র গবেষণায় বিষয়ে যে ব্যাপকতা-শ্রেণী বৈচিত্র্য এসেছে তা গণসংগীতের দীর্ঘ ছয় দশকেরই অর্জন । বাংলার অন্য যে কোনো ধারা থেকে তার বিশেষত্ব কিছুটা হলেও পর্যালোচিত হয়েছে ।

সুরবৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে একটি সাগর মন্থনকারী রত্নগর্ভার ন্যায় গণসংগীতের চরিত্র । যেখানে ভারতই নয় বিশ্বের সব সংগীত-সংস্কৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক, তা প্রভাবে এবং অবয়বে । সর্বোপরি এর ব্যাপকতা যে অনেক প্রসারিত, এই গবেষণা তারই একটি ধারণা মাত্র ।

অত্র অভিসন্দর্ভ গবেষণা সংগীত বিষয়ক হলেও তার ক্ষেত্র মূলত প্রধান তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে । এক. রাজনৈতিক ইতিহাস; দুই. প্রগতিশীল আন্দোলনের ইতিহাস এবং তিন. সমাজতান্ত্রিক দর্শন । উপর্যুক্ত এই তিনটি বাহনের উপর ভর করে বিশ্লেষিত হয়েছে বলে বিষয়বৈচিত্র্যের নান্দনিকতা বা সাহিত্য মূল্য কিংবা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের উপর দাঁড় করানো হয়েছে । অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সাথে তুলনামূলক অবস্থানও প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে বিভিন্ন অঞ্চলে । এই গবেষণার সার্থকতা যেমন পূর্ববর্তী গবেষকদের গভীর অনুসন্ধান ও প্রেরণার ফসল । তেমনি অভিসন্দর্ভ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আরো নতুন নতুন ক্ষেত্রের ইঙ্গিত রেখেছে । সর্বোপরি গবেষক ও পাঠকদের কল্যাণে যদি আসতে পারে, তাতেই অত্র অভিসন্দর্ভের সার্থকতা ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য

গ্রন্থাবলী

১. *আবদুল হালিম বয়াতী জীবন ও সঙ্গীত*, শফিকুর রহমান চৌধূরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

২. *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, ম ন মুস্তাফা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮১

৩. *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি*, মুজফ্ফর আহমদ, এস বি এ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৬৯

৪. *Introducing Modern music*, Otto Karolyi, Penguin books, 1995

৫. *উজান গাঙ বাইয়া*, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৈনাক বিশ্বাস (সম্পাদিত), অনুষ্টুপ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

৬. *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, মোহাম্মদ ফরহাদ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

৭. গুনার মিরডাল, *এশিয়ার রঙ্গমঞ্চ (৩য় খণ্ড)*, অনুবাদ রায়হান শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৭

৮. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sally Wehnever (Edited), Oxford University Press, First published 1948,

৯. *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, আবুল মনসুর আহমদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

১০. *কবি আবদুল গফফার দত্ত চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ*, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বইপত্র সিলেট, ডিসেম্বর ১৯৯৬

১১. *কবিয়াল ফণী বড়ুয়া : জীবন ও রচনা*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭

১২. *কীর্তন*, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৫২

১৩. *গণআন্দোলনের নয় বছর (১৯৮২-৯০)*, অজয় রায়, মুক্তধারা, ১৯৯১

১৪. *গণনাট্য সংঘের গান*, দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২

১৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য*, সংঘ প্রকাশন, ২০০১

১৬. *গণসংগীত*, শামসুজ্জামান খান ও কল্যাণী ঘোষ, বাংলা একাডেমী, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫

১৭. *গণসংগীত সংগ্রহ*, সুব্রত রুদ্র (সম্পাদিত), নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯০

১৮. গণসংগীত স্বরলিপি, সংকলন ও সম্পাদনা বুদ্ধদেব রায় ও সুব্রত রুদ্র, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

১৯. *গণসংগীতের অতীত ও বর্তমান*, ফকির আলমগীর, অনন্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১

২০. *গম্ভীরা গান : বিষয়গত বিভাজন*, হাবীব-উল-আলম (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন-৬৭, জুন ১৯৯৫

২১. *গানই 'বুলেট'*, গদরের সাক্ষাৎকার থেকে, আন্দোলন প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬

২২. *গানের বাহিরানা*, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৈনাক বিশ্বাস (সম্পাদিত), প্যাপিরাস কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮

২৩. *গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ প্রথম খণ্ড*, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা ১৯৯৯

২৪. *চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, মাহবুব হাসান (সম্পাদিত) জানুয়ারি ১৯৯১

২৫. *চর্যাগীতিকা*, সৈয়দ আলী আহসান, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৮৪

২৬. *চল্লিশ দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন*, অনুরাধা রায়, প্যাপিরাস, কলকাতা, জুন ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

২৭. *চারণ সম্রাট মুকুন্দ দাস*, গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাঞ্জল প্রকাশ, মাদারীপুর, ২০০০
২৮. *জনযুদ্ধের গান*, নিবারণ পণ্ডিত, গণনাট্য প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৭
২৯. *জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ*, অধ্যাপক মুহম্মদ মহসীন, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৯
৩০. *জীবন উজ্জীবন*, সলিল চৌধুরী, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৬
৩১. *জীবনের গান গাই*, শেখ লুতফর রহমান, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩
৩২. *জীবনের টানে শিল্পের টানে*, রেবা রায়চৌধুরী, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯
৩৩. *তরজা গান*, নিশীথ চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি ও আদিকাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, এপ্রিল ২০০৩
৩৪. *তরী হতে তীর*, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মনীষা, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৪
৩৫. *দাঙ্গার ইতিহাস*, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১
৩৬. *নিবারণ পণ্ডিত*, খগেশ কিরণ তালুকদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
৩৭. *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড)*, বদরুদ্দীন উমর, ঢাকা
৩৮. *বাংলা একাডেমী বাংলা-অভিধান*, সংকলন ও সম্পাদনা জামিল চৌধুরী, জুন ১৯৯৪
৩৯. *বাংলা গানের চার দিগন্ত*, সুধীর চক্রবর্তী, অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯২
৪০. *বাংলা গানের ধারা*, মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৩
৪১. *বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, রফিকুল ইসলাম, সেড, ঢাকা, ২০০৬
৪২. *বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া*, ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা জুন ১৯৯৫
৪৩. *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, আমজাদ হোসেন, পড়ুয়া, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৩
৪৪. *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪০-১৯৮২*, সাঈদ-উর রহমান, প্রথম অনন্যা সংস্করণ : ২০০১
৪৫. *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৮
৪৬. *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া ২০০৫
৪৭. *বাঙালির মুক্তির গান*, আবদুশ শাকুর, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৭
৪৮. *বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, যতীন সরকার, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭
৪৯. *Bengali-English Dictionary*, Samsuzzaman khan (Edited) Bangla Academy, Ninth Reprint October 1998
৫০. *ভাটির চিঠি*, শাহ আবদুল করিম, সিলেট স্টেশন ক্লাব, সিলেট, ১৯৯৮
৫১. *ভাটিয়ালী গান*, দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২
৫২. *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কো আন্তোনভা, গ্রি বোনগার্দ লেভিন, গ্রি কতোভস্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২
৫৩. *ভারতীয় সংগীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, সুকুমার রায়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর
৫৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, সরোজ মুখোপাধ্যায়, এন বি এ, কলকাতা, ১৯৮৫
৫৫. *ভাষা আন্দোলন সাহিত্যিক পটভূমি*, হুমায়ুন আজাদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০
৫৬. *ভাষা আন্দোলনের ডায়েরী*, মুসতাফা কামাল, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. *ভাষা ও দেশের গান*, মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৫৮. *ভাষার গান দেশের গান*, আবদুল লতিফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
৫৯. *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, সেলিম আল দীন, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৬
৬০. *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, সেলিম রেজা (সম্পাদিত), অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮
৬১. *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান*, ফকির আলমগীর, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৪
৬২. *রচনা সমগ্র-৩*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, মার্চ ২০০৪
৬৩. *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১
৬৪. *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা*, শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৭২
৬৫. *রাজশাহী জেলার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৫
৬৬. *রমেশ শীল রচনাবলী*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, মার্চ ১৯৯৩
৬৭. *লোকসংগীত*, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, ঢাকা ১৯৯৯
৬৮. *লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, খালেদ চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা ২০০৪
৬৯. *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশ*, ১৯৫৩-'৯৩, আবদুল হক, নূরুল হুদা সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬
৭০. *শহীদুল্লাহ কায়সারের নির্বাচিত কলাম, (ঊনসত্তর থেকে একাত্তর)*, শমী কায়সার ও অমিতাভ কায়সার গ্রন্থিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৪
৭১. *শ্রমসংগীত*, শক্তিনাথ ঝা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ ২০০৩
৭২. *সংগীতকোষ*, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫
৭৩. *সংগীত বিচিত্রা*, নারায়ণ চৌধুরী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৬
৭৪. *সংগীত লহরী*, মোসলেম বয়াতী, পাণ্ডুলিপি
৭৫. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত) শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
৭৬. *সত্যেন সেন রচনা সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড)*, তত্ত্বাবধায়ী সম্পাদক হায়াত মামুদ, মফিদুল হক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা, ১৯৮৯
৭৭. *সাধন সরকার স্মারকগ্রন্থ*, সাজ্জাদুর রহমান পান্থ (সম্পাদিত), প্রতিনিধি, খুলনা, জুন ২০০৫
৭৮. *স্বরলিপি সমাবেশ*, এনামুল কবির, স্টুডেন্ট ওয়েজ পরিবেশিত, ঢাকা, নভেম্বর ২০০১
৭৯. *স্বাধীনতার অভিযাত্রায়*, সনজীদা খাতুন, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৮০. *সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে*, নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯০
৮১. *সেই বাঁশিওয়ালা*, সলিল চৌধুরী, গণনাট্য প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪

সাময়িকী, পত্রপত্রিকা, ওয়েবসাইট প্রভৃতি

১. *আজাদ*-এর (সম্পাদকীয়), রবীন্দ্রনাথ ও মাওলানা আজাদ, ১ বৈশাখ ১৩৬৮
২. *আবহমান বাংলা*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
৩. *এবং জলার্ক* (যুদ্ধজয়ের গান সংখ্যা), সম্পাদনা স্বপন অধিকারী, দিলীপ বাগচীর প্রবন্ধ : মিছিলে মিছিলে গান গাই, কলকাতা, জুন ১৯৯৭
৪. *এবং জলার্ক (গণসংগীত সংখ্যা-১, ত্রয়োবিংশ সংকলন)*, গণসংগীত সংগঠন ও শিল্প, অনন্তকুমার চক্রবর্তী, পৌষ ৪০১–আষাঢ় ১৪০২

Dhaka University Institutional Repository

৫. *গণসংগীত থেকে রবীন্দ্র সংগীতে কলিম শরাফী*, সিরাজুল আবেদ খানের নেয়া সাক্ষাৎকার, *ছুটির দিনে*, *প্রথম আলো*, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৩

৬. *google*, Anders Thorsell, Sundsvall, Sweden

৭. *জলার্ক*, *গণসংগীত সংখ্যা* ২, স্বপন দাসাধিকারী সম্পাদিত, হাওড়া ,শ্রাবণ ১৪০২–পৌষ ১৪০২

৮. *ধাবমান*, *একটি সাহিত্য আন্দোলনের ছোট কাগজ*, কফিল আহমেদ, সম্পাদক আবীর পরশ, নারায়ণগঞ্জ ২০০১, পৃ. ২৮

৯. *নন্দন সাহিত্য পত্রিকা*, *বাংলা গানের মাত্রা ও গানের মাল্লারা*, রাজীব নূর, সম্পাদক আলফ্রেড খোকন, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৫৩

১০. *পতিত সংগীত*, সমগীত সংস্কৃতি প্রাঙ্গণের সংকলন, নারায়ণগঞ্জ, জুলাই ২০০৩

১১. *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা*, দিবজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৩, কলকাতা, মে ১৯৯৭

১২. *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা (১ম সংখ্যা)*, ডা. বিমল রায় সম্পাদিত, গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা–একটি *সমীক্ষা*, দিলীপ সেনগুপ্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৯৫

১৩. *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা (চতুর্থ সংখ্যা)*, নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণসংগীত, বৈরাগ্য চক্রবর্তী, ১৯৯৯

১৪. *পাকিস্তান অবজারভার*, ২৩ জুন, ১৯৬৭

১৫. *বাংলা জার্নাল (১ম সংখ্যা)*, ইকবাল করিম হাসনু সম্পাদিত, *মিলিত প্রাণের কলরবে*, দিনু বিল্লাহ, কানাডা, ১৯৯৯

১৬. *বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রথম প্রস্তাবক–নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী*, আবু মোহাম্মদ মোতাহার, ইত্তেফাক, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮

১৭. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*, ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রবন্ধ : বাংলা লোকসংগীত ভাওয়াইয়া, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫

১৮. *সংস্কৃতি ঃ সংগ্রাম*, মোতাহার হোসেন সুফী সম্পাদিত, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯১

১৯. *সংস্কৃতির সংগ্রাম পত্রিকা*, মিনা মিজানুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, খুলনা আঞ্চলিক কমিটি, ২০০১

২০. *সলিল চৌধুরির একটি সাক্ষাৎকার*, অনুরাধা রায়ের নেয়া, অনুষ্টুপ, কলকাতা, বর্ষা ১৯৯৬, পৃ. ১২২

২১. *সাপ্তাহিক ২০০০*, হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, ভোটের গান, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯

২২. *সাহিত্য পত্রিকা*, *ছেচল্লিশ বর্ষ॥ প্রথম সংখ্যা*, প্রবন্ধ : নিবারণ পণ্ডিত, শরীফ আতিক উজ্-জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক ১৪০৯

২৩. *সুরমা উপত্যকার শঙ্খচিল*, (হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণে) উন্মেষ মাসিক পত্রিকা, ১৩৯৫

২৪. *http://www.un.org*/Depts/dhl/language.

২৫. *http://en.wikipedia.org*/wiki/Cripps'_mission

২৬. *Wikimedia Foundatiojn. inc.* en.wikipedia.org/wiki/Victor_Jara.

২৭. *www.marxists.org*/archive/pollitt/articles.

Dhaka University Institutional Repository

অডিও, ভিডিও, চলচিত্র

১. *অজিত পান্ডের গান*, সুরের মেলা থেকে প্রাপ্ত
২. *অন্য সলিল*, সলিল চৌধুরীর গান, মেগাফোন কোম্পানি, ২০০৩
৩. *আজ শুধু গান*, দিলীপ সেনগুপ্তের গণসংগীত, হংসধ্বনি ২০০৩
৪. *আজি হতে শতবর্ষ পরে-২*, আনন্দধারা নিবেদন
৫. *আমার ভালোবাসার স্বদেশ*, মাহবুবুল হায়দার মোহন, ওয়ার্ল্ড মিউজিকের নিবেদন, ক্রান্তি প্রযোজনা
৬. *আর কতকাল*, ৪০-৫০ দশকের কলজয়ী গণসংগীত গুচ্ছ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ,পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৮
৭. *ইচ্ছা*, কঙ্কণ ও মন্দিরার গাওয়া গান, হংসধ্বনি ২০০৪
৮. *ক্যালকাটা ইয়থ কয়ারের গান*
৯. *খোলা জানালার গান*, (আন্তর্জাতিক গণসংগীত), পরিবেশনা–ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সাগ্নিক শাখা, হংসধ্বনি, কলকাতা
১০. *গণসংগীত*, সলিল চৌধুরীর গান, মিলেমিশে'র পরিবেশনা, কলকাতা ২০০৭
১১. *গণসংগীত*, (১৯৫২ থেকে ১৯৭১), ঢাকা থিয়েটার, গীতালী
১২. *ঘুম ভাঙার গান*, সলিল চৌধুরী রচিত গণসংগীত, গ্রামোফোন কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭
১৩. *নবজীবনের গান*, কলিম শরাফী, সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার প্রযোজনা, ঢাকা
১৪. *নিবারণ পণ্ডিত*, ৫০ বছরের গণনাট্যের গান, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ
১৫. *পাখির ডানায় দারুণ শক্তি গরুর চোখে মায়া*, কফিল আহমেদের গান, ঘোড়াউত্রা
১৬. *মুক্তির গান*, পরিচালক: তারেক মাসুদ ও ক্যাথারিন মাসুদ
১৭. *যেতে হবে*, প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান, অন্বেষণ নিবেদিত, গাধানি রেকর্ডস, ১৯৯৪
১৮. *রাজাকারের তালিকা চাই*, নোভা, শিল্পী ফজল, অডিও এ্যালবাম, সারগাম প্রেজেন্টেশন
১৯. *রুপান্তরের গান*, শিল্পী শাহীন সামাদ ও এনামুল হক, লেজার ভিশন, ঢাকা ২০০৭
২০. *শঙ্খচিল*, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রাগা, হিমাদ্রি ভট্টাচার্যের (রেকর্ড ও সম্পাদনা)
২১. *শরণার্থী শিবিরের বাউল*, তোরাপ আলী সাঁই, দেবেন ভট্টাচার্য সংগৃহীত, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের নিবেদন, ঢাকা
২২. *শফিকুর রহমান চৌধুরী* কর্তৃক সংগৃহীত রচয়িতা মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালীর (শফি বাঙালি) স্বকণ্ঠে গীত ক্যাসেট থেকে অনুসৃত
২৩. *শিমুলের গান*, শিমূল ইউসুফ, ওয়ার্ল্ড মিউজিক-এর প্রযোজনা ও পরিবেশনা, ঢাকা
২৪. *সময়ের স্মৃতি*, কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর ৮০তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনা
২৫. *হিমালয় থেকে সুন্দরবন*, ইকবাল আহমেদ, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন নিবেদিত, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

গানের তালিকা

স্বাধীনতা পূর্বকাল

অ		
অবাক পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়	সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৩৪
অসহ্য অসহ্য অসহ্য	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	১০৭
আ		
আইন করতে হবে ভাই	নিবারণ পণ্ডিত	২০
আজ বাংলার বুকে দারুণ হাহাকার	অনল চট্টোপাধ্যায়	২১, ৩৯
আজব দেশের আজব লীলা আজব খেলা	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৯০
আজি দেখ না চেয়ে	রাজেন্দ্র নন্দী	৩৪
আমরা করবো জয় নিশ্চয়	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮১
আমরা তো ভুলি নাই শহীদ	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৭, ১০৬, ১৪৫
আমরা নীচে পড়ে রইব না আর	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৬
আমরা শক্তি আমরা বল	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৫
আমরা যেন বাংলাদেশের চোখের	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১১৪
আমরা পূবে পশ্চিমে	শহীদুল্লাহ কায়সার	১১২
আমার খুনে মোটর গাড়ী, তেতালা চৌতালা বাড়ি	রমেশ শীল	২৯
আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৪৫
আমার মাঞ্জুর মায়ে কন্ট্রোল বুঝে না	নিবারণ পণ্ডিত	৩৭
আমার দেশের ছাত্র-ছাত্রীর তুলনা যে নাই	আবদুল লতিফ	৯৬
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আবদুল গাফফার চৌধুরী	৫৩
আমাদের চেতনার সৈকতে একুশের ঢেউ	নাজিম মাহমুদ	৫৮
আমাদের প্রশ্ন যদি করতে আসে কেউবা	সাধন দাশগুপ্ত	৮৪
আমি কত্তাভজার দলে	গুরুদাস পাল	১৪৯
আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম	মুকুন্দ দাস	৩২, ১৪৩
আমি যে দেখেছি সেই দেশ	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮১
আমি কেমন কইরা ভুলি	আবদুল লতিফ	৫৬
আর কতকাল, হে মহাকাল	সুফি মাস্টার	১৪৯
আর কতকাল বল, কতকাল সইব এ	বিনয় রায়	১৭, ৯৮, ১০৬
আরে ও দেশবাসী আরে ও গরীব চাষী	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৪
আরে দে দে স্টালিন ভাই	সাধন দাশগুপ্ত	২৮, ১৫৫
আরো বসন্ত বহু বসন্ত	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮৩
আল্লাহ ভাত দে কাপড় দে বাঁচতে দে রে	আবদুল করিম	৬৯, ১১৮
আয়রে বাঙালী আয় সেজে আয়	মুকুন্দ দাস	১৪২
আসাদ জোহা আর যত শহীদের	নিজামুল হক	১১১
ই		
ইলাকসানে যাইও, হিন্দু-মুসলেম	রমেশ শীল	৬৭
উ		
উজান গাঙের ও মাঝি ভাই জাইল ধর	ফণী বড়ুয়া	১৪৬
উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই	শিবনাথ শাস্ত্রী	৭৫

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছে শান্তির নিশান, ছুটে আয় মজদুর কিষাণ	রমেশ শীল	৭৭
উদয় পথের যাত্রী	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৯৫, ১৫৭
এ		
এই আগুন নিভাইবো কে রে	সত্যেন সেন	১১০
এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো	আলতাফ মাহমুদ	৬৩
এই পথ এই কালো পথ–	সংগৃহীত	৫৮
এই সমাধি তলে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮৩
এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল	কাজী নজরুল ইসলাম	১০৭
একদিন মাকে দিয়েছিলাম দোষ	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৯৮
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি	পীতাম্বর দাস	৩৩, ১৪২
একি চমৎকার, দেশে এল ফাঁক তালের কারবার	রমেশ শীল	৬৭
একুশে আসে জানাতে বিশ্বে	লোকমান হোসেন ফকির	৫৮
একুশে ফেব্রুয়ারি সুপ্রভাতের কালে	আবদুল হালিম বয়াতী	৬০
এগিয়ে চলে প্রাণ মিছিলে	গণেশ চক্রবর্তী	১০৪
এবার এসেম্বলি ভোটের সময় এলো বন্ধুগণ	রমেশ শীল	৬৭
এবার ভোট দিতে হুঁশে থাকিস ভাই তোরা	রমেশ শীল	৬৭
এবারের দুর্দশার কথা	শাহ আবদুল করিম	৪২
এলো নির্বাচন হুঁশিয়ার ভাই দেশের বন্ধুগণ	ফণী বড়ুয়া	১৪৪
এসেছে আবার অমর একুশে	আবদুল লতিফ	৫৬
এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	১০১
ও		
ও হারে কৃষক মরিলায়	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৪০, ১৫৩
ও এগো সজনী, গুয়াগাছে টেক্কো লাগিল নি	আবদুল গফফার দত্ত চৌধুরী	৮৯
ও কি ও হো রে ইন্দিরা, তুই করলু মোক	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৮
ও চাষী ভাই–তোর সোনার ধানে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৪৫
ও তোর মরা গাঙে আইল এবার বান	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৭
ও বগিলারে, কেন বা আলু বাংলাদেশে	হরলাল রায়	১৪৭, ১৮৫, ২৪১
ও বাহে দেওয়ানীর বেটা গুরুপ লইয়া	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৮
ও ভাই মোর বাঙালী রে	আবদুল করিম	১৪৭
ও ভাই হুঁশিয়ার, ভোটের সময় আজগুবি কারবার	ফণী বড়ুয়া	৬৮
ও ভাইরে বন্ধু, বলতে কি পারো	পরেশ ধর	৪৫, ৫৭
ও ভাইরে ভাই	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৬০
ও মোদের দেশবাসী রে	সলিল চৌধুরী	৩৪, ৪৫
ও রহিম ভাই, ও করিম ভাই, ও যদু ভাই	আবদুল লতিফ	৭০
ও হারে ও নীলকরে করলো সর্বনাশ	নিবারণ পণ্ডিত	১৯, ১৫২
ওঠরে চাষী জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল	কাজী নজরুল ইসলাম	১৬, ৭৬
ওরা আমার মুখের কথা	আবদুল লতিফ	৫৫
ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না	কমল সরকার	৮২
ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৬
ওরে ও চাষী ভাই	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৮
ওরে ও কৃষক ভাই	নিবারণ পণ্ডিত	৩৪
ওরে ও শ্রমিক ভাই	ফণী বড়ুয়া	১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ওরে মাঝি দে নৌকা ছেড়ে দে	শহীদ সাবের	১২৯
ওরে বিষম দইরার ঢেউ	শহীদ সাবের	১৪২
ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৫
ওরে ভাইরে ভাই, বাংলাদেশে বাঙালি আর নাই	আনিসুল হক চৌধুরী	৫২
ক		
কই তোরা আজ দেশ হিতৈষী	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৫
কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে	নিবারণ পণ্ডিত	১৫৩
কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	৩২, ১০৬
কালো কালো মানুষের দেশে	সেজান মাহমুদ	৮৫
কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৭, ২৯, ১৪০
কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি	মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী	৫৮
কি বলিতে কি বলিব ভাবিয়া না পাই	আবদুল লতিফ	১৪০
কেউ মালা কেউ তছবি গলে	লালন সাঁই	৪৪
কোথায় সোনার ধান হায়রে	অনল চট্টোপাধ্যায়	২১, ৩৯
কৃষক বন্ধুরে উঠে দাঁড়াও গণআন্দোলনে	রমেশ শীল	৬৭
কৃষক ব্যক্তিসত্তায় বাঁচতে চায়	ফণী বড়ুয়া	১০১
ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে গো	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৪৪
খ		
খাল কেটে কুমির ডেকে আনবো না ভাই আজ	ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়	২৮
গ		
গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা	শিবদাস বন্দোপাধ্যায়	১১৫
গরীব দেশবাসী, গরীব কিষাণ চাষী	বিনয় রায়	১৪৮
গান্ধী সজ্জিত বিরাট বাহিনী	রোহিনী রায়	৮৯
গ্রামের মানুষ ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়	নিবারণ পণ্ডিত	৩৭
গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে তৈরি হও	সলিল চৌধুরী	১০৫
ঘ		
ঘুমাস না আর খোকা আমার বর্গী এলো দেশে	সলিল চৌধুরী	২০
ঘুমের দেশের ঘুম ভাঙাতে ঘুমিয়ে গেল যারা	বদরুল হাসান	৫৭
ঘোর, ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৬
চ		
চলো চলো হে মুক্তি সেনানী	সলিল চৌধুরী	১০৪
চলছে আজ চলছে কাল শান্তির এই মিছিল	সলিল চৌধুরী	১০৪
চলরে কিষাণ বাজিয়ে বিষাণ নিয়ে লাল নিশান	নিবারণ পণ্ডিত	১৮
চলরে জোয়ান এক সাথে	ফণী বড়ুয়া	১৪৪
চাষী দে তোর লাল সেলাম তোর লাল নিশান রে	সাধন দাশগুপ্ত	১৮
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১
ছ		
ছিল ধান গোলা ভরা	মুকুন্দ দাস	২১
ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী	মুকুন্দ দাস	৩১, ৯৭
জ		
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	৮৫, ১০৯, ১৬২
জনরক্ষা সমিতি গড় সেই আমাদের জোর	সত্যেন সেন	১০১

Dhaka University Institutional Repository

জনপথ প্রান্তরে সাগরে বন্দরে শুনি হুংকার	মুস্তাফিজুর রহমান	১১৩, ১৮৬
জাগ বাঙালি ছাড় বাঙালি উঠা কাচ্চি পাকি	প্রচলিত গম্ভীরা	১৪৯
জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৫
জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত	কাজী নজরুল ইসলাম	৭৬, ৮০
জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা	কাজী নজরুল ইসলাম	৯৭
জাগো জাগো জাগো সর্বহারা	মোহিত বন্দোপাধ্যায়	৭৬, ৮০, ১৬৩
জাতির বড়াই কি ইহকাল জাতি করে কি	পাঞ্জু সাঁই	৪৪
জাতের নামে বজ্জাতি সব	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৪
ঝ		
ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু চারিদিকে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৬৪
ড		
ডিম পাড়ে হাসে খায় বাঘডাসে	সুখেন্দু চক্রবর্তী	১১২
ঢ		
ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে	সলিল চৌধুরী	১০৫
ত		
তোমরা শুনছনি খবর	রমেশ শীল	৪৬
তোমার আমার ঠিকানা	শিবদাস বন্দোপাধ্যায়	১১৫
তোমরা এবার লও চিনিয়া	নিবারণ পণ্ডিত	৬৫
তোমার বুকের খুনে পথ কে ভাসায় বন্ধু	সাধন দাশগুপ্ত	২৮
তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখরে চাহিয়া	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	২৭
দ		
দিনের শুভা সুরুজ রে	টগর অধিকারী	২২
দ্বীনের ভাইরে, শোন রে লীগের কারখানা	যৌথসৃজন	৬৯
দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার	কাজী নজরুল ইসলাম	৩২
দুঃখী ভারতবাসী চাষা	জয়নাথ নন্দী	১৭
দুঃখীর দুর্দশা ঘুচিবে	ফণী বড়ুয়া	১৪৬
দুঃখের আগুন বুকে নিয়ে নীরবে	ফণী বড়ুয়া	১৪৬
দেশশুদ্ধ লোক যতদিন খেতে পায়নি কমলা লেবু	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৭৩
দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও একটি নাম	নাজিম মাহমুদ	৮৬
দেখ্‌ছ কি সবই উজাড় হোলো	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	১১৭
দেখে এলাম কলকাতায় কার্জন পার্কের	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৩
দেশের দুঃখীর দুঃখ দেখি	ফণী বড়ুয়া	১৪৪
ধ		
ধন্য তুমি বঙ্গ জননী	নির্মল চৌধুরী	৯৮
ধীরে বহে ইয়াংসী	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮১
ধীরে বোলাও গাড়ী রে গাড়ীয়াল	প্রচলিত ভাওয়াইয়া	১৪৭
ন		
নাকের বদলে নরুন পেলাম	সলিল চৌধুরী	৩৪
নাম তাঁর ছিল জন হেনরী	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৬৪
নিজের ঘরে হো'নু পরবাসী	প্রচলিত গম্ভীরা	১৫০
নিষ্ফল কভু হয় না ধরায়	নাজিম সেলিম বুলবুল	৫৭
নিশি অবসান জাগরে তোরা	নিবারণ পণ্ডিত	৮৩

Dhaka University Institutional Repository

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা	দীনবন্ধু মিত্র	১৬
প		
পণ্যের মত গণ্য করি শ্রমিকের শ্রম কিনে	ফণী বড়ুয়া	১০১
পায়রার পাখনা বারুদের বহ্নিতে জ্বলছে	আবুবকর সিদ্দিক	১১০
পাঁচতলা-সাততলা যত পাক্কা বাড়ী উঠে	ফণী বড়ুয়া	১০২
ফ		
ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে	বিনয় রায়	১৬
ফুলগুলি কোথায় গেল	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৬৪
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে	শাহ আবদুল করিম	৫৯
ব		
বঙ্গনারী হইল বিবসনা	নিবারণ পণ্ডিত	৩৭
বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	২৬
বল ওগো সজনী, পয়সা দিলে নুন মিলেনি	আবদুল গফফার দত্ত চৌধুরী	৮৯
বলো ভোট দিব আজ কারে	শাহ আবদুল করিম	৭২
বাংলাদেশ মোদের মাতৃভূমি	প্রচলিত গম্ভীরা	১৫০
বাংলার কমরেড বন্ধু	সাধন ঘোষ	৮৫, ১১১
বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রামী জান কি	আবুবকর সিদ্দিক	১১১
বাংলার মাটি বাংলার জল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪৩
বান এসেছে মরা গাঙে	মুকুন্দ দাস	১৪৩
বানিয়াচুঙের প্রাণবিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১১৬
বাবারে, ও বাবারে, কোনদিকে বা যাই	গুমানী দেওয়ান	৬৬
বাবু বুঝলে কি আর ম'লে	মুকুন্দ দাস	৩২
বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা	সলিল চৌধুরী	৩৪
বিপ্লবেরই রক্তরাঙা ঝাণ্ডা ওড়ে আকাশে	আবুবকর সিদ্দিক	৮৫, ১১০
বীর কিশোর দল	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৯৬
বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া	নিবারণ পণ্ডিত	৩৮
বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁচা	প্রচলিত গম্ভীরা	১৪৯
বুকের খুনে রাখলো যারা	আবদুল লতিফ	৫৬
বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল	আবুবকর সিদ্দিক	১১১
ভ		
ভক্তিভাবে দেশমাতাকে নমি বারংবার	গুমানী দেওয়ান	২৩
ভাই আমাকে বকুক ঝকুক	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১১৬
ভাই রে, ধন্য দেশের চাষা	মুকুন্দ দাস	১৬
ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি আর কতদিন	রমেশ শীল	৩৪, ৪৬
ভারত করিল ভস্ম, রাজা জমিদার	গোবিন্দ দাস	২১
ভাল-মন্দ জানিয়া ভোট দিও, ও ভাই ভাইয়াইন রে	ফণী বড়ুয়া	৬৮
ভাসানীর ভাষা ভেসে আসে ঐ	আবুবকর সিদ্দিক	৮৭
ভুলো না রেখো মনে বাঁচবে যত কাল	বিনয় রায়	৪১
ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না	গাজীউল হক	৫৪
ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৬৩
ভোট দিবা কারে তোমরা	রমেশ শীল	৬৮
ভোট দিবায় আজ কারে	শাহ আবদুল করিম	৭২

Dhaka University Institutional Repository

ভোট দিও গরীব দরদী ভাই	ফণী বড়ুয়া	৬৮
ভোট নেওয়ার সময় আসিলে নেতা সাহেব	শাহ আবদুল করিম	৭২
ম		
মরণ শিয়রে দলাদলি করে	হরিপদ কুশারী	৩৪, ৩৯
মরি হায়রে হায় দুঃখ বলি কারে	যৌথসৃজন	৬৬
মাউন্টব্যাটন সাহেব ও	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৩৫
মাঝি চলরে উজান বাইয়া	রমেশ শীল	৭৭
মাণিকরে, কংগ্রেসের ভাঙ্গা নাও দে ডুবাইয়া	নিবারণ পণ্ডিত ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস	১৫২
মানবো না এ বন্ধনে	সলিল চৌধুরী	৩৪
মানুষ মানুষের জন্য	শিবদাস বন্দোপাধ্যায়	১১৬
মায়ের দেয়া মোটা কাপড়	রজনীকান্ত সেন	১৪৩
মার্কিনী লাল ইয়াংকিরা	আবুবকর সিদ্দিক	৮৬, ১১০
মিলিত প্রাণের কলরবে	হাসান হাফিজুর রহমান	৫৭
মিলে মজুর চাষী মধ্যবিত্ত	নিবারণ পণ্ডিত	৮৮
মুক্তির মন্দির সোপন তলে	মোহিত বন্দোপাধ্যায়	১৪৯
মূর্খু গীদাল হামরা গুলা ভাওয়াইয়া গান গাই	নিবারণ পণ্ডিত	১৪৭
মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই	নিবারণ পণ্ডিত	৮৭
মোদের পতাকা লাল বরণ	ত্রিদিব চৌধুরী	১০৭
মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান	কাজী নজরুল ইসলাম	৪৫
মোরা কি দুখে বাঁচিয়া রবো	অজ্ঞাত	৬৩
মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল	মোশাররফ উদ্দীন আহমদ	৫৪
র		
রক্তে আমার আবার প্রলয় দোলা	আবদুল গাফফার চৌধুরী	৫৬
রক্ত শুধু রক্ত	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	১১০
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙ্গালি	শামসুদ্দীন আহমদ	৫৫, ১৪৬
রুখবে কে আর উদ্দাম এই প্রাণের জোয়ার	কমল সরকার	১০৩
ল		
লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৭৭, ১৪১
লেনিন শুধু লেনিন বলে লোকে	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮৩
লেনিনের ডাক শুনি, পৃথিবীতে লেনিনের ডাক	দীপংকর চক্রবর্তী	৮৩
শ		
শহীদ মিনারে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি	সাধন দাশগুপ্ত	৮৪
শীতল পৃথিবী অবশ নগর	ফজলে লোহানী	১১২
শুনেন সভাজন শোনেন দিয়া মন	অজ্ঞাত	৭০
শুনেন যত দেশবাসী শুনেন ভাই	নিবারণ পণ্ডিত	১৯, ৮৮
শুন ভাই পল্লিবাসী, মাঠের চাষী কৃষকের দল	গুমানী দেওয়ান	২২
শুন শুন দেশের ভাই বোনরে বন্যা এল দেশে	রমেশ শীল	৬৮
শোন ওরে ও শহরবাসী শোন ক্ষুধিতের হাহাকার	বিনয় রায়	৪০
শোন আমার দেশবাসীরে	ফণী বড়ুয়া	১৪৬
শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা	কাজী নজরুল ইসলাম	১৪৩
শ্রমিকের দরদী ভাই জগতে নাই	রমেশ শীল	৭৭
শৃঙ্খল ভেঙে ঐ আসলো স্বাধীন	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	৮৫

Dhaka University Institutional Repository

স

সর্বহারার দল, ছুটে আয় সকল	রমেশ শীল	৭৭
সঙ্ঘের ভেরী বেজেছে রে ঐ	গুমানী দেওয়ান	৭৮
সালাম আমার শহীদ স্মরণে	শাহ আবদুল করিম	৫৯
সামরিক আইন বড়ো মধুময়	মোসলেম উদ্দিন বয়াতি	১০৮
সাবধান ওগো সাবধান, যুগের নকীব নওজোয়ান	আবদুল লতিফ	৯৬
সুনো হিন্দকে রহনে বালো সুনো সুনো	বিনয় রায়	৪০
সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৮১
সেবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে বীজ হয়েছে বোনা	আবদুল লতিফ	৫৬
সৈনিক, মুক্ত শিবিরে হাঁকে বিউগল	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	৭৮, ৮১
স্বভাব তো কখনো যাবে না, ও হো মরি	গুরুদাস পাল	৪৭, ১৪৯
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়	গোবিন্দ চন্দ্র দাস	৯০
স্বাধীনতার গণতন্ত্রের যাহারা দুশমন	ফণী বড়ুয়া	৬৯

হ

হকের নায়ে চড়বি কেরে আয়	আবদুল লতিফ	৭০
হরি তোমার অপার লীলা বোঝা হল ভার	নিবারণ পণ্ডিত	৪৫
হামরা কোদাল চালাই পয়দা বাড়াই	সুধাংশু ঘোষ	১৫৬
হারাবার কিছু ভয় নেই শুধু শৃঙ্খল হবে হারা	দিলীপ সেনগুপ্ত	৭৪
হিন্দু এসো মন্দিরে যাই	ইসলাম উদ্দীন	১১৬
হিন্দু মুসলিম দেশবাসী শুন বন্ধুগণ	রমেশ শীল	৪৬
হুনছনি ভাই দ্যাখছনি, দ্যাখছনি ভাই হুনছনি	রমেশ শীল	৬৬
হুন্যনি ভাই খবর দিয়ে ভোট দিতা যাইতা	রমেশ শীল	৬৭
হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার	রমেশ শীল	৭৭
'হুঁশিয়ার, ও সাথী কিষাণ মজদুর ভাইসব হুঁশিয়ার	বাসুদেব দাশগুপ্ত	৭৮
হেই সামালো, হেই সামালো	সলিল চৌধুরী	২০

স্বাধীনতা ও পরবর্তীকাল

অ

অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা	টিএইচ শিকদার	১৮৪
অনেকে বলে আমারে গাও না একটা	শাহ আবদুল করিম	২১৪

আ

আকাশের বুক চিরে, পৃথিবীর বুক ভরে	রত্না ভট্টাচার্য	২৩১
আগুন দেখি বাজারে যাইয়া	মাহমুদ সেলিম	২০৯
আগুন দেখেছি আমি কত জানালায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	২২৬
আগুনে ঘুমাই আগুনে খাই	কফিল আহমেদ	২২২
আমরা ছাড়বো না ছাড়বো না	মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি	১৮০
আমার বাংলাদেশ–সোনার বাংলাদেশ	দীপংকর চক্রবর্তী	১৯০
আমার বাংলা ঢাকায় থাকে	মধু গোস্বামী	২৩২
আমার দেশের মাটির গন্ধে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৯২
আর পথ ছাড়া নয়	আবদুল লতিফ	২০৭
আর যাবো না ঠাকুর বাড়ি	কফিল আহমেদ	২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ই		
ইচ্ছা করে ঐ ব্যাটাদের মারি মুখে থুক	আবদুল লতিফ	২১৬
উ		
উন্দুর মাররে দেশের জনগণ	শাহ আবদুল করিম	২১৫
এ		
এই স্বাধীনতা ম্লান হয়ে যাবে	অজ্ঞাত	২০১
একটি হকার কেউ নেই তার	আইয়ুব বাচ্চু	২১৭
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান	১৯৫
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	১৯৪
ও		
ও ভাই, স্বাধীন জীবন নিয়ে কেন সংকটে পড়ি	ফণী বড়ুয়া	২০২
ও মাঝি নাও ছাইড়া দে	এস এম হেদায়েত	২৪১
ও লেনিন, ফেলাই দিছে ওরা তোমায়	কঙ্কন ভট্টাচার্য	২৩১
ও সখিনা গেছস কিনা ভুইলা আমারে	আলতাফ আলী হাসু	২৪২
ওরা ফিরে আসে মুক্ত স্বদেশে	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১৯৬
ক		
কতা কইলে হ্যায় চেইত্যা যায়	ফজলুল বারী বাবু	২১০
কান্দিলে ন পাওয়া যায়	মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি	২০৭
কারে কী বলিব আমি	শাহ আবদুল করিম	২১৬
কুহু কুহু ডাক শুনিয়া কাউয়ার পরাণ ফাইট্টা যায়	দিলীপ দে	২০৮
কে কে যাবি আয়রে, চল যাইরে	ইন্দ্রমোহন রাজবংশী	১৮৫
কেন করিব জন্মনিয়ন্ত্রণ	শাহ আবদুল করিম	২১৫
কোনো রূপকথা গল্পগাথা নয়	নোভা ব্যান্ড	২৪৪
কৃষক শ্রমিক হামরা এই না বাংলাদেশে	প্রচলিত গম্ভীরা	২০৩
খ		
খবর রাখো নি–উন্দুরে লাগাইছে শয়তানি	শাহ আবদুল করিম	২১৪
গ		
গেরিলা আমরা আমরা গেরিলা	অজ্ঞাত	১৮৫
চ		
চলছে মিছিল চলবে মিছিল	দিলওয়ার	১৮৬
চাষাদের মুটেদের মজুরের	আলী মোহসীন রেজা	১৯৩
ছ		
ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল	সুমন চট্টোপাধ্যায়	২২৫
জ		
জগতবাসী একবার আসিয়া	শহীদুল ইসলাম	১৮৬
জনসংখ্যা বাড়িতেছে জমি কিন্তু বাড়ে না	শাহ আবদুল করিম	২১৫
জনসমুদ্রে নতুন জোয়ার এল রে	শাহ আবদুল করিম	২০৯
জয় বাংলা বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	১৮২
জাগ চাষী ভাই জাগ শ্রমিক ভাই	মোসলেম উদ্দিন	১৮৮
জীবন মোদের দুর্বিসহ কইরা তুলছে রাজাকার	আলী রেজা খোকন	২০৯
ঝ		
ঝর্ণার ছন্দে ঢাল বেয়ে নেমে আসে	অমল আকাশ	২২৭

ঠ		
ঠাকুরবাড়ির বউ গো ঠাকুরবাড়ির বউ	অমল আকাশ	২২৮
ত		
তারা এদেশের সবুজ ধানের শীষে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৯৬
তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে	আপেল মাহমুদ	১৮৪, ২৪২
দ		
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা	আবদুল লতিফ	১৯৬, ২৪২
দারুণ দুর্ভিক্ষের আগুন, লাগল কলিজায়	শাহ আবদুল করিম	২০০
দেখলাম মধুপুরে চোখের নিকটে	কফিল আহমেদ	২২৪
ন		
নূর হোসেনের রক্তে লেখা	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১০৬
প		
পথে পথে কানতে কানতে	আবদুল লতিফ	২১৬
পাখিটার কথা বলি যে কারণ	কফিল আহমেদ	২২২
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল	গোবিন্দ হালদার	১৮১
প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ	মনিরুজ্জামান মনির	১৯৩
ব		
বড় গাঙ্গে শাসনতন্ত্র নিত্য নতুন হয় তৈয়ার	সালাম বয়াতি	২০৮
বাংলার আকাশে উড়ে যাওয়া	কফিল আহমেদ	২২৪
বাংলার স্বাধীনতা পেয়ে দুঃখীর দুঃখ না ঘুচিল	ফণী বড়ুয়া	২০২
Bangladesh, Bangladesh	জোয়ান বায়েজ	১৯১
বাচ্চারা কেউ ঝামেলা করো না	সুমন চট্টোপাধ্যায়	২২৬
বলো স্বাধীন বাংলা–মোদের	শাহ আবদুল করিম	১৮৭
বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিস্টান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের	১৮৩
ব্রিগেডে মিটিং হবে, লক্ষ লক্ষ মাথা	সুমন চট্টোপাধ্যায়	২২৫
ম		
মুখটি তোলো মাগো আমার	দেবীদাস তরফদার	২৩৩
মশারি নাই সুযোগ পাইল	শাহ আবদুল করিম	২১৬
My friend came to me	জর্জ হ্যারিসন	১৯০
Millions of babies watching the skies	এ্যালেন গীন্সবার্গ	১৯১
মানুষের দ্বারা কাঁদিছে মানুষ	আবদুল লতিফ	২১৮
মুক্তির একই পথ সংগ্রাম	শহীদুল ইসলাম	১৮০
মোরা নতুন পৃথিবী গড়বো	দিলীপ সেনগুপ্ত	২৩০
মোরা একটি ফুলকে বাঁচবো বলে যুদ্ধ করি	গোবিন্দ হালদার	১৮৩
য		
যদি ভাবো কিনছো আমায় ভুল ভেবেছ	সুমন চট্টোপাধ্যায়	২২৫
যদি সূর্যটা কোনোদিন রেগে বলে	অমল নায়েক	২৩২
যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তিসেনা	নাসিমা খান	১৯৬
যে দেশে কথায় কথায় বিকৃত হয়	হাসান মতিউর রহমান	২০১
র		
রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলেম	শাহ আবদুল করিম	২০০
রক্ত দিয়্যা গড়া মোদের সোনার বাংলাদেশ	প্রচলিত গম্ভীরা	১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

রক্তেই যদি ফোটে জীবনের ফুল	সৈয়দ শামসুল হুদা	১৮৭
রক্তের অক্ষরে সাক্ষর দিলাম	সানাউল মাহমুদ	১৮৭
রেল লাইনের ঐ বস্তিতে	আজম খান	২৪৩
ল		
লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনতার জয়	মতলুব আলী	২০২
শ		
শপথ জবানের আমার নাম শুধায়ো না	অরূপ রাহী	২২৯
শোন, একটি মুজিবরের থেকে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	১৮৩
স		
সন্ধে এলে এই শহরে উদোম বুকে	অমল আকাশ	২২৮
সবকটা জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	১৯৫
সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ	সারওয়ার জাহান	১৮৪
সাতটা শঙ্খ একবারে বাজাবো	কফিল আহমেদ	২২১
সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি	মনিরুজ্জামান মনির	১৯৪
সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের	মোকসেদ আলী সাঁই	১৮৪
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে	আবদুল লতিফ	১৯৩
স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে	আখতার হোসেন	১৮৭
স্বাধীন হয়ে এখন হামরা পেলাম	প্রচলিত গম্ভীরা	২০৩
স্বাধীন দেশে থাকি আমরা স্বাধীন দেশে থাকি	শাহ আবদুল করিম	২০০
হ		
হত্যা করেই ভেবেছ কি	আবদুল লতিফ	২০৭
হাসপাতালে ডাক্তার নামে থাকে যত কসাই	আবদুল লতিফ	২১৭
হায়রে আমার মন মাতানো দেশ	খান আতাউর রহমান	১৯২
হু-হুম-নাহো-হু-হুম-না	অমল আকাশ	২২৮